ভোমরা, গুপ্তচরেরা ও

আমাদের বুদ্ধিজীবিরা

অরুন্ধতী রায়, মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায়,
জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়,
আবদুর রউফ, মইনুল হাসান



রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

গোধরা, গুজরাট
ও
আমাদের বুদ্ধিজীবিরা

■অরুন্ধতী রায় ■মহাশ্বেতা দেবী ■দেবেশ রায়
■জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ■আবদুর রউফ ■মইনুল হাসান

রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

অমৃত শরণ প্রকাশন

☯
প্রকাশক:
আদিত্যরঞ্জন ঘটক
অমৃত শরণ প্রকাশন
বিদ্যাসাগর রোড
কোলকাতা-৭০০১২৬

প্রাপ্তিস্থান:
বিশ্বজ্ঞান: ৯/৩ টেমার লেন, কোলকাতা-৭০০০০৯
বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র: ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০০৭৩
দে বুক স্টোর: ১৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০০৭৩

অক্ষর বিন্যাস: লেখক
কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ: তরুণ পাল (বাবলা)

প্রচ্ছদ: প্রতাপলাল গাঙ্গুলী

মুদ্রক : ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স, গঙ্গানগর, কোলকাতা-৭০০১৩২
ফোন ২৫৩৮-৮৮৮০

মূল্য: ৩৫ টাকা
Rs. 35/-

প্রকাশ কাল : জানুয়ারী ২০০৩

উৎসর্গ

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভোট পূজার নৈবেদ্যের ডালি
মিথ্যার উপাচারে সাজানো হলো,
অগ্নিদগ্ধ ডাউন ট্রেন নিয়ে
সোচ্চার হলোনা কেউ,
ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে জেনেও ওরা নীরব।
কঙ্কালের স্তুপের উপর বসে
মানুষ এখন মানুষ মারার যজ্ঞে মেতেছে।
'সংখ্যা লঘু' শব্দের যাদুকে মুলধন করে
প্রচার যন্ত্রের বোতাম টিপে
এক চক্ষু হরিণরা ছুটছে আর ছুটছে।
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে
সঞ্জয় এখন যে সব গল্প শোনায়
তাতে সমকালীনতার ভেজাল।

ডাউন ট্রেনের নারকীয় চিৎকার
কারো কানে পৌঁছলো না-
পৌঁছবে না কোনও দিন

সিগন্যালের সংকেত এখন সবুজ নয়, লাল।

—শিবদাস বসাক

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

প্রবেশিকা

সাংবাদিক শঙ্কর ঘোষ ছেচল্লিশের দাঙ্গার কথা লিখেছেন *হস্তান্তর* পুস্তকে: "আমি স্বচক্ষে দেখেছি বিবেকানন্দ রোডের উপর লেডী ব্র্যাবোর্ণ কলেজ হোস্টেলের ছাত্রীরা ১৬ই আগস্ট সকালে মিছিল করে বিবেকানন্দ রোড ধরে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে পড়ে দক্ষিণে চলে গেলেন।। হোস্টেলটি পরের দিনে লুট হয়, আমি দেখতে যাইনি তবে শুনেছিলাম হোস্টেলে তখন কোনও আবাসিক ছিলেন না। অথচ আবুল হাসিম তাঁর বইতে লিখেছেন, "মধ্য কলকাতার স্নাতকোত্তর মহিলা ছাত্রীদের হোস্টেল, মন্নুজান মহিলা হোস্টেল বিবেকানন্দ রোডে অবস্থিত ছিল। হোস্টেলে হামলা হয়েছিল, মহিলা ছাত্রীদের জীবন ও সম্ভ্রমের প্রতি হুমকীও দেওয়া হয়েছিল। দাঙ্গাবাজরা হোস্টেল থেকে মুসলিম লীগের পতাকা টেনে নামাতে চাইলে ছাত্রীরা সাহসের সঙ্গে বাধা প্রদান করেছিল। আমি সে খবর পেয়ে হোস্টেলের বসবাসরতা ছাত্রীদের উদ্ধার করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্রাকে স্বেচ্ছাসেবক ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী পাঠালাম। আমার ভবন ৩৭ নং কিড স্ট্রীটে তাঁদের নিয়ে আসা হলো।"

"..... দাঙ্গার প্রথম দু-তিন দিন একটি অধুনালুপ্ত বাংলা দৈনিক দাঙ্গার খবর পরিবেশন করে হিন্দু পাড়ায় খুব হইচই ফেলে দিয়েছিল, কাগজটির বিক্রীও বেশ বেড়ে গিয়েছিল।

"......মারাত্মক একটি খবর দাঙ্গার দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে এই বাংলা দৈনিকটি প্রকাশ করল ভিক্টোরিয়া কলেজের মহিলা হোস্টেল সম্পর্কে। রিপোর্টে বলা হয় যে রাজাবাজার অঞ্চলের এই মহিলা হোস্টেলটি মুসলিম দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করে, মেয়েদের উপর অত্যাচার করে তাদের খুন করে, তারপর তাদের মৃতদেহগুলি খন্ডবিখন্ড করে কর্তিত অংশগুলি রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর তারে ঝুলিয়ে রাখে।

".....ট্রাম শ্রমিক সেলিমের নেতৃত্বে রাজাবাজারের মুসলিম ট্রাম শ্রমিকরা তিন দিন তিন রাত্রি দাঙ্গাবাজদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ থেকে ভিক্টোরিয়া স্কুল ও কলেজের আবাসিক ছাত্রীদের রক্ষা করেছিল।"

প্রত্যেকটি দাঙ্গার বিকিরণফল অসংখ্য ভীতিপ্রদ গুজব। শঙ্কর ঘোষ *গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং* এর দুটি গুরুতর গুজবের কথা লিখেছেন। কিন্তু ২০০২ খ্রীষ্টাব্দের গুজরাটের দাঙ্গার গুজব সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। এই দাঙ্গায় অত্যন্ত চতুরালির সঙ্গে রটানো হয়েছে নানা গুজব। ভিশন মিক্সিং করে না ঘটা ঘটনার ফটো প্রকাশ করা হয়েছে। সুটিং করে তোলা হয়েছে দাঙ্গার ছবি। গুজব প্রচারের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ইন্টারনেটও।

কিন্তু সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, যা কিছু সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেলে প্রকাশিত হয় তা ধ্রুব সত্য। ফলে কিছু গোয়েবলসীয় মিথ্যাকে সত্য বলে জনসাধারণের মনে অভিক্ষেপিত করা হচ্ছে। মিথ্যার প্রচারকেরা অত্যন্ত শক্তিশালী একটি অক্ষশক্তি। সামান্য কিছু পত্র-পত্রিকা বাদে এই অক্ষের করায়ত্ত যাবতীয় প্রচার মাধ্যম। এদের প্রচারের প্রকার দেখে এই অক্ষের নাম ইসলাম-ধর্মেতরবাদী অক্ষ দেওয়া যেতে পারে। যদিও এই ধর্মেতরবাদীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান মার্ক্সবাদীদের। এই অক্ষের তিনজন নেতাকে অনায়াসেই চিহ্নিত করা যেতে পারে।।

এই তিনজন হলেন প্রাক্তন বিচারপতি ভি. আর. কৃষ্ণ আয়ার, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরাল ও শিখ 'ধর্মেতরবাদী' খুশবন্ত সিং। এঁরা তিনজন ইসলামী মৌলবাদী সৈয়দ সাহাবুদ্দিনের *মুসলিম ইন্ডিয়া* পত্রিকার সম্পাদকীয় পরামর্শদাতা। পাঠকরা স্মরণ রাখবেন শাহবানু মামলার পর রাজীব গাঁধীকে ধমক-ধামক দিয়ে যাঁরা সংবিধান পরিবর্তন করতে বাধ্য করেন তাদের মধ্যে সাহাবুদ্দিনও ছিলেন। *দি স্টেটসম্যান* পত্রিকায় অভিযোগ করা হয়েছিল মুসলিম প্রতিনিধিদলের তরফ থেকে রাজীবকে প্রাণের ভয় দেখানা হয়েছিল। সাহাবুদ্দিন অবশ্য সে অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন।

আমাদের আলোচনার বিষয় নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এই অক্ষের বক্তব্য। এছাড়া *গুজরাট দিচ্ছে ডাক* ও *গুজরাটঃ নরমেধ যজ্ঞ* নামক দুটি পুস্তকে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী। তবে যাবতীয় প্রবন্ধের সমালোচনা করার প্রয়োজন হয়নি। স্বল্প আকারের পুস্তকে তা সম্ভবও নয়। একজন পৌত্তলিক হিন্দু হিসাবে আমরা একদিকে যেমন গুজবগুলিকে চিহ্নিত করেছি তেমনই বিভিন্ন প্রশ্নে হিন্দু মানসের বক্তব্য রেখেছি।

গুজরাটের দাঙ্গা সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে এই ধরনের গুজব রটানোর একমাত্র কারণ রাজনীতি: কেন্দ্রে এবং গুজরাটে ক্ষমতাশীন বিজে পি সরকার। বিজেপী দেশে-বিদেশে 'সাম্প্রদায়িক' দল হিসাবে পরিচিত। কারণ, বিজেপী সংখ্যাগুরুদের সমস্যা ও দাবী নিয়ে কথা বলে, অভিন্ন দেওয়ানী বিধি চায়, বাতিল চায় সংবিধানের ৩৭০ ধারা।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশভাগের পরেও দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। দেশের যত্রতত্র ইসলামী মৌলবাদীদের দৌরাত্মে প্রতিটি বিখ্যাত মন্দিরে আজ অস্ত্রধারী পুলিশের পাহারা। এই অবস্থার শুরু কিন্তু কেন্দ্রে বিজেপী সরকার আসার আগেই। এমত পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান পুস্তকের অবতারণা। কারণ, হিন্দুবিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলি রাজনীতি করতে গিয়ে যা করে চলেছে তার ফলে ভারত-বিরোধী বিদেশী শক্তিগুলি যথেষ্ট উৎসাহিত হচ্ছে। ভারত-বিরোধী গুজব রটাচ্ছে বিদেশী পত্রিকাগুলিও। ফলে সামগ্রিকভাবে ক্ষতি হচ্ছে দেশের ও জনসাধারণের।

ফ্রন্টলাইন পত্রিকায় ইসলামী মৌলবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত অক্ষরধাম মন্দির প্রসঙ্গে ডায়োন বুনশা ও প্রবীণ স্বামীর বক্তব্য থেকে ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে এই অক্ষের বক্তব্য কয়েক কথায় উপলব্ধি করা সম্ভব। "অক্ষরধাম মন্দির আক্রমণের মত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ বিপথগামী ও ব্যর্থ, কিন্তু বিয়োগান্তভাবে অবশ্যম্ভাবী। গুজরাটের দাঙ্গাক্রান্তরা যতদিন না আইন ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা সুবিচার পায়, ততোদিন এই ধরনের বীভৎস ঘটনা নিঃসন্দেহে ঘটতে থাকবে ভারতে।"

গুজরাটের দাঙ্গায় বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করাও হয়েছে মামলা। পুলিশ কোনও অপরাধীকে ছেড়ে দিলেও অত্যাচারিতদের সরাসরি আদালতে যাওয়ার ব্যবস্থাও ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় আছে। সুতরাং আইন ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি দ্বারা অবিচারের প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? দেখা যাচ্ছে ধর্মেতরবাদীরা পরোক্ষে সন্ত্রাসবাদের সমর্থণ

করছেন।

এই অক্ষের অন্য বক্তব্য হচ্ছে যেহেতু ভারতে দাঙ্গায় বেশী সংখ্যালঘু মরে অতএব এখানে দাঙ্গা মানে পোগ্রম। তাঁরা অবশ্য কাশ্মীরের উদাহরণ এ ব্যাপারে টানতে চাননা। তাঁরা বলেন, "কাশ্মীরের ব্যাপারটা স্বতন্ত্র।" কারণ কাশ্মীরে তাঁদের এই উদ্ভট তত্ত্ব খাটবে না। এই মাথায় স্ক্রুওয়ালারা জনসাধারণকে বোঝাতে চান যে ভারতেও দাঙ্গায় সংখ্যাগুরুদেরই বেশী মরা উচিত। অল্পসংখ্যক লোকেরা বেশীসংখ্যক লোক খুন করবে, সেটাই স্বাভাবিক। এরা এক ধরনের গাঁধী-শিষ্য। 'জাতির জনক' বলেছিলেন, হত্যা করা মুসলমানদের ধর্ম, নিহত হওয়া হিন্দুর ধর্ম।

এই অক্ষ গুজরাটের দাঙ্গার জন্য গোধরা হত্যাকান্ডকে দায়ী করতে রাজী নন। একদলের মতে ভি.এইচ.পির 'উসকানি' দেওয়া কর্ম পদ্ধতির জন্য গোধরা হত্যাকান্ড ঘটেছে। সুতরাং এর জন্য ভি.এইচ.পি ই দায়ী। অন্যদলের বক্তব্য, ব্যাপারটা সাধারণ আইন শৃঙ্খলার ব্যাপার। এর কোনও সাম্প্রদায়িক তাৎপর্য নেই। করসেবকরা একটি ষোল বছরের মুসলিম মেয়েকে নিজেদের কামরায় তুলে নেওয়ার জন্য... বা, প্লাটফর্মে ভেন্ডারদের সঙ্গে করসেবকদের চায়ের দাম না দেওয়া থেকে ঝামেলা হওয়ার জন্য ঘটনাটা ঘটেছে।

কিন্তু ভারতে মুসলমানরা বহুসময় দেশবর্হিভূত বিষয় নিয়েও হিন্দুদের আক্রমণ করে। মোপলা জেহাদের সঙ্গে হিন্দুরা কোনওক্রমে জড়িত ছিলনা। মুসলমানরা জেহাদ করেছিল ভারতবর্হিভূত খেলাফৎ নিয়ে এবং ব্রিটীশদের বিরুদ্ধে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা হত্যা, ধর্ষণ ও ধর্মান্তর করেছিল হিন্দুদের। এখন (অক্টোবর, ১৩, ২০০২) শোলাপুর ও মহারাষ্ট্রের অন্যত্র দাঙ্গা হচ্ছে। আক্রান্ত হচ্ছে হিন্দুদের দোকান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। কারণ, আমেরিকার কোন পাদ্রী নবী সম্বন্ধে কটুক্তি করেছে।

এটা স্পষ্ট এই ইসলাম-ধর্মেতরবাদী অক্ষ তথ্য গোপন করে ও তথ্য বিকৃত করে সত্যকে চাপা দিয়ে হিন্দুদের দুর্বৃত্ত বানাতে চায়। এই পদ্ধতিকে বলে *অপলাপবাদ*। নানা রকম মিথ্যা প্রচার করা ছাড়াও অপলাপবাদীরা যে পদ্ধতিতে কাজ করে সে সম্পর্কে বেলজিয়ান ভারতত্ত্ববিদ কোনরাড এলস্ট লিখেছেনঃ

⁂ যেসব বিদ্বানদের সাক্ষ্য অসুবিধাজনক তাঁদের নামে কলঙ্ক প্রচার করো। তাঁদের রাজনৈতিক বা অন্য স্বার্থের ক্রীতদাস বলে প্রচার করো, যাতে তাঁদের সাক্ষ্য থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় জনসাধারণের মন।

⁂ পাঠকের দৃষ্টির আড়ালে রেখে দাও যাবতীয় অসুবিধাজনক নথিপত্রাদি। যদি কোনও নথি অসুবিধাজনক বলে মনে হয়, পুরো অস্বীকার কর ঐ নথির অস্তিত্ব। প্রচার মাধ্যমের উপর যদি তোমার নিয়ন্ত্রণ থাকে, তবে তোমার অস্বীকারের দ্বারা এইসব নথি জলে তলিয়ে যাবে।

⁂ নথি অস্বীকার করা যদি সম্ভব না হয়, তবে সুবিধামত ঐ নথি থেকে উদ্ধৃত করে এবং নথির লেখকের উদ্দেশ্য প্রণোদনার কথা বলে তথ্য বিকৃত কর। উদ্ধৃতির মধ্যে তঞ্চকতা কর, যাতে আসল লেখক যা বলতে চেয়েছেন তার উল্টোটা বোঝায়।

⁂ অস্বস্তিকর সাক্ষ্যর মধ্যে দোষ খোঁজ। দু-একটি ক্ষুদ্র কাল্পনিক বা আসল ত্রুটি খুঁজে বার করে পাঠকের সমস্ত দৃষ্টি সেটার দিকে আকর্ষিত করো, যাতে পাঠক ভাবতে পারে সমস্ত নথিটাই বিশ্বাসজনক নয়।

⁂ অস্বস্তিকর আলোচনা যদি বন্ধ না করাই যায়, তবে অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করে ব্যাপারটা পাতলা করে দাও: আলোচনা কর ইহুদীদের ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনীয়দের প্রতি ইহুদীদের দুর্ব্যবহার; হিন্দুদের ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা।

⁂ ঘটনার সত্যতা যদি আদৌ স্বীকার করতে হয়, তাহলে ঘটনার বলিকে দোষ দাও।

গুজরাট প্রসঙ্গে দেখা যাচ্ছে ইসলামী মৌলবাদীদের আড়াল করার জন্য ইসলাম-ধর্মেতরবাদী অক্ষ প্রথম থেকেই হত্যাকান্ডের দোষটা হিন্দুদের ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। বস্তুতঃপক্ষে কোনরাড এলস্ট বর্ণিত অপলাপবাদের যাবতীয় উপসর্গই গুজরাট দাঙ্গার প্রতিবেদনে ও বিভিন্ন ধর্মেতরবাদী বুদ্ধিজীবি প্রণীত ভাষ্যে দেখা গেছে।

গুজরাট দিচ্ছে ডাক এবং *গুজরাট: নরমেধ যজ্ঞ* পুস্তক দুটির মূল উদ্দেশ্য হিন্দু-বিরোধিতা হলেও এই দুটি পুস্তকে কিছু নিবন্ধে অন্য ধরনের বক্তব্যও আছে। বিশেষতঃ *গুজরাট: নরমেধ যজ্ঞ* পুস্তকে প্রকাশিত আবুল বাশারের প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। ঐ প্রবন্ধে জনাব বাশার যাঁরা রাম-জন্মভূমির ঐতিহাসিকতা দাবী করেন তাদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছেন। অবশ্য শেষ অনুচ্ছেদে লেখক সাম্প্রদায়িক বক্তব্য রেখেছেন। কেউ কেউ সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে তাত্ত্বিক বিচার করার চেষ্টা করেছেন। যেমন প্রদীপ বসু। ভারতে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার উৎস সন্ধানে নিরত হতে হলে দুটি ধর্মের তত্ত্ব নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা অত্যাবশ্যক। অত্যাবশ্যক কোরান-হাদিশের পাঠ নেওয়াও। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইতিহাসের জ্ঞানও প্রয়োজন। তা না করে লেখক নানা ধরনের বিদেশী তত্ত্ব—গ্রামশী, ফুকো, মডার্নিজম, পোস্টমডার্নিজম ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর পান্ডিত্য প্রদর্শন করেছেন। তাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি, হিন্দুদের গালিগালাজ করা ছাড়া।

এই পুস্তক রচনায় কোনও হিন্দুত্ববাদীদের পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি। তথাকথিত ধর্মেতরবাদী পত্রপত্রিকা, পুস্তক ও সংবাদপত্র থেকেই তথ্য আহরণ করা হয়েছে। ব্যবহার করা হয়েছে *মুসলিম ইন্ডিয়া* পত্রিকাও। কোনও তথ্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলে লেখকের সঙ্গে ইন্টারনেটে যোগাযোগ করা যেতে পারে। ইন্টারনেট ঠিকানা: rpratap@vsnl.net.

এই পুস্তক রচনায় বহুলোকের সাহায্য পাওয়া গেছে। তাদের সকলের নাম প্রকাশ করা গেলনা স্থানাভাবে। তবে নিজেদের লেখা এই পুস্তকে ব্যবহার করতে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন বন্ধুবর শিবদাস বসাক ও প্রণম্য নিত্যপ্রিয় ঘোষ। ইতি

পৌষ পার্বণ, ১৪০৯ রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

কোলকাতা

প্রথম পর্ব

গোধরা অগ্নিসংযোগ

২৭ শে ফেব্রুয়ারী ২০০২, ডাউন সবরমতী এক্সপ্রেস ছুটে চলেছিল গুজরাটের পাঁচমহল জেলা দিয়ে। সেই রেলগাড়ীর এস-৬ কামরায় অযোধ্যা থেকে রামমন্দির নির্মাণের আন্দোলন করে (যে আন্দোলন হিন্দুরা করছে ১৪৪৯ অব্দ থেকে, এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুসলমানরা যখন দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান ছিনিয়ে নিল তখন তারা প্রত্যাশা করেছিল মুসলিম সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা অধিকৃত তাদের পুরাণো তীর্থগুলি ফেরত পাবে)। যাই হোক, ফিরছিল করসেবকরা। ভোরের গুজরাটের আকাশে বাতাসে বসন্ত। বসন্ত করসেবকদের মনেও। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তারা ঘরে ফিরবে। দেখা পাবে স্ত্রী-সন্তানের, দেখা পাবে পিতামাতার। তারা প্রতি স্টেশনেই ধ্বনি দিচ্ছিল, *রাম মন্দির ওহী বনায়েঙ্গে! জয় শ্রীরাম!*

সকাল সাতটা কুড়ি। গোধরা স্টেশনে প্রবেশ করলো সবরমতী একসপ্রেস। পাঁচমিনিটের যাত্রা বিরতি। করসেবকরা চা পান করলো স্টেশনের স্টল থেকে, ধ্বনি দিল, *রাম মন্দির ওহী বনায়েঙ্গে! জয় শ্রীরাম।* আবার যাত্রা শুরু করলো রেলগাড়ী। কিন্তু মাত্র ৫০০ মিটার দূরে সিগন্যাল ফলিয়ায় থেমে গেল গাড়ী। সেখানে ১০০০ জনের উত্তেজিত জনতা। কিছু লোক জড় হয়ে গেল ইঞ্জিনের সামনে। জনতা ঢিল ছুড়তে লাগলো করসেবকদের কামরা লক্ষ করে। করসেবকরা ভয়ে জানলা দরজা বন্ধ করে দিল। কিন্তু উত্তেজিত জনতা একটা শাটার খুলে ফেলতে সমর্থ হলো। সেখান দিয়ে পেট্রল ভেজানো একটা বিছানা ছুঁড়ে দিল ভিতরে। তারপর সেই বেডিং এ ধরিয়ে দেওয়া হলো আগুন। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো সেই বেডিং। জ্বলে উঠলো গোটা কামরা। যাত্রীদের বেশীভাগই মারা গেল সেই আগুনে। আগুন পাশের দুটি কামরারও ক্ষতি করলো। মোট সাতান্নজন মৃতের মধ্যে ২৫ জন ছিল মহিলা এবং ১৪ জন শিশু। ফায়ার বিগ্রেডের প্রথম গাড়ীটিকে অকুস্থলে পৌছতে বাধা দেয়, স্থানীয় এক পৌরপিতা। পুলিস গুলি চালিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে।

গল্প লিখছি না, *দি স্টেটস্‌ম্যানের* সাংবাদিক অনিল রানার প্রতিবেদনের চিত্রনাট্য। গোধরায় প্রত্যাক্ষদর্শীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা বিবরণ থেকে ঐ প্রতিবেদন লিখেছিলেন অনিল রানা। সাংবাদিক রানা আরও লিখেছিলেন, সবরকণ্ঠের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতা কৌশিক প্যাটেলের অভিযোগ: নিকটবর্তী মসজিদ থেকে মাইকে উত্তেজক প্ররোচনামূলক কথা প্রচার করা হচ্ছিল। *দি স্টেটস্‌ম্যানের* ঐ সংবাদে আরও লেখা আছে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়। ঐ ট্রেন আনন্দ স্টেশনে পৌছলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের উপর আক্রমণ করা হয়। ছুরিকাঘাতে নিহত হয় একজন। প্রতিবেদনের সঙ্গে এস-৬ বগীর যে রঙ্গীন ছবি ছাপা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে জানলার রেলিঙ ভাঙ্গা। যে অংশে রেলিঙ ভাঙা সে অংশে বার্থ নং ১-১০ থাকতে পারে বা, বার্থ নং ৬২-৭২ থাকতে পারে। কারণ, জানলাটি দরজার পাশে।

আমেদাবাদ থেকে পি.টি.আই এর পাঠানো ১১ ই মার্চের সংবাদে দেখা যাচ্ছে, গোধরা স্টেশনে সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন লাগানোর সময় স্থানীয় একটি মসজিদ থেকে উস্কানিমূলক

প্রচার চালানো হয়েছিল বলে রেল পুলিশ থেকে জানানো হয়েছে। সেই প্রচারে ওখানে পরিস্থিতি তপ্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দুস্কৃতিরা আরও কামরা আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল। একটি বগীর যাত্রীরা সব জানলা ও দরজা বন্ধ করে দেয়। ফলে তারাই লক্ষ্য হয়ে যায় আক্রমণের।

পি.টি.আই এর ঐ প্রতিবেদনে আরও লেখা হয়েছে: আরও জানা গিয়েছে, সেদিন ট্রেনটি নির্ধারিত পাঁচ মিনিট স্টেশনে দাঁড়িয়ে থেকে ফের যাত্রা আরম্ভ করার পর সেটি দুবার থামানো হয়। দ্বিতীয় বার ট্রেনটি দাঁড় করানো হয় ভ্যাকুয়াম পাম্প খুলে নিয়ে। সেই সময় কর্তব্যরত আর.পি. এফ জওয়ান করণ সিং, শ্রী মোহন যাদব ও অম্বরেশ কুমার ৩০৩ রাইফেল থেকেচার রাউন্ড গুলি চালান। অম্বরেশ তাঁর অন্য সহকর্মীদের এবং ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ জে. কে. জর্জকেও সতর্ক করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যান ইন্সপেক্টর জর্জ এবং এস. আই নবাব সিং। তখন স্থানীয় একটি ধর্মস্থান থেকে লাউডস্পীকারে উত্তেজনা ছড়ানো ভাষণ দেওয়া হচ্ছিল বলে এফ. আই. আর এ বলা হয়েছে। আর. পি. এফ সূত্রে জানানো হয়েছে জওয়ানরা মোট ১৯ রাউন্ড গুলি চালান। আর. পি এফের গুলিতে ইরফান ও তৈয়াব হোসেন আলি নামক দুজন মারা যান। দুজনেই সিগন্যাল ফলিয়া কলোনির বাসিন্দা।

গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেস হত্যাকান্ডের পরের দিন ২৮ শে ফেব্রুয়ারী *দি স্টেটস্‌ম্যানের* বিভিন্ন সংবাদসূত্র জানাচ্ছে রাজ্যে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিক্রিয়ায় নিহত হয়েছে সত্তরজনেরও বেশী লোক। এই সত্তরজনের মধ্যে আটত্রিশ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এর মধ্যে আমেদাবাদের চমনপুরা এলাকায় সপরিবারে নিহত হয়েছেন ভূতপূর্ব এম.পি এহসান জাফরী। শহরের নারোদা এলাকায় পুড়িয়ে মারা হয়েছে বহু লোককে। আশা করা হচ্ছে রাত নাগাদ সেনাবাহিনী শহরের দখল নেবে।

ঐ সংবাদেই জানানো হয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডাকা বন্ধের মধ্যে রাজ্যে অগ্নিসংযোগ ও লুঠতরাজের ঘটনা ঘটায় ২৬ টি শহরে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়েছে।

উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে এ কথা স্পষ্ট যে কিছু মুসলিম মৌলবাদী চক্রান্ত করে সবরমতী এক্সপ্রেসে করসেবকদের পুড়িয়ে মেরেছিল। স্বতঃউৎসারিত প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুরা পাল্টা দাঙ্গা লাগায়, এবং পুড়িয়ে মারে বহু মুসলমানদের। এই হিন্দুদের মধ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেউ ছিলনা এটা তামা-তুলসী-গঙ্গাজল হাতে নিয়ে বললেও বিশ্বাসজনক নয়। বরঞ্চ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের লোকজন থাকাটাই মনোবৈজ্ঞানিক কারণে স্বাভাবিক। কারণ, কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদে মুহাম্মদের পবিত্র কেশগুচ্ছ হারিয়ে গেলে পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুদের জান-মান-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। অযোধ্যায় শিলাপূজা হলে বাঙলাদেশে দুশো মন্দির ভাঙা পড়ে। আজকের দূরসঞ্চারের যুগে কোনও দেশ তো বিচ্ছিন্ন জম্বুদ্বীপ নয়। মানুষের সাম্প্রদায়িক মানসিকতাও ভিন্ন ভিন্ন কামরায় বন্দী নয়, তা সর্বত্রব্যাপী।

হিন্দুরা দাঙ্গায় মাতলো। ১ লা মার্চ ভি.এইচ.পি'র ডাকা বন্ধের দিনে মৃতের সংখ্যা পৌঁছলো ১৩৬ জনে। এর মধ্যে আমেদাবাদ শহরেই ১১৯ জন মৃত। এই মৃতদের মধ্যে ১৭ জনের মৃত্যু ঘটেছে পুলিশের গুলিতে। দাঙ্গা ছড়ালো ভাদোদরা, ভারুচ, হিম্মতনগর, কালোল,

রাজকোট, সুরাট, নাদিয়াদ, ভবনগর, জুনাগড় ও অঙ্কেলেশ্বরে।

ঐদিন মুখ্যমন্ত্রী ২৮ শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা সম্বন্ধে জানালেন, নারোদা এলাকায় দুজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ একটি টেম্পো নিয়ে দুজন স্কুটার আরোহীকে আহত করে এবং তারপর আর একজনকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলে। এর ফলে জনতা ক্রুদ্ধ হয়ে নারোদা কলোনী আক্রমণ করে এবং বহুলোককে পুড়িয়ে মারে।

মেহগনি নগরের গুলমার্গ সোসাইটি হত্যাকান্ড সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, সেখানে ভিতর থেকে অ্যাসিড বাল্ব ছোঁড়া হয় এবং গুলি চালানো হয়। অধিবাসীদের অস্ত্র ফুরিয়ে গেলে জনতা হাউসিং আক্রমণ করে এবং সোসাইটির ১৯ টি বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। এর ফলে ১২ জন নারী ও ৬ জন পুরুষ মারা যায়। এই ৬ জনের মধ্যে ছিলেন এহসান জাফরী। সেখানে পুলিশ গুলি চালনা করে এবং পুলিশের গুলিতে মারা যায় তিন জন দাঙ্গাকারী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, " সব দোষীকেই শাস্তি দেওয়া হবে।" মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, "সেনা বাহিনীকে দেখামাত্র গুলি চালাতে বলা হয়েছে।"

অন্য যে কোনও ধরনের হিংসাত্মক ঘটনার ক্ষেত্রে যা হয়, এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। দাঙ্গা পীড়িতরা ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলো, পুলিশ ঠিকমত কাজ করছে না।

সেনাবাহিনী নিয়োগ

১ লা মার্চ নয়াদিল্লী থেকে *দি স্টেটসম্যানের* সংবাদদাতা কিথ ফ্লোরী জানাচ্ছেন, গুজরাটের রাস্তায় সেনা নামাতে মূল্যবান ১২ টি ঘন্টা দেরী হয়ে গেছে বলে অনেকে মনে করছেন। কারণ, ২৭ শে ফেব্রুয়ারী সকালেই গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন ধরানো হলেও সেনা বাহিনীকে আমেদাবাদে মার্চ করতে দেখা গেল আজ দুপুরে। সেনা বাহিনী নিয়োগের দিন ক্ষণ এই রকম:

২৮শে ফেব্রুয়ারী

* বিকাল বেলা: গুজরাট সরকার সেনা বাহিনী নিয়োগের জন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ জানালো।
* বিকাল ৬ টা ৩০: বিরোধী নেতারা কেন্দ্রকে অনুরোধ করলেন, সেনা বাহিনীর সাহায্যে গুজরাটের হিংসা দমন করার জন্য।
* রাত ৮ টা: ১ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ক্যাবিনেট কমিটি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলো। সভার শেষে আদবানী জানালেন, সেনা বাহিনী তৈরী।
* রাত ১১ টা ৩০: সেনা বাহিনী গুজরাটের দিকে উড়তে শুরু করলো।
* শেষ রাত: প্রতিরক্ষামন্ত্রী গুজরাটের দিকে গেলেন।

১ লা মার্চ

* শেষরাত ২টা ৩০ : সেনা আমেদাবাদে পৌছলো।
* ১১-১২ টা দুপুর: উপদ্রুত অঞ্চলে দেখা গেল সেনা বাহিনীকে ।

কিথ ফ্লোরী লিখেছেন, সেনা বাহিনীর দেরীতে উপস্থিতি সম্পর্কে 'টেকনিকাল' কারণ দেখানো হলেও গৈরিক বাহিনীর বিরোধীরা এক তত্ত্ব খাড়া করে বলছেন *গোধরা হত্যাকান্ডের*

বদলা নেবার জন্য ইচ্ছে করেই সময় নষ্ট করা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, প্রথম অঘটনের ৪৮ ঘন্টা কাটতে না কাটতে দাঙ্গা নিয়ে রাজনীতি শুরু হয়ে গেছে। ঘটনার রেশ কাটতেই ধর্মেতরবাদী সাংবাদিকরা হিন্দুদের শত্রুতা করতে আরম্ভ করে দিলেন। কারণ, দাঙ্গাটা ঘটেছে বিজেপি শাসিত রাজ্যে, কী সুবর্ণ সুযোগ! ১৯৯৮-১৯৯৯ অব্দের হিন্দু-খ্রীষ্টান দাঙ্গার (যে দাঙ্গায় একটি খ্রীষ্টানেরও জীবনপাত হয়নি) পর আবার একটা দাঙ্গা লেগেছে বিজেপী শাসিত গুজরাটে। এবারে সংখ্যালঘুরা সত্য সত্যই নিহত হচ্ছে! অবশ্য রাজনীতি বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করে দিয়েছে 'ধর্মেতরবাদী' প্রচার মাধ্যমগুলি। ২৮শে ফেব্রুয়ারীর *হিন্দুস্থান টাইমসের* সংবাদ শিরোনাম *অযোধ্যা কান্ডের প্রতিক্রিয়ায় গুজরাট আহত*। অর্থাৎ, গোধরার মুসলমানদের কোনও দোষ নেই, অযোধ্যায় রামমন্দির আন্দোলন করার জন্যই বাড়ীর রাগী বাবা রাগ করেছে। রাগী বাবাকে ঠান্ডা রাখা ভারতীয় নাগরিকদের বিশেষ কর্তব্য। সংবিধানে লেখা না থাকলেও এটা মানতে হবে।

১লা মার্চের *টাইমস অফ ইন্ডিয়া* লিখলো, *বিজেপী বেহালা বাজাচ্ছে যখন গুজরাট দাঙ্গায় প্রচন্ডভাবে দুলছে।* তেশরা মার্চ ঐ পত্রিকা লিখলো, এখন বহুলভাবে প্রচারিত সেই বাক্য, নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রের কথা। ঘটনা হচ্ছে শুধুমাত্র ঐ পত্রিকাই নরেন্দ্র মোদীর মুখ থেকে ঐ বাক্য শুনেছিল। অন্য কোনও পত্রিকা শোনেনি। তবে পরে অবশ্য সব পত্রিকাই ঐ কথা সত্য বলে মেনে নিয়েছে এবং জলন্ত ভাষায় সম্পাদকীয়ও লিখেছে। যদিও গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী আদৌ ও কথা উচ্চারণ করেননি। পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট বিদ্বান নিত্যপ্রিয় ঘোষ লিখেছেন, "উত্তরে নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, গোধরার পাশবিক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া তো হবেই। যে কোনও ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হয়, এটা নিউটনের থার্ড ল নয়, তিনি নিউটনের কথা বলেনও নি, তবু নিউটন মোদী বলা অব্যাহত।"

৩ রা মার্চ গোধরা থেকে পি.টি.আই জানাচ্ছে গোধরা কান্ডের মূল সন্দেহভাজন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা ও গোধরা মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি মুহাম্মদ হোসেন কলোতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কলোতা শহরের সংখ্যালঘু সেলের আহ্বায়ক। দুজন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলরকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ বিলাল হাজী ও ফারুখ ভানা নামক অন্য দুজনকে খুঁজছে।

ঐ একই তারিখে গাঁধিনগর থেকে *দি স্টেটস্‌ম্যান* জানাচ্ছে, হিংসা কমের দিকে। কিন্তু কর্তপক্ষ জানাচ্ছেন হিংসা গ্রামের দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে, বিশেষতঃ সবরকণ্ঠ, বনসকণ্ঠ এবং পাঁচমহল জেলায়। মৃতের সংখ্যা ৪৩১, এর মধ্যে আহমদাবাদেই মারা গেছে ২১৩ জন। পুলিশের গুলিতে মৃত ৭৭ জন। বনসকণ্ঠ জেলায় মারা গেছে ৬ জন, এর মধ্যে দুজন মারা গেছে পুলিশের গুলিতে। মেহসানা জেলার একটি গ্রামে গতকাল ২৯ জনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। কারফিউ কবলিত হয়েছে রাজ্যের ২৫ টি জেলার মধ্যে ১৪ টি জেলা।

আদবানী পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা মানতে রাজী নন। তিনি বলেন প্রথম দিনেই বহু লোক পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। সেনা পাঠাতে দেরী হওয়ার কথা অস্বীকার করেন তিনি।

বলেন, এই ধরনের কথা শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদীদের খুশী করবে। তিনি স্বীকার করেন গত কয়েকদিন গুজরাটে যা ঘটেছে তা কলঙ্ক। গোধরা *স্টেশন* মাস্টারের কাছে তিনি শুনেছেন পাঁচ মিনিট থামার পর ট্রেনটা যাত্রা সুরু করেছিল। *স্টেশনের* প্লাটফর্মে তেমন কিছু ঘটার সুযোগ ছিলনা। পাক টিভি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। *স্টার টিভির* উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। ঐ টিভি নেটওয়ার্ককে প্রচার করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। কারণ, মোদী বলেছেন ঐ নেটওয়ার্ক হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা করছে বলে উল্লেখ করছিল। তারা এই ধরনের ভুল ভবিষ্যতে করবে না বলেছে, সেজন্য নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

স্টার টিভিকে বাধা দেওয়ার কারণ সঙ্গত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় সংবাদ মাধ্যমগুলিকে কিছুটা সংযত আচরণ করতে হয়। তাদের সবকিছু খোলাখুলি লিখতে নেই। কারণ, তাতে দাঙ্গার প্রসারণ ঘটে। সংবাদ পরিবেশনের সময় সাধারণতঃ 'দুটি সম্প্রদায়' বলেই উল্লেখ করা হয়, সম্প্রদায় দুটির নাম করা হয়না। পরে আমরা দেখেছি মোদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে সংবাদ মাধ্যমের কণ্ঠরোধ করার। বিশেষ করে স্টার টিভি নিষিদ্ধ করার কথাই বলা হয়েছে।

যাই হোক, দাঙ্গার কথাতেই আসা যাক। দাঙ্গা চলছিল, হিন্দুরাই দাঙ্গালীলায় মুখ্য ভূমিকায়। মুসলমানরা আক্রান্তদের তালিকায়। তবে, তারা একেবারে নিষ্ক্রিয় নয়। এবং এই দাঙ্গার বিশেষত্ব হচ্ছে প্রথম দিকের হত্যাকান্ডগুলি ঘটেছিল আগুনে পুড়িয়ে—গোধরা স্টেশনে যে পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়েছিল।

(এ ধরনের প্রথা ইসলাম ধর্মেই আছে। ব্যাপারটা একটা হাদিশ থেকে বোঝা যায়: "আনাস ইবন মালিক জানালেন যে এক ইহুদী একটি বালিকাকে পাথর মেরে মারাত্মক আহত করে তার একটি রূপার দুল কেড়ে নিয়েছিল। মুমূর্ষু বালিকাকে যখন আল্লাহ্‌র দূতের কাছে নিয়ে আসা হলো তখনও তার দেহে প্রাণ ছিল। কে সেই কুকর্ম করেছে জানার জন্য আল্লাহ্‌র দূত বিভিন্ন লোকের নাম বললেন তাকে। শেষে এক ইহুদীর নাম বলাতে সে ঘাড় নেড়ে সায় দিল। ইহুদীটিকে ধরে আনা হলো এবং সে দোষ কবুল করলো। তখন আল্লাহ্‌র দূত নির্দেশ দিলেন তার মাথা পাথর মেরে গুঁড়িয়ে দেওয়া হোক।" সহী মুসলিম—৪১৪২ নং হাদিশ।)

জীবনের বদলে জীবন ভারতীয় পরম্পরার বিরোধী। এখন ভারতীয়রা তাই করছে। ব্যাপারটা ভারতের ইতিহাসে অভিনব। প্রাক্তন সিবিআই ডিরেক্টর শ্যামল দত্ত লিখেছেন, "বি. কে নেহরু একদা পাকিস্তানের ক্যাবিনেট সেক্রেটারী চৌধুরী মুহাম্মদ আলিকে শুধিয়েছিলেন, পাকিস্তান কি একবার চিন্তা করেছে যে হিন্দুরা যদি একইভাবে 'হিন্দুধর্ম বিপদের মুখে' বলে চীৎকার করে তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে?

চৌধুরী মুহাম্মদ আলি বলেছিলেন, আমি সে ভয় করিনা । কারণ, তোমাদের ধর্ম ধর্মান্ধ সৃষ্টি করতে পারেনা।"

কিন্তু গোধরা-উত্তর ঘটনা মুহাম্মদ আলিদের সিদ্ধান্ত পাল্টে দিতে বাধ্য। বিধর্মী হত্যা, লুট ও ধর্ষণ এতদিন পর্যন্ত ইসলামী মৌলবাদীরা বিবেকের সায় নিয়ে করতো, কারণ, কোরানে

পৌত্তলিকদের দেখামাত্র হত্যা করার কথা বলা আছে (৯/৫), কোরানের একটি অধ্যায়ের নাম লুটের মাল (সুরা আনফাল), লুটের মালের ৮০ শতাংশ কোরান অনুযায়ী জেহাদীদের প্রাপ্য, আর সহী মুসলিমের ৩৪৩২ নং হাদিশে আছে জেহাদে লুঠ করা বিধর্মী নারীদের ভোগ করার কথা। হিন্দুরা আজকাল সেই সমস্ত কাজই করছে। গোধরা উত্তর দাঙ্গায় খুন, লুট, ধর্ষণ, সবই হয়েছে।

সহী মুসলিম এর ৩৪৩২ নং হাদিশ: "হজরত আবু সয়ীদ হইতে বর্ণিত আছে: রসলুল্লাহ্ হুনাইন যুদ্ধের তারিখে আওতাসের দিকে এক সৈন্যদল পাঠাইলেন। তাহারা শত্রুর সন্মুখীন হইলো এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিল, অবশেষে তাহাদের উপর জয়ী হইলো এবং বহু যুদ্ধবন্দিনী লাভ করিল। অতঃপর নবী করীমের সাহাবীদের মধ্যে কিছু লোক যেন বন্দিনীদের মুশরিক স্বামী থাকার কারণে তাহাদের সাথে সহবাস করাকে দুষনীয় মনে করিতে লাগিল। তখন আল্লাহতালা এ ব্যাপারে আয়াত নাজিল করিলেন।"

এখানে সাহাবী হচ্ছে হজরত মুহাম্মদের সহচর; মুশরিক অর্থ পৌত্তলিক। কোরানের বাক্যকে বলে আয়াত; নাজিল অর্থ উদ্ভব। কোরানের উদ্ভব হওয়া আয়াত টি হলো: *এবং নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ।* ৪.২৪

ইসলামী যুদ্ধে যাবতীয় পরাজিত ব্যক্তি—যোদ্ধা এবং অযোদ্ধা, যদি তাদের হত্যা না করা হয় তাহলে মুসলমানদের ক্রীতদাস-দাসী হয়ে যায়। দাঙ্গার সময় ডান হাতে দখল করা নারীদের সঙ্গে যৌন-সংসর্গ সেজন্য ইসলাম-সম্মত।

একসময় স্বল্পসংখ্যক মুসলমানের ভয়ে গোটা হিন্দুসমাজ কাঁপতো। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে মোপলা বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই তিনি মালাবার অঞ্চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখে এসেছিলেন চল্লিশ লাখ হিন্দু এক লাখ মুসলমানের ভয়ে মারাত্মক রকমে অভিভূত। হিন্দুরা সেদিন এতো দুর্বল, এমনি অসহায়ভাবে বেঁচে ছিল।

এখন দিন পাল্টে গেছে—অন্ততঃ গুজরাটে। এখন আর মুসলিমদের অত্যাচারের ভয়ে হিন্দুরা কাঁপছে না। গাঁধিজী একদা বলেছিলেন, আমার অভিজ্ঞতা এই মত সমর্থন করে মুসলমানরা সাধারণভাবে গুন্ডা আর হিন্দুরা সাধারণভাবে কাপুরুষ। আমি এই ঘটনা দেখেছি ট্রেনের মধ্যে, রাস্তায় এবং যে সমস্ত ঝগড়া আমি নিজে মিটমাট করেছি। নিজেদের কাপুরুষতার জন্য কি হিন্দুরা মুসলমানদের দায়ী করবে? যেখানে কাপুরুষ আছে সেখানে সর্বদা গুন্ডারা থাকবে।

এখন হিন্দুরা কাপুরুষত্বের খোলস ছেড়ে মারামারি করতে শিখেছে। এখন আর ওয়াক ওভার নয়। এখন চলছে রক্তের বদলে রক্ত। মারের বদলে মার।

কিন্তু অবস্থা পাল্টাতে আরম্ভ করলো ১৬ই মার্চ থেকে। ঐ তারিখে আমেদাবাদ থেকে পি.টি আই এর রিপোর্ট: গতকাল অযোধ্যায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শিলাদানের অনুষ্ঠানটি ভালোয় ভালোয়

কাটলেও আমেদাবাদের দাঙ্গা বিধ্বস্ত করঞ্জ, কালুপুর ও শাহপুরে চাপা উত্তেজনার বারুদে স্ফুলিঙ্গ পড়ে অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে। হাজার হাজার মানুষ 'রামধুন' অনুষ্ঠান সেরে ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে হিংসা। খুন হন কংগ্রেসী এম.পি নীতিশ কুমার পারমারের ভাইপো। সহরের পুরানো এলাকাগুলি আবার কার্ফুর কবলে পড়ে। রাত কেটে ভোর হবার পরই মধুপুরা থানার দুধেশ্বরে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে লোক ঘরবাড়ী ছেড়ে অগ্নিসংযোগ ও পাথর ছোঁড়াছুড়িতে মেতে ওঠে। কিছু লোক মোটরবাইকে চড়ে এলোপাথারী গুলি চালাতে থাকে বলে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা জানিয়েছেন। দরিয়াপুরেও ছড়িয়ে পড়ে অশান্তি।

এই সমস্ত বিবরণ পড়ে বোঝা যাচ্ছে দাঙ্গা এখন আর একতরফা নয়। মুসলমানরাও দাঙ্গায় মেতেছে। ২২শে এপ্রিল গান্ধীনগর থেকে *স্টেটস্‌ম্যান নিউজ সার্ভিস* জানাচ্ছে: "নতুন করে হিংসায় আমেদাবাদের শাহপুর, বেরহমপুর, খানপাড়া, মির্জাপুর এলাকায় সাতজন মারা গেছে। দুজন পুলিস ফায়ারিং এ এবং পাঁচজন ছুরিকাঘাতে। গতদিনের আহতদের মধ্যে আরও ছ জনের মৃত্যু ঘটায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪ এ।" "গতকালের হিংসায় ২৪ জনের মৃত্যু ঘটেছে তার প্রতিক্রিয়ায় গৃহপ্রতিমন্ত্রী গোবর্ধন ঝাপাটিয়া জানালেন, পুলিশের গুলিচালনা সম্পর্কে তদন্ত করার কিছু নেই। তাঁর মতে বেশীভাগ মৃত্যুই ঘটেছে ছুরিকাঘাতে এবং ব্যক্তিগত বন্দুক থেকে গুলি চালনায়।"

দি স্টেটস্‌ম্যান এর পরে লিখেছে, "সংবাদ অবশ্য বলছে, রবিবার গোমতীপুরে কনস্টেবল অমর সুরেশ রাও পাতিলের ছুরিকাঘাতের পর পুলিশের প্রতিশোধ বাড়াবাড়ি রকমের। ছুরিকাঘাতের পর গোমতীপুর, কাগাদিপেট, শাহপুর এবং বাপুনগর এলাকায় পুলিস কড়া প্রত্যাঘাত করে।" "মন্ত্রী বলেন, পাতিল যখন কাজে যাচ্ছিলেন তখন এক জনতা তার গতিরোধ করে। তাকে এক ধর্মীয় স্থানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়।"

দেখা যাচ্ছে গুজরাট দাঙ্গায় মুসলমানরা পুলিস খুনও করেছে। এবং *দি স্টেটস্‌ম্যান* দাঙ্গার ক্ষেত্রে দেখামাত্র গুলি করার বিধানে বিশ্বাস করলেও যখন দেখা যাচ্ছে মুসলমানরা মারা পড়ছে তখন পত্রিকাটি পুলিশের বাড়াবাড়ি দেখছে!

ইতিমধ্যে গোধরা কান্ডের মূল নায়ক, যে দমকলের গাড়ী আটকাচ্ছিল তার পরিচয় জানা গেছে। তার নাম হাজি বিলাল ইসমাইল সুলেজা। ১৯৯২ অব্দে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের আগে পরে বিলাল পাকিস্তানে গিয়েছিল। বিলাল পাঁচমহল জেলার কংগ্রেসী। বিগত পুর নির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিট না পেয়ে নির্দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়। পাকিস্তানের করাচীর সঙ্গে বিলালের যোগাযোগ আছে। এফ.আই .আর এ বিলাল ছাড়াও আরও আট জনের নাম আছে।

২৩ শে মের খবর, গোধরা কান্ডের অভিযোগে ৬৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে ৩ রা জুনের খবর গুলবার্গ সোসাইটি হত্যাকান্ডে (এহসান জাফরী যে ঘটনায় নিহত হন) ৫০ জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দেওয়া হয়েছে। ক্রাইম ব্রাঞ্চ এ ধরনের

আরও ৪৫ টি মামলার কাগজ তৈরী করছে। নারোদা পাতিয়া মামলার চার্জশীট শীঘ্রই দেওয়া হবে। ২২ শে এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী জানালেন একত্রিশ হাজার দাঙ্গাকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সুতরাং গুজরাটের দাঙ্গা আরম্ভ করেছে মুসলমানরা, অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে, মসজিদ থেকে প্ররোচনা দিয়ে; হিন্দুরা প্রতিআক্রমণে বহু মুসলমানকে হত্যা করেছে, লুট-ধর্ষণ কিছুই বাদ পড়েনি। মুসলমানরাও একেবারে চুপ ছিলনা, তারাও পরে দাঙ্গা করেছে, এমনকি পুলিশকেও খুন করেছে। খুন করেছে কংগ্রেসী এম.পি পারমারের ভাইপোকে। ক্ষয়ক্ষতি মুসলমানদেরই বেশী। ব্যাপারটা স্বাভাবিক। কারণ, সমরের নিয়ম অনুসারে অন্য সব কিছু সমান থাকলে সংখ্যালঘিষ্ঠরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই প্রসঙ্গে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের কোহাটের দাঙ্গার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ঐ দাঙ্গা বাধিয়েছিল হিন্দুরাই। কিন্তু যেহেতু হিন্দুরা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ, কোহাটের সমস্ত হিন্দুদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। হিন্দুদের রক্ষা করার অন্য উপায় ছিলনা।

দাঙ্গায় মুসলমান বেশী মরলেও পুলিশের গুলিতে বেশী মরেছে হিন্দুই। এও দাঙ্গার নিয়ম। এর থেকে নিরপেক্ষ মানুষ সহজেই বুঝতে পারবেন, গুজরাটের দাঙ্গা ভারতে সংঘটিত বহু দাঙ্গার মত আর একটি দাঙ্গাই। অভিনবত্ব একটাই : এ দাঙ্গায় হিন্দুরা ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম সমান নৃশংসতা প্রদর্শন করেছে। দেখা যাচ্ছে হিন্দু ধর্মের সেমায়ন (Semitisation) ঘটছে। হিন্দুরা অনুসরণ করছে কোরান-হাদিশ বিহিতবিধি-বিধান। এবং প্রয়োগ করছে অবশ্যই মুসলমানদের বিরুদ্ধে!

দুই

গোধরা অগ্নিসংযোগ ও প্রচার মাধ্যম

আগেই বলেছি, ধর্মেতরবাদী প্রচার মাধ্যম গোধরা কান্ডকে চুনকাম করার জন্য ব্যস্ত। *হিন্দুস্থান টাইমস* গোধরার অগ্নিসংযোগকে অযোধ্যার রামমন্দির আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ বলে ধরে নিতে উৎসুক। তাদের মতে, অমানবিক ও হিংস্র হলেও সে প্রতিবাদের বৈধতা আছে। ধর্মেতরবাদীরা ধরে নেন বাড়ীতে একজন রাগী বাবা আছেন। যে বাবা যাতে কোনও রকমে রাগ না করেন তার জন্য বাড়ীর শিশুদের তটস্থ থাকতে হয়। ভারতীয় সংবিধানে লেখা না থাকলেও আমাদের রাগী বাবা রাগ করতে পারেন এমন কোনও কাজ করা চলবে না। সুতরাং বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে তার 'বিপজ্জনক' কার্যক্রম ত্যাগ করতে হবে।

কিন্তু বিশ্বহিন্দু পরিষদের কাজ কর্মের কঠোর সমালোচনা করেও গোধরা অগ্নিকান্ডের আগুন চাপা দেওয়া যাচ্ছে না। অভিযোগ থেকে ইসলামী মৌলবাদীদের খালাস করে আনা দরকার। সুতরাং ধর্মেতরবাদী প্রচার মাধ্যম বিভিন্ন রকম কার্যপ্রণালী স্থির করলো। সেগুলি হলো:

(১) ট্রেনের বগী জ্বালানোর একটি গুরুতর কারণ উদ্ভাবন করা।

(২) দাঙ্গাকারী হিন্দুদের একটা বীভৎস ছবি আঁকা।

(৩) সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীকে দাঙ্গার সমর্থক বলে প্রতিপন্ন করা।

আগেই বলেছি *টাইমস অফ ইন্ডিয়া* ৩ রা মার্চ মুখ্যমন্ত্রীর মুখ দিয়ে বলিয়েছিল, "ব্যাপারটা নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রের মত।"

১ লা মার্চ *অল ইন্ডিয়া মুসলিম মজলিশ-ই-মুশাওয়ারাত* ধিক্কার দিল "হিন্দুত্ববাদের আদর্শ রাজ্য গুজরাটে পরিকল্পিত সংগঠিত, সুনিপুণ, নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যাকান্ড ও তাদের সম্পত্তি ধ্বংসকে।" সেখানে রাজ্যের পুলিশকে নীরব দর্শক ও সাহায্যকারী বলেই বর্ণনা করা হলো।

মুসলিম মজলিশের কাছ থেকে এসব অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু অপ্রত্যাশিত *টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, হিন্দু, হিন্দুস্থান টাইমস* প্রভৃতি ইংরেজী মাধ্যম সংবাদপত্রগুলি যখন মুসলিম মজলিশের কথাগুলিই পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো। প্রথমতঃ তারা গোধরা হত্যাকান্ডের জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদকেই দুষতে লাগলো—ইসলামী মৌলবাদীদের নয়। দ্বিতীয়তঃ তারা দাঙ্গার জন্য দুষতে লাগলো মোদীকে। মোদী কেন মন্ত্রবলে দাঙ্গা থামাতে পারছেন না। বলতে লাগলো, প্রতিবর্তী দাঙ্গা পূর্বপরিকল্পিত।

এইসব সংবাদ মাধ্যমগুলি কী প্রত্যাশা করেছিল? গোধরা অগ্নিসংযোগের কোনও প্রতিক্রিয়া হবেনা, দোষটা ভি.এইচ.পি'র রাম-জন্মভূমি আন্দোলনের উপর চাপিয়ে গোধরার মুসলমানদের জেহাদী মানসিকতাকে চুণকাম করে দেওয়া যাবে? বলা হবে ইসলাম মানে শান্তি হে! এম.এন রায় বলে গেছেন! বলে গেছেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন।

এর পর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক ৭ ই মার্চে *দি স্টেটস্‌ম্যানে* প্রকাশিত *সত্য ঘটনা আমরা জানতে পারবো কী?* শীর্ষক পত্র। এটি লিখেছিলেন আমেদাবাদ থেকে তাজুদ্দিন নামক এক পত্রদাতা, ৫ই মার্চ।

তাজুদ্দিনের গল্প

সবরমতী এক্সপ্রেসের এস-৬ ও অন্য দুটি কামরায় ভি.এইচ.পি'র করসেবকরা যাচ্ছিল। এবং এস-৬ কামরার করসেবকদের জন্যই ঘটনাটা ঘটে। ঘটনার শুরু হয় গোধরা থেকে ৭৫ কিলোমিটার দূরবর্তী দাহোদ স্টেশন থেকে। সকাল ছটা থেকে সাড়ে ছটার মধ্যে ট্রেনটা দাহোদ স্টেশনে পৌঁছয়। সেখানে করসেবকরা রেলের স্টলে চা-টা খেয়ে স্টল মালিকের সঙ্গে বচসা করে স্টলটা ভেঙে দেয়। স্টল মালিক স্থানীয় থানায় করসেবকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। তারপর সাতটা থেকে সাতটা পনেরোয় গাড়ীটা গোধরায় পৌঁছয়। রিজার্ভ কামরা থেকে সব করসেবক নেমে পড়ে এবং প্লাটফর্মের ছোট স্টলে চা-টা খেতে আরম্ভ করে। স্টলটা এক বৃদ্ধ দাড়িওয়ালা মুসলমানের। এক চাকর সাহায্য করে বৃদ্ধকে। করসেবকরা এই বৃদ্ধের সঙ্গে গোলমাল পাকিয়ে তাঁর দাড়ি ধরে মারতে থাকে। মুসলমান দেখে করসেবকদের এই কাজ পরিকল্পনা মাফিক। করসেবকরা ধ্বনি দিচ্ছিল, "মন্দির কা নির্মাণ করো, বাবর কী অওলাদ কো বাহার নিকালো।"

এইসব শুনে বৃদ্ধের ষোল বছরের কন্যা এগিয়ে আসে এবং তার পিতাকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করে। সে করসেবকদের কাছে অনুরোধ করে তার পিতাকে না মারতে। কিন্তু তার অনুরোধে কর্ণপাত করার বদলে মেয়েটিকে এস-৬ কামরার মধ্যে টেনে নিয়ে যায় করসেবকরা এবং কামরার দরজা বন্ধ করে দেয়। ট্রেনটা গোধরার প্লাটফর্ম ছেড়ে চলে যেতে থাকে। বুড়ো মানুষটা কামরার দোরে ধাক্কা দিতে থাকেন কন্যাকে নিয়ে যেতে দেখে। তাই দেখে ট্রেনটা প্লাটফর্ম ত্যাগ করার শেষ মুহূর্তে দুজন স্টল মালিক গার্ড কেবিনের পরে শেষ কামরায় উঠে পড়ে এবং মেয়েটিকে রক্ষা করার জন্য ট্রেনের চেন টেনে থামায় গাড়ীটিকে। ট্রেনটা যে জায়গায় থামে সেটা স্টেশন থেকে ১ কিলোমিটার দূরে।সেই দুজন স্টল মালিক এস-৬ কামরার কাছে এসে মেয়েটিকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করে। ঐ অঞ্চলের লোকরা জড় হতে থাকে ট্রেনের কাছে। তারা এস-৬ কামরার কাছে এসে করসেবকদের বলে মেয়েটিকে ফেরত দিতে। কিন্তু মেয়েটিকে ফেরত না দিয়ে তারা কামরার জানলা বন্ধ করে দেয়। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে উপস্থিত জনতা। তারা পাথর ছুঁড়তে থাকে কামরা লক্ষ্য করে। এস-৬ এর পাশের দুটি কামরায়ও করসেবকরা ছিল। ট্রেনে ব্যানার ও লাঠি নিয়ে চলছিল তারা। করসেবকরা নীচে নেমে সেই লাঠি দিয়ে জনতাকে মারতে আরম্ভ করে। এটা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবার মত এবং জনতার ক্রোধ সীমা অতিক্রম করে গেল। জনতা সিগন্যাল ফড়িয়ার (গোধরার একটি অঞ্চল) ট্রাক ও রিক্সা থেকে ডিজেল ও পেট্রোল আনে এবং কামরাটা পুড়িয়ে দেয়। তারা পেট্রোল পাম্প থেকে তেল আনেনি, যেমন সব জায়গায় লেখা হয়েছে। এই আগুনে পোড়ানোর ব্যাপারটা পূর্ব পরিকল্পিতও নয়, এটা হটাৎই ঘটে গেছে ক্রোধ ও হতাশা থেকে। ঘটনার বিবরণ শুনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা সিগন্যাল ফড়িয়ার গ্যারাজগুলি পুড়িয়ে দেয় এবং পুড়িয়ে দেয় সেহড়া ভাগাড় অঞ্চলের বাদশাহী মসজিদও।

জনাব তাজুদিন গল্পটা ভালই ফেঁদেছেন। চেষ্টা করলে উনি একজন ভাল গল্পকার হতে পারেন। তবে ওনার অপরাধমূলক গল্প রচনায় কিছু গুরুতর ত্রুটি আছে। ভবিষ্যতে গল্প লেখার সময় ওনাকে সতর্ক হতে হবে। কারণ, উনি বলেননি ষোল বছরের কিশোরীটির কী হয়েছিল? সে সমেত কি কামরায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়? না তাকে ছেড়ে দিয়েছিল ভি.এইচ.পির সদস্যরা? তাকে ছেড়ে দেবার পর গোলমালের তেমন কারণ থাকেনা। জনতার স্থানত্যাগ করাই স্বাভাবিক। আবার নিজেদের সন্তান সমেত মুসলমানরা কামরাটিতে আগুন দিয়েছে, সেটাও অসম্ভব। সুতরাং গল্পটা ঠিক দাঁড়াচ্ছেনা জনাব তাজুদিন; নতুন করে গল্পটা লিখুন, আমি প্রকাশ করার ব্যবস্থা করবো।

আর একটা ব্যাপারেও গল্পটা মার খেয়ে গেছে। রেল লাইনের ধারে পাথরের অঢেল সরবরাহ। সেখানে ঢাল ছাড়া শুধু লাঠি নিয়ে মারমুখী জনতার মোকাবিলা করতে পুলিশও সাহস করেনা। সেখানে পুলিশের গুলি চালনা করা ছাড়া উশৃঙ্খল জনতার মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। সুতরাং ভিএইচ.পির সদস্যরা ব্যানারের লাঠি দিয়ে মারমুখী জনতা, যারা রেল লাইনের পাথর ছুঁড়ছে, তাদের পেটাতে যাবে কামরা থেকে নেমে, এটা অসম্ভব চিন্তা।

করসেবকদের কাছে আত্মহত্যারই সামিল।

সুতরাং যুক্তিবাদী পাঠকের চোখে তাজুদ্দিনের গল্প টিকছে না। তাছাড়া ঘটনার পরের দিন ২৮ শে ফেব্রুয়ারী কোনও সংবাদেই ১৬ বছরের মেয়ে তুলে নিয়ে যাবার কথা নেই।

আবার ৩ রা মার্চের *হিন্দুস্থান টাইমস*এ যত্ন করে ছাপা ভিজু বি'র লেখা। সেটা আরও যত্ন করে ছাপা হয়েছে সাহাবুদ্দিনের *মুসলিম ইন্ডিয়া* কাগজে। দেখা যাক সে গল্প:

ট্রেন গণহত্যার পিছনে পাকা মাথা?

.......যে ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ঘটনায় তারা পুলিশকে তেমন কোনও তথ্য দিতে পারেনি। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে ঘটনাটা পূর্বপরিকল্পিত।

করসেবকরা স্টেশনের স্টল লুট করে এবং উত্তেজনমূলক স্লোগান দেয়। গত কুড়ি দিন ধরেই তারা এ কাজ করছে। .... ট্রেনটাকে গোধরা থেকে এক কিলোমিটার দূরে সিঙ্গালিলা বলে একটা জায়গায় কারও দ্বারা চেন টেনে থামানো হয়। এবং তখন একটা ক্রুদ্ধ জনতা ট্রেন আক্রমণ করে।

এই লোকগুলি কোথা থেকে এসেছিল এবং এর মধ্যে কারা ছিল? এর কোনও স্পষ্ট উত্তর নেই। মূল সন্দেহভাজন গোধরার এক মুসলিম মৌলবাদী গুচ্ছ, যারা পুলিশের মতে ওসামা বিন লাদেনের অনুগত। এট সম্ভবতঃ একটা আস্ফালন ছাড়া কিছুই নয়। এর সদস্যরা অপরাধ ইতিহাস সহ কিছু বেকার যুবক। এই গুচ্ছের নাম *তবলিগি জামাত*।

কিন্তু তারা ২৭শে ফেব্রয়ারী আঘাতের দিন স্থির করলো কেন?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, পুলিশ বলছে, কিছুদিন ধরে করসেবকদের বিরুদ্ধে শত্রুতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা ঐ এলাকার মুসলিমদের প্ররোচিত করছিল, এবং ঐ ঘটনার দিনে তারা লঙ্ঘন করে বসেছিল সমস্ত সীমা। ১৫ মিনিট ধরে তারা প্লাটফর্মের মুসলমানদের স্টলগুলি লুট করেছিল। টিটকারী দিয়েছিল তাদের দাড়ি ও পোষাক সম্বন্ধে। এবং গুজব রটেছিল যে তারা একটা মসজিদ আক্রমণ করেছিল ও এক মুসলিম মহিলার শ্লীলতাহানি করেছিল, যদিও ঘটনা দুটি ঘটেনি।

এবং পুলিশ বলছে কেউ ঐ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ঐ ট্রেনে উঠেছিল এবং চেন টেনে থামিয়েছিল গাড়ী। এটাই পুলিশের মতে চক্রান্তের একটি বড় সাক্ষ্য।

ভিজু বি পুলিশের মুখ দিয়ে অনেক গল্প বানিয়েছেন। তিনি ট্রেনটিকে গোধরায় ১৫ মিনিট থামিয়েছেন। কিন্তু ট্রেনটা ৫ মিনিট থেমেছিল--৫ মিনিটই। পাঁচ মিনিটে এমন কোনও ঘটনা ঘটতে পারেনা যার জেরে কয়েক মিনিট (৫?) পরে ৫০০ মিটার দূরে ১৩০০ লোক জমে গেল। ভিজু বি তার গল্পে করসেবকদের দিয়ে প্লাটফর্মের স্টল ১৫ মিনিট ধরে লুট করিয়েছেন, যদিও বাস্তবে ওসব ঘটনা আদৌ ঘটেনি।

কিন্তু যেসব ধর্মেতরবাদীদের রক্তের প্রতিটি লোহিতকণিকার মধ্যে হিন্দু-বিদ্বেষ, তাদের কাছে

তাজুদিনের গুল্প বা ভিজু বি' র গুল্প অত্যন্ত প্রার্থিত ধন। গেরুয়া বসনধারী স্বামী অগ্নিবেশ ও মাইনরিটি কমিশনের সদস্য ভালসন থাম্পু ২০ শে মার্চ স্টেটস্‌ম্যানে লিখলেন, *রামভক্তরা প্লাটফর্মের ভেন্ডারদের ঠকিয়েছে, মুসলমানদের গালাগাল দিয়েছে। নারীদের অবমাননা করেছে, সম্ভবতঃ তাদের করসেবার অঙ্গ হিসাবেই।*

একই সঙ্গে ওঁরা লিখলেন, *নেহাৎ গন্ডোগোলের আশঙ্কা করেই সিমিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।*

কদিন পরেই ২৬ শে মার্চ দিল্লী হাইকোর্ট সরকারের সিমিকে নিষিদ্ধকরণ সমর্থন করলো। বিচারপতি স্বীকার করলেন, সিমির সঙ্গে হিজবুল মুজাহিদিনের সম্পর্ক আছে। কারণ, দিল্লীতে ২০০১ এর মে মাসে সেনা ভবনের কাছে একটা বিস্ফোরণের দায়ে গোলাম মুইদিন শাহ ও ডাঃ গুলজার আমেদ ওয়ানী নামক দুজন হিজবুল মুজাহিদিন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তারা স্বীকার করেছিল ঐ নাশকতামূলক কর্মে সিমির সক্রিয় সমর্থনের কথা। অন্যদিকে ১১ই এপ্রিল উত্তর প্রদেশের ভাদোহী থেকে পি.টি.আই জানাচ্ছে, গোধরায় রামসেবকদের হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত সিমি নেতা আনোয়ার রশিদ আজ ধরা পড়েছে। উত্তর প্রদেশের ভাদোহী জেলা থেকে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। ভাদোহীর এস.পি বি. পি. ত্রিপাঠী জানান, সে সিমির প্রথম সারির নেতা। জেরার মুখে সে স্বীকার করে ভাদোহী থেকে ফোনে সে অনুগামীদের নির্দেশ দিয়েছিল, কী ভাবে রাম সেবকদের ওপরে হত্যাকান্ড চালাতে হবে।

এইসব তথ্য থেকে স্বামী অগ্নিবেশ ও ভালসন থাম্পুর কুৎসিত চরিত্রটা বোঝা যায় সহজেই। বোঝা যাচ্ছে মাইনরিটি কমিশনের কাজ হিন্দু-বিদ্বেষ প্রচার করা। পরে আমরা দেখবো শুধু অগ্নিবেশ বা ভালসন থাম্পু নয়, পশ্চিমবঙ্গের বহু বুদ্ধিজীবি তাজুদিনের গল্প বা ভিজু বী' গল্পকে কাজে লাগিয়ে হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার করেছেন।

হিন্দুদের অত্যাচারীরূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা তাজুদিন থেকে শুরু হলেও এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ শিল্পী হলে আই. এ. এস অফিসার হর্ষ মান্দার। মহাশ্বেতা দেবী তার কথা জানিয়েছেন বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে। তিনি লিখেছেন, "হর্ষ বলছেন"..."সেই রমণীকে কী বলা যাবে, যার গর্ভে আট মাসের শিশু, যে কাতর ভিক্ষা জানাচ্ছিলেন, ঘাতকেরা তার পেট চিরে দেয়, গর্ভস্থ শিশুকে বের করে নেয়, কেটে ফেলে, কিন্তু জননী মরেনি।"

একই পরিবারের উনিশজনকে হত্যার এক কাহিনী ফাঁদা হয়েছে, ঐ উনিশজন যে বাড়ীতে ছিল সেই বাড়ী প্রথমে জলে খানিক ডোবানো হয়, তারপর হাই টেনসন লাইন দিয়ে তাদের তড়িত-প্রবাহ দ্বারা হত্যা করা হয়।

বলা বাহুল্য এ সবই কুৎসিৎ অপপ্রচার। কর্তৃপক্ষের কাছে এই ধরনের অভিযোগ কেউই করেনি। দাঙ্গাকারীরা সবসময় অত্যন্ত দ্রুত কাজ করে। কারণ, পুলিশ আসার আগেই কুকর্ম সেরে ফেলতে হয়। তারা শল্যচিকিৎসক নয় যে ধীরে সুস্থে এমন শল্য চিকিৎসা করবে যাতে শিশুর মা বেঁচে যাবে, আবার আস্ত শিশুকে বের করে তারা কাটবে। বীভৎস গল্পটা দাঁড়াতো, যদি বলা হতো গর্ভস্থ শিশুসমেত গর্ভবতী রমণীর পেট কেটে ফেলা হয়েছে। কিন্তু গুজরাটের

দাঙ্গার আদল অন্য দাঙ্গার থেকে মোটেই পৃথক নয়। অগ্নিসংযোগ, হত্যা, লুন্ঠন—এই তিনটিই দাঙ্গাতে বেশী ঘটে থাকে। গুজরাটেও তাই ঘটেছে। নৈরাজ্যের অবস্থাতে ধর্ষণও ঘটে থাকে, গুজরাটেও ঘটেছে নিশ্চয়। কিন্তু যে হারে ও যে প্রকারে ধর্ষণের কথা বলা হচ্ছে, সে হারে ও সে প্রকারে মোটেই নয়। আর পুলিশ যে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে ছিলনা, তার প্রমাণ ৩১ হাজার জন গ্রেপ্তারের মধ্যে। এ ছাড়া পুলিশের গুলিচালনায় মারা গেছে বহু হিন্দুও। মোট হিন্দুও মরেছে তিনশোর বেশী। আর এরা সবাই পুলিশের গুলিতে মরেনি। মরেছে প্রতিপক্ষের অস্ত্রাঘাতেও।

বলা হচ্ছে হিন্দু দাঙ্গাকারীরা কম্পিউটারে ছাপা লিস্ট নিয়ে বেরিয়ে তা পড়ে পড়ে বেছে বেছে মুসলমানদের বাড়ী ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আক্রমণ করেছে। এতে নতুনত্ব কিছু নেই। যারা ক্লাব চালান বা বারোয়ারী পূজা করেন তারা জানেন শহরের কোন ব্যবসা হিন্দুর আর কোন ব্যবসা মুসলমানের। রাজনৈতিক দলের লোকেরা প্রত্যেকটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিকের নাম জানেন। কারণ তাদের চাঁদা তুলতে হয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। এখানে, পশ্চিমবঙ্গে, বামপন্থী রাজনৈতিক দলের ক্যাডাররা নিজের অঞ্চলের কে কংগ্রেস কে তৃণমূল কে বিজেপি তা সবই জানেন এবং ভোটের সময় ভোটার লিস্ট দেখে হিসাবও করেন। আগে যখন ভোটে বুথওয়াড়ী ভোট গণনা হতো, তখন ভোটের পরও মিলিয়ে মিলিয়ে দেখা হতো নিজেদের আন্দাজ। এমনকি পঞ্চাশ ষাটের দশকে আমরা যখন কোলকাতার কলেজে ছাত্র ফেডারেশন করতাম তখন সহপাঠীদের সঙ্গে কথা বলে তার রাজনৈতিক ঝোঁক জেনে আমাদের প্রাপ্তব্য ভোট আন্দাজ করতাম, হিসাবও করতাম কাগজে লিখে। যারা শহরের কালীপূজা-দুর্গাপূজার সংগঠক, তারাও জানে কোন ব্যবসা সংস্থার মালিক কে?

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নিশ্চয় ঘাসে মুখ দিয়ে চলার জন্য সংগঠন করেনি। তাদেরও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অবশ্যই চাঁদা তুলতে হয়। জানতে হয় ব্যবসায়ীদের পরিচয়। এবং কম্পিউটারের যুগে সবকিছুই কম্পিউটারে হয়। আর কোলকাতার দাঙ্গার কথা যদি বলতে হয় তাহলে ছাত্রজীবনে নিজস্ব অভিজ্ঞতায় দেখেছি, বেছে বেছে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের মুসলমানদের দোকানগুলিই আক্রান্ত হতো। যদিও দোকান দেখে বাইরে থেকে মালিকের পরিচয় আন্দাজ আমরা করতে পারতাম না। পরিচয় জানার কারণ দাঙ্গাকারীদের মাথা নামক কম্পিউটারে দোকান মালিকের পরিচয় লেখা থাকতো। আবার লীগ আমলে বেছে বেছে হিন্দুদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকেই আক্রমণ করা হতো। পাড়ার মধ্যে বেছে বেছে হিন্দু বাড়ীগুলিকেই লক্ষ্য করা হতো আক্রমণের। কারণ সেই মাথার কম্পিউটার।

আর দাঙ্গার রোষটা স্বতঃউৎসারিত হয়, অভিব্যক্তি হয় পরিকল্পিত। দাঙ্গাকারীদের লক্ষ্যবস্তু থাকে। তারা নিজেদের ঘরে আগুন জ্বালায় না। নিজের বুকেও ছুরি বসায় না। ছুরি বসায় যাদের উপর ক্রোধ হয় তাদের বুকে। এটাই দাঙ্গার চরিত্র। দাঙ্গাটা স্বতঃউৎসারিত; কারণ, সংবাদপত্র থেকে আমরা দেখেছি, গোধরা অগ্নিসংযোগের দিন থেকেই সংখ্যালঘুদের হত্যা শুরু হয়েছে।

দাঙ্গাকারীদের বীভৎস রূপ আঁকা হয়েছে এইভাবে: *সকলেরই খাঁকি পোষাক, স্লোগান*

দেওয়া তরুণরা গেরুয়া কোমরবন্ধে সজ্জিত। ট্রাকে ছিল তেজী ও আধুনিক বিস্ফোরক.....

কিন্তু দাঙ্গাকারীদের যেসব ছবি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ঐরকমের কোনও পোষাক দেখা যাচ্ছে না। *গুজরাট : নরমেধ যজ্ঞ* পুস্তকে বেশ কিছু দাঙ্গার ছবি আছে। তাতে দাঙ্গাকারীদের পোষাকের কোনও বিশেষত্ব নেই। থাকা সম্ভবও নয়। হিন্দুরা নির্বোধ সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা এতো নির্বোধ নয় যে সুনির্দিষ্ট পোষাক পরে নিজেদের সত্তা প্রকাশ করবে।

দাঙ্গার সব রকম বীভৎস ছবির এক সংকলন করেছেন বুকার পুরস্কার প্রাপ্তা লেখিকা অরুন্ধতী রায়। ৬ ই মের *আউটলুক* পত্রিকায় প্রকাশিত মূল প্রবন্ধ থেকে তার কিছু কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে *গুজরাট দিচ্ছে ডাক* পুস্তকে। এতে লেখা হয়েছে দাঙ্গাকারীরা এহসান জাফরীর কন্যাদের নগ্ন করে পুড়িয়ে মারে। পরে ২৭ মের *আউটলুকে* লেখিকা ক্ষমা চেয়েছেন জাফরী পরিবারের কাছে (কিন্তু পাঠকের কাছে নয়)। সেখানে তিনি স্বীকার করেছেন গুজরাটে গুজব একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। এবং তিনি গুজব দ্বারাই গ্রস্ত হয়েছেন। এহসান জাফরীর কন্যা সংক্রান্ত গুজবটির তিনি সমর্থন পেয়েছিলেন ১১ ই মার্চের *টাইম* ম্যাগাজিনে প্রকাশিত মীনাক্ষী গাঙ্গুলী ও অ্যান্টনী স্পেথের নিবন্ধ থেকে এবং, *গুজরাট কার্নেজ ২০০২: এ রিপোর্ট টু দি নেশন* (গুজরাটের ব্যাপক হত্যালীলা ২০০২: জাতির কাছে একটি প্রতিবেদন) নামক স্বাধীন তথ্যসংগ্রহকারী মিশনের প্রতিবেদন থেকে। ঐ মিশনের মধ্যে আছেন কে.এস. সুব্রামানিয়াম নামক ত্রিপুরার প্রাক্তন আই জি এবং প্রাক্তন ফিনান্স সেক্রেটারী এস পি শুক্লা। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে ঐ তথ্য সংগ্রহকারী জোচ্চোর মিশন জাতির কাছে কী জোচ্চুরীর বার্তা দেবেন। আর বিশ্বজুড়ে যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলছে তার প্রমাণ *টাইম* ম্যাগাজিনের ঐ কুৎসা ছড়ানো প্রবন্ধ।

গুজরাটের দাঙ্গা ইসলাম-ধর্মেতরবাদী অক্ষের হাতে সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে বিজেপিকে হেয় করার পক্ষে। প্রথম থেকেই তারা দাবী করছে রাষ্ট্রপতির শাসন। দাবী করছে, প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় সরকার সঙ্ঘপরিবারের সঙ্গে যোগসাজস করে মুসলিম হত্যা করছে। তারা প্রধানমন্ত্রীর মুখের কথা বিকৃত করছে। নরেন্দ্র মোদীর মুখে বসাচ্ছে নিউটনের গতিসূত্রের কথা। ৩ রা জুনের *আউটলুক* পত্রিকায় লেখা হয়েছে, দাঙ্গার সময় অফিসারদের নিষ্ক্রিয় থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদী এর জন্য *আউটলুক* পত্রিকাকে মানহানির মামলা করার জন্য আইনী চিঠি পাঠিয়েছেন।

হিন্দুদের হেয় করার জন্য ইসলাম-ধর্মেতরবাদী অক্ষের আর এক অস্ত্র নানারকম তথ্য সংগ্রহকারী কমিশন বসানো। একটি কমিশন ও তার তঞ্চক সদস্যর কথা উপরেই বলেছি। এরা কী রিপোর্ট দেবে তা আগে থাকতেই আন্দাজ করা যায়। এরা নানারকম গল্প তৈরী করে সরকার ও হিন্দুদের দুষবে। দ্বিতীয় একটি কমিশনের নাম *কনসার্নড সিটিজেন্স ফোরাম*। এই কমিশনের সভাপতি হচ্ছেন সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আয়ার। এই ভদ্রলোকটির অপর পরিচয় তিনি মুসলিম মৌলবাদী সাহাবুদ্দিনের *মুসলিম ইন্ডিয়া* নামক পত্রিকার সম্পাদকীয় পরামর্শদাতা। সঙ্গে আছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরাল এবং খুশবন্ত সিং। এই পরামর্শ তাঁরা বিনা পয়সায় দেন, এমন সংবাদ আমাদের কাছে নেই। আর

সাহাবুদ্দিন হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি শাহবানু মামলার পর একদল মুসলমান নিয়ে রাজীব গান্ধীর কাছে গিয়ে ধমক-ধামক দিয়ে রাজীব গান্ধীকে বাধ্য করেন সংবিধান সংশোধন করতে। *দি স্টেটসম্যান* পত্রিকা অনুসারে সমবেত মুসলমানরা রাজীব গান্ধীকে প্রাণের ভয় দেখিয়েছিল। সাহাবুদ্দিন অবশ্য বলেছেন মুসলমানরা সেরকম কথা বলেনি।

এখন *মুসলিম ইন্ডিয়া* প্রসঙ্গে আসা যাক। পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূপকার, ইকবাল ও জিন্না দুজনেই ভারতের মুসলমানদের বলতেন 'মুসলিম ইন্ডিয়া'। অর্থাৎ ভারতকে তাঁরা মুসলিম ইন্ডিয়া, হিন্দু ইন্ডিয়া, খ্রীষ্টান ইন্ডিয়া ইত্যাদি রূপে ভাবতেন এবং সেই ভাবেই দেশকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করতেন। দেশ ভেঙ্গে একবার পাকিস্তান ছিনিয়ে নেবার পরও সাহাবুদ্দিনের মত মোল্লারা বাকী ভারতকেও মুসলিম ইন্ডিয়া ইত্যাদিতে বিভক্ত করতে উৎসুক।

সুতরাং বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ার ইসলামী মৌলবাদীদের দোসর। সুতরাং প্রথম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, *কনসার্নড সিটিজেন্স ফোরাম* কী রায় দেবে। সেই রায় নিশ্চিতভাবেই সন্তুষ্ট করবে সাহাবুদ্দিনদের। অবশ্যই সেই রায়ে নরেন্দ্র মোদীকে অপরাধী করা হবে এবং হয়েছেও।

পোগ্রম

গুজরাট দাঙ্গার পর সংবাদপত্রের কল্যাণে সাধারণ বাঙ্গালীরা একটি শব্দের সম্মুখীণ হচ্ছেন। শব্দটি হচ্ছে, পোগ্রম। পোগ্রম শব্দটি রুশ। অর্থ, ব্যাপক ধ্বংস। এই ধ্বংস কর্তৃপক্ষের অনুমতিপ্রাপ্ত বা কর্তৃপক্ষের দ্বারা রেহাইপ্রাপ্ত জনতার দ্বারা হতে হবে। ধ্বংস হবে জাতিগত বা ধর্মগত সংখ্যালঘু। শব্দটির উৎপত্তি হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দী শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে রাশিয়ায় ইহুদীদের উপর আক্রমণ উপলক্ষে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের হত্যার পর ইহুদীদের উপর ব্যাপক আক্রমণ হয়। যদিও হত্যাকারী ইহুদী ছিলনা এবং দলে মাত্র একজন ইহুদী ছিল। ঐ সময় দুশোরও বেশী শহরে ইহুদীদের বাড়ীঘর আক্রান্ত হয়। পরবর্তী দুই দশকে পোগ্রম কমে আসে। কিন্তু ১৯০৩-১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার পোগ্রম দেখা দেয় দেশজুড়ে। জার রাজত্বের শেষ পর্যন্ত মাঝে মাঝেই পোগ্রম চলতো।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে রুশ নিয়ন্ত্রিত মোলদাভিয়ার কিশনিয়েভে পোগ্রম সবচেয়ে মারাত্মক হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের সাহায্যে দুদিন ধরে স্থানীয় নেতারা ৪৫ জন ইহুদীকে হত্যা করেছিল, ৬০০ জন ইহুদীকে জখম করেছিল, লুট করেছিল ৬০০ ইহুদী বাড়ী। পুলিশ বা সেনা কিছুই ছিলনা তাদের বাধা দিতে। পুলিশ নামে দুদিন পরে।

(এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, মাল্টি মিডিয়া সংস্করণ, ১৯৯৯)

গুজরাটের ক্ষেত্রে *পোগ্রম* শব্দটি ব্যবহার করে ইসলাম-ধর্মেতরবাদী অক্ষ বোঝাতে চেয়েছে সরকারী সমর্থন নিয়েই হিন্দুরা একচেটিয়া দাঙ্গা করে মুসলমানদের হত্যা করেছে। কিন্তু দাঙ্গা একচেটিয়া নয়, দাঙ্গাকারীরা সরকারী সমর্থনও পায়নি। পুলিশে বাধা দিয়েছে, দাঙ্গাকারীদের গুলি করে হত্যাও করেছে। বিপরীতপক্ষে মুসলমানরা পুলিশ হত্যাও করেছে। শুধুমাত্র মুসলমানরা সংখ্যায় বেশী মরেছে বলেই কি এটাকে পোগ্রম বলা যায়? দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে কি মামলা দায়ের করা হয়নি?

বিশুদ্ধ পোগ্রম

বিশুদ্ধ পোগ্রম বলতে যদি কিছু ঘটে থাকে আধুনিক ভারতে তবে তা ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে এপ্রিল দিনদুপুরে বিজনসেতুর উপর আনন্দমার্গীদের পেট্রল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করে হত্যা। ঐ হত্যাকান্ডের জন্য একজনকেও পুলিশ আদালতে সোপর্দ করতে পারেনি। সুতরাং শাস্তি পাওয়া তো দূরের কথা। বলা হয়েছে কেউই সাক্ষী দিতে রাজী হচ্ছে না। কী পরিস্থিতিতে সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিতে ভয় পায়?

ভারতের বাইরে দুই প্রতিবেশী ইসলামী রাষ্ট্রে হিন্দু বা খ্রীষ্টানরা একতরফা মার খায়। একটা চড়ও তারা পাল্টা মারতে সাহস করেনা। আর গুজরাটের এই দাঙ্গাতে মুসলমানরা পুলিশও হত্যা করেছে। ভারত হচ্ছে একমাত্র সেই দেশ যেখানে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের সহজেই হত্যা করতে সাহস করে।

গোধরা অগ্নিসংযোগ কে চুনকাম করতে ও দোষটা সঙ্ঘ-পরিবারের ঘাড়ে চাপাতে ইসলাম-ধর্মেতরবাদী অক্ষ এখন কী ধরনের প্রচার চালাচ্ছে, তার একটা চিত্র পাওয়া যাবে দোশরা আগস্টের *ফ্রন্টলাইন* পত্রিকায়। ডায়োন বুনশা এক নিবন্ধে লিখছেন, ঘটনাটা 'পূর্বপরিকল্পিত' বা 'সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ' এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। বাইরে থেকে আগুন লাগানো হয়েছে, এমন সম্ভবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। বগির দরজা দিয়ে কোনও দাহ্য তরল ফেলা হয়েছে তাও মানতে রাজী নন ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ৬০ লিটারের মত দাহ্য তরল উত্তর পাশের দরজা ও কামরার মধ্যে দাঁড়ানো কেউ ঢেলে দিয়েছে।

ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞরা মূলতঃ চিকিৎসক, বিশেষ বিষয় হিসাবে তাঁরা ফোরেনসিক বিজ্ঞান পড়েন। একটা কামরা পুরো পুড়ে যাবার পর কী করে বোঝা গেল দাহ্য তরলটা ৬০ লিটার তা পেশাগতভাবে রসায়ন-বিজ্ঞানী হয়ে, এবং ফোরেনসিক বিজ্ঞান নিয়ে কিছু পড়াশুনা করার পরে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। দাহ্য তরল পেট্রল, ডিজেল, কেরোসিন বা অন্য অনেক কিছু হতে পারে। সব তরলের দহন ক্ষমতা এক নয়। ৬০ লিটার পেট্রল ৬০ লিটার কেরোসিনের থেকে অনেক শক্তিশালী। পুড়ে যাওয়া ট্রেনের বগী দেখে কী করে বিশেষজ্ঞরা জানলেন তরলের পরিমাণ ৬০ লিটার? এবং তা বগীর মধ্যে দাঁড়িয়েই ঢালা হয়েছিল? বগীর বাইরে থেকে কেউ ঐ তরলটা ঢালতে কখনই পারেনা? ঐ বিশেষজ্ঞের যুক্তি, কামরাগুলি সাত ফুট উঁচু! মই বলে কোনও বস্তু যেন পৃথিবীতে আবিষ্কার হয়নি!

আমাদের ফিরে যাওয়া যাক গোধরা থেকে অনিল রানার দেওয়া বর্ণনায়। *বাইরে থেকে একটা পেট্রলে ভেজা বালিশ ছুঁড়ে দিয়েছিল জনতা।* এটা হতেই পারে, বালিশের বদলে সেটা ছিল একটা জেরিক্যান। তাতে ছিল পেট্রল বা ডিজেল।

পরিবর্তে ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞরা যে তত্ত্ব আমদানি করতে যাচ্ছেন, তাতে আছে আত্মঘাতী বাহিনীর তত্ত্ব। করসেবকরাই পেট্রল ঢেলে নিজেদের পুড়িয়ে মেরেছে। এমনকি যে আগুন লাগিয়েছে তারও বেরিয়ে আসার কথা নয়। বাইরে হিংস্র জনতা।

না, বুনশা মহাশয়। হিন্দুদের দৌড় এখনও ততোদূর পৌঁছয় নি। তবে অদূর ভবিষ্যতে আপনাদের মত 'ধর্মেতরবাদীদের' কল্যাণে সে দিন আসবে। *শহীদ* কথাটা ভারতীয় ভাষাতে অজানা। *ফিদায়েঁ* বলে কোনও কথা ভারতীয় ভাষায় নেই। শহীদদের জন্য জান্নাত বা স্বর্গে সমবয়স্কা আয়তলোচনা সুন্দরী নারীর, যাদের পূর্বে কোনও মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি, সাহচর্যে অক্ষয় স্বর্গবাসের কথাও ভারতীয় ধর্মে নেই। ভারতীয় জান্নাতে চিরকিশোরদের 'সেবা' গ্রহণ করার কথাও নেই। গাজীদের জন্য দখল করা নারী ভোগের কথাও ভারতীয় ধর্মে নেই।

এদেশে কড়ি দিয়ে সব কেনা যায়। পুলিশ, রোগীর বেডসাইড টিকেট, মেডিক্যাল সার্টিফিকেট—সবই। ফোরেনসিক রিপোর্টও যে কেনা যাবেনা, এ কথা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছেনা। তাছাড়া ঐ রিপোর্টটা দিচ্ছে কে তাও পরিষ্কার হওয়া দরকার।

ডায়োন বুনশা একদা বিজে পি এখন কংগ্রেস শঙ্কর সিং বাঘেলার কথা উৎকলিত করেছেন, "বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতাদের মানসিকতা আমি জানি। তারা নিজেদের করসেবকদের হত্যা করতেও পারে নিজেদের সুবিধার জন্য।"

মীর জাফরদের কথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, বুনসা মাথা ঘামাচ্ছেন। কংগ্রেসীদের মধ্যে বাঘেলার চেয়ে ভদ্র কি কেউ ছিলনা?

বুনশা (শ্রী কি শ্রীমতী তা জানি না) ২৭ শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাক্রমের একটা ছবি দিয়েছেন:

(১) ৭.৪২ : গোধরায় ট্রেন এসে দাঁড়ালো

(২) ৭.৪২-৭.৪৭: পাঁচ মিনিট যাত্রা বিরতিতে একজন করসেবক ও একজন ভেন্ডারের মধ্যে বিবাদ বেঁধে গেল।

[এ রকম বিবাদ ভারতের যে কোনও স্টেশনের প্লাটফর্মে যে কোনও সময় ঘটতে পারে। এর কারণও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। ভেন্ডাররা সব সময় সৎ এবং শান্তিপ্রিয় এরকম ধরে নেওয়া ঠিক নয়।]

(৩) ৭.৪৭: ট্রেন গোধরা স্টেশন থেকে ছেড়ে দিল কয়েকজন যাত্রীকে প্লাটফর্মে রেখেই।

(৪) ৭. ৪৮: চারটি কামরা থেকে চেন টানার ফলে ট্রেন থেমে গেল।

(৫) ৭.৪৮: থেকে ৮ টা গোধরা স্টেশনের পার্শেল অফিসের পিছনে লুক্কায়িত মুসলমান ও যাত্রীদের মধ্যে পাথর ছোঁড়া ছুঁড়ি হলো।

[স্টেশনের প্লাটফর্মে পাথর পাওয়া যায়না। গাড়ীর মধ্যে যাত্রীরা পাথর নিয়ে চলে না। সুতরাং মুসলমানরাই পাথর নিয়ে প্লাটফর্মে তৈরী ছিল। তারাই পার্শেল অফিসের পিছন থেকে যাত্রীদের পাথর ছুঁড়েছিল। যাত্রীরা আর যাই নিক্ষেপ করুক, পাথর নিক্ষেপ করতে পারেনা।]

(৬) ৮.০০: গাড়ী আবার যাত্রা শুরু করলো।

(৭) ৮.০৫: গোধরা স্টেশনের 'এ' কেবিনের কাছে আবার ট্রেন থেমে গেল।

(৮) ৮.০৫: থেকে ৮.১৭ পার্শেল অফিসের কাছ থেকে কিছু লোক দৌড়ে ট্রেনের দিকে

ধেয়ে গেল এবং সেখানে আরও পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি এবং হিংসা চললো। কামরায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো।

[আবার লিখতে হচ্ছে, ট্রেনের মধ্যে যাত্রীরা পাথর নিয়ে চলেনা। মসজিদ থেকে মাইক্রোফোনে প্ররোচনা দিয়ে সেখানে লোক জড় করা হয়েছিল। তারাই ট্রেন ঘিরে ধরে ট্রেনে আগুন লাগিয়ে দেয়।]

(৯) ৮. ২৫: পুলিশ এসে গুলি চালিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে।

ডায়োন বুনশার বর্ণনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে গোধরা হত্যাকান্ড অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। কিছু মুসলমান গোধরা স্টেশনে সুকৌশলে যাত্রীদের সঙ্গে বিবাদ বাঁধিয়ে দিয়ে গোলমাল শুরু করেছিল। তারা পার্শেল অফিসের পিছনে পাথর হাতে তৈরী ছিল। পাথর ছুঁড়ে তারাই গোলমাল সৃষ্টি করে। ফলে যাত্রীরা ট্রেনের জানলা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। এরপর পূর্বপরিকল্পিতভাবে চেন টেনে ট্রেন থামানো ও অগ্নিসংযোগ। এরকম একটা বদ্ধ ট্রেনের কামরার একপ্রান্তে অগ্নিসংযোগ করলে কী হবে? কামরার মধ্যে সহসা অক্সিজেনের অভাব ঘটবে। আতঙ্কে ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে যাবে। সবাই চাইবে অন্য দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে। অনেকে পড়ে যাবে। তাদের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাবে অনেকে। সুতরাং আগুনে পুড়ে যাবার আগে অনেকেই আহত হয়ে, হয়তো বা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। তারপর আগুন গ্রাস করেছিল তাদের অচৈতন্য দেহ।

সংবাদ মাধ্যমগুলির সততার পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে: স্টার টিভির সম্প্রচার ও *টাইমস অফ ইন্ডিয়ার* নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রের কথা। বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলিও বেছে বেছে হিন্দুদের দাঙ্গাগুলিই দেখিয়েছে। প্রয়োজনমত ভিশন মিক্সিং করে সাজানো দৃশ্যও দেখিয়েছে। *গুজরাট দিচ্ছে ডাক* পুস্তকের মলাটের ছবিতে পিছনের সার্ট-প্যান্ট পরা বহু লোকের সঙ্গে আগুন ও সাদাকালো গেঞ্জি পরিহিত কপালে লাল ফেট্টি পরিহিত ডান্ডা হতে যুবকটি পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। ঐ একই ছবি *গুজরাট: নরমেধ যজ্ঞ* পুস্তকেও দেখানো হয়েছে। আবার সবরমতী এক্সপ্রেসের এস-৬ কামরার রেল অনুমোদিত যাত্রী তালিকা নিয়ে রাজনীতিবিদ ও সংবাদ মাধ্যমের প্রচুর মাথাব্যথা। সেই তালিকা কেন প্রচার করা হচ্ছেনা ? নিশ্চয় এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে।

যাঁরা ট্রেনের স্লিপার কামরায় মাঝে মধ্যে ভ্রমণ করেন তাঁরা জানেন ট্রেনের তালিকাবদ্ধ যাত্রীদের সঙ্গে ভ্রমণরত যাত্রীদের গরমিল থাকে। এই গরমিল নানা কারণে হয়। অনেকে দালালের কাছ থেকে টিকিট কেনেন। দালালরা টিকিট কেনে কাল্পনিক যাত্রী এস রায় বা কে সেনের নামে। এছাড়া দলের দু-একজন শেষ পর্যন্ত যেতে না চাইলে সমবয়স্ক দ্বিতীয় একজনকে নিয়ে যাওয়া হয় অনেক সময়। যাত্রীরা অনেক সময় নিজেদের মধ্যে কামরা পরিবর্তন করে নেন। তাছাড়া অফিস টাইমে নিত্যযাত্রীরা স্লিপার কামরায় উঠে পড়েন। রিজার্ভেশনহীন কিছু যাত্রী সব সময় স্লিপার কামরায় থাকেন। রাজনৈতিক দলের মিটিং, মেলা উপলক্ষে বা অন্য সমাবেশ উপলক্ষে বহুলোক স্লিপার কামরায় উঠে পড়ে। এদের অনেকের টিকিটও থাকেনা।

সুতরাং দুর্ঘটনাগ্রস্ত কামরার যাত্রী তালিকা রেল কখনও আগে প্রকাশ করেনা। কারণ, এতে জীবিত লোক মৃত বলে তার আত্মীয়রা ক্ষতিপূরণ দাবী করে বসতে পারে। সবকিছু তদন্ত করে তবেই তালিকা প্রকাশ করা হয়।

তালিকা পরে প্রকাশ করা হয়েছে। যাত্রার জন্য টিকিট কেটে ছিলেন ৫৯ জন। তাদের মধ্যে ৩ জন টিকিট বাতিল করেছিলেন। বাকী ৫২ জনের যাত্রীর মধ্যে ৩২ জন নিরাপদে বাড়ী ফিরেছিলেন। বাকী ২০ জনের মধ্যে ৭ জন নিখোঁজ, ৪ জন নিহত ও ৯ জন আহত।

এতে রহস্যের কিছু নেই। সোজা কথা, বাকী যাত্রীদের রিজার্ভেশন ছিলনা। তাদের মধ্যে বিনা টিকিটের যাত্রীও থাকা স্বাভাবিক। বিনা টিকিটের যাত্রীদের রেল ক্ষতিপূরণ না দিতে পারে, কিন্তু সরকার পারবে না কেন? *আনন্দবাজার* লিখছে যে রেলমন্ত্রকের তালিকা গোধরার রহস্য জটিলতর করলো। পাঠক কি এর মধ্যে জটিলতা কিছু দেখছেন? নানা কারণে কেউ টিকিট না কাটতেই পারে। রেল দুর্ঘটনায় তার মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়াটা কী মানবিকতাবিরোধী কাজ বলে গণ্য হবে?

ধর্মেতরবাদী অক্ষের সংবাদপত্র *দি স্টেটসম্যান* ৪ ঠা আগস্টের প্রথম সম্পাদকীয় গোধরার শেষ ট্রেন, কে মরেছে সবরমতী এক্সপ্রেসে? তাতে লেখা হয়েছে:

মমতা ব্যানার্জী অভিযোগ করেছিলেন, সবরমতী এক্সপ্রেসের যাত্রী তালিকার মধ্যে রহস্য আছে। নীতিশ কুমার সেই তালিকা প্রকাশ করছেন না কেন?

কেন প্রকাশ করছিলেন না তার কারণ আগেই ব্যাখ্যা করেছি।

সম্পাদক মনে করছেন মমতার বক্তব্যে কিছু সত্য আছে। সম্পাদকীয় বক্তব্য, ঘটনার পরেই ভি.এইচ.পি ৫৮ জন করসেবকের আত্মীয়-স্বজনদের প্রদর্শন করলেন গুজরাটী সংবাদ-মাধ্যমের কাছে। তারা মৃতদেহগুলির পরিচয় কী করে জানলেন যখন সংরক্ষণ তালিকা নেই এবং মৃতদেহগুলি কয়লায় পরিণত হয়েছে?

উত্তর অতি সহজ, যাদের মাথায় দুর্বুদ্ধিভরা বালিশ পোরা আছে তারা ছাড়া যে কোনও সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বলতে পারবেন এস-৬ কামরায় কারা যাচ্ছিল (ধরে নেওয়া যেতে পারে বিনা টিকিটে) তা জানা ছিল অন্য করসেবকদের। গোধরার দুর্ঘটনার পরে তাদের আর পাওয়া যায়নি।

সম্পাদকীয়তে ফোরেনসিক রিপোর্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—ট্রেনের মধ্য থেকেই পেট্রোল ঢালা হয়েছে। ভি.এইচ পি'র বক্তব্যমত ক্রুদ্ধ জনতার দ্বারা নয়।

আমরা ভি.এইচ.পি'র বক্তব্য উল্লেখ করিনি। ঐ পত্রিকারই প্রতিবেদক অনিল রানার বক্তব্য ছিল ক্রুদ্ধ জনতা ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেয়। দেখা যাচ্ছে সংবাদপত্রটি এতই অসৎ যে নিজেদের পত্রে প্রকাশিত সংবাদের কথা বেমালুম অস্বীকার করে।

ফোরেনসিক রিপোর্টকে সত্য ধরতে গেলে অনেক কিছু ব্যাখ্যা করতে হয়। ব্যাখ্যা করতে হয় সিগন্যাল ফলিয়াতে যে ট্রেন দাঁড়াবে এবং সেখানে হাজার খানেকেরও বেশী উত্তেজিত লোক জমায়েৎ হবে সেটা কি করসেবকদের জানা ছিল? *নাকি সে জমায়েতটাও ভি.এইচ.*

পি'র সাজানো ?

এ প্রশ্নের উত্তর ইসলাম-ধর্মেতরবাদী অক্ষের জানা নেই। এখন ধর্মেতরবাদীরা যা করবেন তা হচ্ছে প্রশ্ন তুলবেন করসেবকরা অন্য যাত্রীদের হটিয়ে দিয়ে কামরাটা দখল করেছিল কিনা? তারা বিনা টিকিটে যাচ্ছিল কেন? করসেবকদের লঘু অপরাধকে বড় করে দেখে ইসলামী মৌলবাদীদের গুরুতর অপরাধকে হাল্কা করার চেষ্টা চলবে। শেষ পর্যন্ত যখন অন্য কিছু না পাওয়া যাবে তখন বলা হবে হিন্দু সমাজে জাতিভেদ আছে, মুসলমান সমাজে নেই। যদিও কথাটা একটা বিরাট ধাপ্পা—কোরান হাদিশে কোথাও বলা নেই ইসলামী সমাজে সামাজিক সাম্যের কথা।

প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে এমন উদ্ভট ফোরেনসিক রিপোট নিয়ে কী হবে? গোটা ব্যাপারটা গুলিয়ে দেওয়া যাবে। তাতে ইসলামী মৌলবাদীদের অপরাধের ব্যাপারটা হাল্কা হয়ে যাবে। এখন ইসলাম-ধর্মেতরবাদী পক্ষ প্রাণপণে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে গোধরার ব্যাপারটা নিতান্তই আকস্মিক। এর মধ্যে ইসলামী মৌলবাদীদের কোনও চক্রান্ত নেই। প্রথমে তাজুদিনের চেষ্টা--১৬ বছরের একটি মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে আর সে রকম বক্তব্য পাওয়া যায়নি। যদিও তাজুদিনের গল্প *স্টেটস্‌ম্যান* খুব সহজেই গুরুত্ব দিয়ে শীঘ্র ছেপে দিয়েছিল। তারপর ভিজু বী'র গল্প। এই দুই গল্পের ভিত্তিতে করসেবকদের চরিত্র নিয়ে বক্তব্যও রেখেছিল অগ্নিবেশাদি হিন্দুবিদ্বেষীরা। তারপর যেটা দাঁড়িয়েছে, প্লাটফর্মে ভেন্ডারদের সঙ্গে বচসা। পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যে কী এমন বচসা হতে পারে যার জেরে চেন টেনে ট্রেন থামাবার পরে স্টেশন থেকে পাঁচশো মিটার দূরে নিমেষের মধ্যে হাজার লোক জড় হয়ে যাবে? ডায়োন বুনশার বিবরণ অনুযায়ী একজন যাত্রীর সঙ্গে একজন ভেন্ডারেরই বচসা হয়েছিল। এখন দাবী উঠছে চক্রান্ত প্রমাণ করতে হবে। চক্রান্তের পরোক্ষ প্রমাণ ঘটনার বিবরণের মধ্যেই আছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ জোগাড় করা অতো সোজা নয়। ইসলামী মৌলবাদীরা অত্যন্ত গোপনে কাজ করে। ফরাজী আন্দোলন সম্পর্কে মাদারীপুরের তৎকালীন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট নবীন চন্দ্র সেন লিখেছিলেন, *ফরাজী নেতারা যেন আয়নার ছবি, ধরিবার জো নাই, ধরিবে কী, তাহাদের নাম পর্যন্ত কেউ প্রাণান্তে প্রকাশ করিবে না!*

নবীনচন্দ্র সেনের কথা আজও প্রাসঙ্গিক। কারণ, মনে রাখতে হবে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদীরা সাধারণ অপরাধী নয়। তারা অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে ভদ্রলোক। ধর্মই তাদের সন্ত্রাস করতে অনুপ্রেরণা যোগায়। যেহেতু তাঁরা ধর্মীয় কর্তব্য পালন করেন সেহেতু সহধর্মী মানুষরা তাঁদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। তাঁরা ধরা পড়লে দণ্ড মকুবের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান হয়। তাঁরা মৃত্যুর পর শহীদের মর্যাদা পান। সুতরাং এইসব ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদীদের নাম ঠিকানা কেউ প্রাণান্তে প্রকাশ করেনা।

ইতিহাসে প্রবেশ করা যাক। খেলাফৎ আন্দোলন চলাকালীন মালাবারের মোপলা মুসলমানরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ করে। হত্যা, লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ, ধর্মান্তরকরণ, কিছুই বাদ

পড়েনি। অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন এই জেহাদে প্রায় আড়াই হাজার জনকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়। কিন্তু মুসলিম খেলাফতীরা মোপলাদের সমর্থন করতে থাকে। বাবাসাহেব লিখেছেন, কয়েকজন খেলাফৎ নেতা এতই বিপথগামী হয়েছিল যে তারা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, "ধর্মের জন্য মোপলারা যে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করেছে তার জন্য তাদের অভিনন্দন।" উত্তর খেলাফৎ আন্দোলনে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। নাথুরমল শর্মা ইসলামের এক ইতিহাস লিখেছিলেন। সেই ইতিহাস মুসলমানদের পছন্দ হয়নি। সরকারও তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ১৯৫ ধারা অনুযায়ী মামলা করেছিল। সিন্ধের বিচার বিভাগীয় কমিশনারের আদালতে তিনি যখন মামলার শুনানীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন আবদুল কাইয়ুম নামক এক ঘাতক তাকে হত্যা করে। বরকত আলি নামক এক ব্যারিস্টার আদালতে দাবী করেন যে কোরানের আইন অনুযায়ী আবদুল কাইয়ুম অপরাধী নয়।

কথাটা একেবারে নির্জলা সত্য।

তিতুমীরের জেহাদে ধৃত আসামীদের মুক্তির জন্য এবং তিতুমীরের অক্ষয় স্বর্গবাসের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা জানাবার জন্য ওয়াহাবী আন্দোলনের এক প্রমুখ সমর্থক কলকাতার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অ্যাটর্নী মুন্সী আমিনুদ্দিন একটি নতুন মসজিদই বানিয়ে ফেলেন। ঐ মসজিদ পরবর্তীকাল সংস্কৃত হয়ে বর্তমান নাখুদা মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে।

সুতরাং, ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ যেখানে যুক্ত থাকে সেখানে মামলার কিনারা হওয়া অত্যন্ত শক্ত। আমরা দেখেছি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের বিষ্ফোরণের কোনও কিনারা হয়নি। খাদিম মামলারও অপরাধীরা দীর্ঘদিন পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল।

সুতরাং গোধরা হত্যাকান্ডের সবকিছু পুলিশের নজরে আসবে বা ভালমত সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাবে এমন আশা করা সঙ্গত নয়। এর জন্য সরকারের গোয়েন্দাদের ব্যর্থতাকেও দায়ী করা সঙ্গত নয়। আবার বলছি, ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদীরা সাধারণ অপরাধী নয় যে পুলিশের ইনফর্মাররা তাদের সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার জন্য তৈরী থাকবে। যাঁরা সমাজ জীবনে অতি ভদ্রলোক তাঁরাও যে কীভাবে ইসলামী সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হন তার এক উদাহরণ দিয়েছেন সাহিত্যিক শংকর। সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলি, যিনি অক্লেশে গীতা মুখস্থ বলতে পারতেন, তিনি বাঙলাদেশ যুদ্ধের পরে পাকিস্তান এয়ারলাইন্সের লেটার হেডে চিঠি লিখেছিলেন শংকরকে। চিঠির কাগজগুলি এক পাকিস্তানি মেজরের কাছে ছিল। মুক্তি সংগ্রামে মেজর খুন হওয়ার পর তার সম্পত্তি লুট হয়। আলি সাহেবের এক চাকর লুটতরাজে অংশ নেয়। তিনি ভৃত্যের লুট করা লেটারহেডগুলিতে ভাগ বসান। এই ঘটনার পরে শংকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি জানান, হিন্দু ব্রাহ্মণরা বড় কোমলচিত্ত। "প্রতিশোধ নেওয়া তোমার কম্ম নয়।। কিন্তু আমরা অত নরম নই—রক্তের বদলে রক্ত নেওয়ার ক্ষমতা আমি রাখি।" সাহিত্যিক শংকর যা লেখেননি তা হলো, তখন মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশীদের কাছে পাকিস্তানিরা 'কাফের'। কাফেরদের সম্পত্তি লুঠযোগ্য। সেই লুঠ করা সম্পত্তি হলো 'গনিমতের মাল'। বাড়ীতে রাখলে ভাগ্য ফেরে। কারণ, *গনিমা* কথাটির অর্থ সৌভাগ্য। আলি সাহেব সেই

সংস্কারের শিকার হয়েছিলেন। তসলিমা নাসরিন লিখেছেন তার পিতা ডাঃ রজব আলি হিন্দুদের বাড়ী থেকে লুঠ করা সামান্য গুড়ের ডোল সস্তায় কিনে এনেছিলেন। কারণ, সেই সংস্কার। গনিমতের মাল। কোন গোয়েন্দা আলি সাহেবের মত মানুষকে বা ডাঃ রজব আলির মত বিশিষ্ট চিকিৎসককে সম্ভাব্য অপরাধী বলে সন্দেহ করবে?

দ্বিতীয় পর্ব

অরুন্ধতী রায়

অরুন্ধতী রায় পিতৃসূত্রে বঙ্গ সন্তান। তবে ওনার মা, যতদূর জানা যায়, কেরলীয়। বুকার পুরস্কার প্রাপ্ত *গড অফ স্মল থিংস*নামক আত্মজীবনী মূলক উপন্যাসের রচয়িতা। উপন্যাসটি সত্যই ভাল। তবে উনি এখন উপন্যাস লেখা ছেড়ে দিয়ে কলম লিখছেন নানা পত্র-পত্রিকায় এবং *নর্মদা বাঁচাও* জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত থাকছেন। দেশের বিচার ব্যবস্থার উপরও তাঁর তেমন শ্রদ্ধা নেই। ৫ই এপ্রিলের *আউটলুক* পত্রিকায় তিনি গুজরাটের দাঙ্গা নিয়ে প্রধানতঃ নানা গুজবের ভিত্তিতে একটি বিশাল নিবন্ধ লেখেন। সেই নিবন্ধের অংশবিশেষ *গুজরাট দিচ্ছে ডাক* পুস্তকে মুদ্রিত হয়েছে। ঐ গুলি *আজকাল* পত্রিকায় প্রথমে মুদ্রিত হয়েছিল। আমরা ঐ প্রবন্ধের নানা অংশের আলোচনা করবো। নিবন্ধের আলোচনা আরম্ভ হয়েছে এইভাবে: *বরোদা থেকে এক বান্ধবীর ফোন এলো। ফোনে সে অঝোরে কাঁদছে। ওর এক বান্ধবী সঈদা উন্মত্ত জনতার হাতে পড়ে গিয়েছিল। সঈদার পেটটা চিরে দাঙ্গাকারীরা জ্বলন্ত কাপড়ের ফালি ঢুকিয়ে দেয়। সঈদা মরে যাবার পর তার কপালে লিখে দেয় ওম।*

সঈদা নামক এক মুসলিম যুবতী দাঙ্গাকারীদের হাতে পড়ে যেতেই পারে। দাঙ্গাকারীরা তাকে তরোয়াল দিয়ে কোপাতে পারে, গায়ে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। এ সবই সম্ভব। কিন্তু তার কপালে ওঁ লেখা! অত বড় শিল্পী দাঙ্গাবাজ কল্পনা করা কি একটু কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে না অরুন্ধতী রায়!

আপনার প্রশ্ন, *কোনও হিন্দুশাস্ত্রে এরকম নিদান আছে নাকি?*

না অরুন্ধতী রায়, যা ঘটেনি তা নিয়ে মাথা ব্যথা করা যায়না। তবে একটা কথা বলা যেতে পারে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করা হিন্দু ঐতিহ্য নয়। তবে হিন্দুধর্ম যে অন্যায় সহ্য করে যায়, নিপাট অহিংস—এ রকম ব্যাপার নয়। দেশের কিছু শত্রু বহুদিন ধরে এই ধরনের প্রচার চালিয়ে গোটা জাতিকে নপুংসক ও কাপুরুষ বানাচ্ছে। হিন্দুরাও পরিস্থিতি অনুযায়ী ক্রুর হয়ে যেতে পারে। গাঁধী কথিত অহিংসা ভারতের ঐতিহ্য নয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, যুদ্ধ করার কথা রামায়ণ-মহাভারতে বলা হয়েছে। এটা আপনি নিজেও জানেন। খুব সুন্দরভাবে লিখেছেন আপনার *গড অফ স্মল থিংসে*, এক কথাকলি নাচের বিবরণে:

"সকাল প্রায় চারটার সময় ভীম নীচাশয় দুঃশাসনকে খুঁজে বের করলেন, যে জনসমক্ষে তাঁদের স্ত্রী দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করার চেষ্টা করেছিল, পাশাখেলায় কৌরবরা তাঁকে জয় করার পর। দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি চুল বাঁধবেন না, যতক্ষণ না দুঃশাসনের রক্ত দিয়ে ধোয়া হবে তাঁর চুল।

প্রভাতের আলোয় এস্থাপ্পেন এবং রাহেল দেখলো ভীম দ্রৌপদীকে প্রদত্ত শপথ পালন

করলেন। তিনি দুঃশাসনকে ধরাশায়ী করলেন গদার আঘাতে। গদার আঘাত করে যেতে লাগলেন যতক্ষণ না দুঃশাসনের দেহ নিষ্কম্প হয়। তারপর তাঁর খালি হাত দিয়ে সেই দেহটা ছিঁড়ে ফেললেন। টেনে বের করে আনলেন দেহের ভিতরের বস্তু এবং চিরে ফেলা মৃতদেহের উপর ঝুঁকে পড়ে পেট থেকে আজলা ভরে রক্ত নিয়ে পান করতে লাগলেন চকচক করে। তাঁর চোখ দুটি ক্রোধ, ঘৃণা ও প্রতিজ্ঞা পূরণের উন্মাদনায় উন্মত্ত। রক্তের বুদবুদ বেরিয়ে আসতে লাগলো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। গড়িয়ে পড়তে লাগলো তাঁর রঙ করা মুখ দিয়ে, চিবুক দিয়ে, গলা দিয়ে। যথেষ্ট পান করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, গলায় জড়ানো দুঃশাসনের রক্তাক্ত নাড়িভুঁড়ি। তারপর দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে তাঁর চুল ধুয়ে দিলেন দুঃশাসনের তাজা রক্ত দিয়ে। তখনও তাঁর মুখে সেই ক্রোধ, যা দুঃশাসনের হত্যার দ্বারাও শীতল হয়নি।"

এর চেয়ে সুন্দরভাবে হিন্দুদের মানসিকতা ফুটিয়ে তুলতে কজন পারে?

আপনার পরের প্রশ্ন, *কোরানে কোথায় লেখা আছে পুড়িয়ে মারার বিধান?*

অবশ্যই বিধান আছে। কোরানে আছে, *যারা আমার বাক্যকে অবিশ্বাস করে তাদের আগুনে দগ্ধ করবই। যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে, তখনই এর স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করবো, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয়, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৪/৫৬*

আর যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারা প্রজ্জলিত অগ্নির অধিবাসী। ৫/১০

কোরান সাধারণভাবে পৌত্তলিকদের হত্যা করার বিধান দেয়: *অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিক্রান্ত হলে পৌত্তলিকদের যেখানে পাবে বধ করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে, কিন্তু যদি তারা অনুতাপ করে, যথাযথ নমাজ পড়ে ও যাকাত দেয় (দান করে) তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।*

এই সমস্ত কোরানীয় বিধান ইসলাম বিশ্বাসীদের প্ররোচিত করে হিন্দুদের হত্যায়। তাদের বিবেক পরিষ্কার রাখে এই ধরনের হত্যাকান্ড সমর্থনে। গোধরা অগ্নিসংযোগের সময় মসজিদ থেকে যে উত্তেজক ভাষণ দেওয়া হয়েছিল তা আমরা আগেই জেনেছি। কাশ্মীরে দিনের পর দিন ইসলামী সন্ত্রাস বাদীরা হত্যা করে চলেছে হিন্দুদের। ভারতের মুসলমানদের কি কোনও উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ আছে এ ব্যাপারে?

অরুন্ধতী দেবী, আপনি ধর্মীয় ফ্যাসীবাদের কথা উচ্চারণ করেছেন। ইসলামের কাছে ফ্যাসীবাদ নিতান্তই এক তুচ্ছ তত্ত্ব। ইসলামের কাছে হিটলার-মুসোলিনী হামাগুড়ি দেওয়া শিশু। ইসলাম একটি সেমীয় (Semitic) ধর্ম—ইহুদী ধর্মের অনুবর্তন। ইহুদী ধর্মের ভিত্তি মুসাকে প্রদত্ত ঈশ্বর যিহোভার *দশটি প্রত্যাদেশ* (Ten commandments) এবং *ঈশ্বরের আপনজন* (Chosen People) ও *প্রতিশ্রুতিভূমির* (Promised land) যুগল তত্ত্ব।

যাযাবর ইহুদীদের আপনজন স্থির করে যিহোভা তাদের অর্পণ করেছিলেন *প্রতিশ্রুতভূমি* কানান প্রদেশ—যা দখল করতে হবে তরবারীর তীক্ষ্ণতায়। ইহুদী পয়গম্বর মুসা ও তাঁর উত্তরসুরী

যুশা তরবারীর তীক্ষ্ণতায় সমস্ত কানান বাসীদের নির্মমভাবে হত্যা করে সৃষ্টি করে ছিলেন দুগ্ধ ও মধুতে পূর্ণ প্রতিশ্রুতভূমি। ঈশ্বরের আপনজন ও পরজনের এই তত্ত্ব পৃথিবীর সমস্ত মানবসম্পদকে দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত করেছে। এক শিবিরের সর্বনাশের ফলে অন্য শিবিরের শ্রীবৃদ্ধি। ইহুদীরা মানবসমাজকে ভাগ করেছিল ইহুদী ও জেন্টাইলে। খ্রীষ্টানরা ভাগ করেছিল খ্রীষ্টান ও জেন্টাইলে। পৌত্তলিকদের তারা বলে 'হিদেন'। ইসলাম মানব সম্পদকে ভাগ করেছে মুমিন (মুসলিম) ও কাফেরে। কাফেররা আবার দুরকমের—কেতাবী ও মুশরিক। ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা হচ্ছে 'কেতাবী' কাফের। কারণ ইসলাম ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্টকে সম্মানীয় ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকার করে। পৃথিবীর বাকী সমস্ত ধর্মাবলম্বীরা ইসলামের চোখে 'মুশরিক'। মুশরিকদের দেখামাত্র বিনাশ করাই ইসলাম সম্মত।

ইসলামী মতে গোটা বিশ্বই আল্লাহ্ ও তাঁর পয়গম্বরের। পৃথিবীর বাকী মানুষদের পৃথিবীতে বাস করার কোনও অধিকার নেই। এই তত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে একটি হাদিশে:

"আমরা মসজিদে বসেছিলাম, এমন সময় আল্লাহ্‌র রসুল এসে বললেন, চলো ইহুদীদের কাছে যাওয়া যাক।

আমরা তাঁর সঙ্গী হয়ে ইহুদীদের কাছে গেলাম। আল্লাহ্‌র রসুল ডেকে বললেন, হে ইহুদীদের দল, তোমরা ইসলাম কবুল করো, তাতে তোমরা নিরাপদ হবে।

ইহুদীরা বললো, হে আবুল কাশিম (ইহুদীরা পয়গম্বরকে 'কাশিমের বাপ' বলে সম্বোধন করতো। পয়গম্বরের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে এক অকালমৃত পুত্রের নাম ছিল কাশিম) আপনি আমাদের আল্লাহ্‌র বাণী শোনালেন (মুসলমান হওয়ার জন্য আহ্বান করলেন)।

তখন রসলুল্লা বললেন: হে ইহুদীর দল, আমি চাই তোমরা ইসলাম কবুল করে নিরাপদ হও।

ইহুদীরা একই উত্তর দিল। এইরকম তিনবার উত্তর-প্রত্যুত্তরের পর পয়গম্বর বললেন, তোমাদের জানা উচিত, সারা দুনিয়ার মালিক আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল। আমাদের ইচ্ছা তোমাদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিই। তোমাদের মধ্যে যার যা সম্পত্তি আছে তা বেচে দিক। তা না হলে জানিয়ে দাও, সারা দুনিয়ার মালিকানা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের।"
(সহী মুসলিমের ৪৩৬৩ নং হাদিশ)

উক্ত হাদিশে স্পষ্ট যে গোটা পৃথিবীই আল্লাহ্‌র *প্রতিশ্রুতভূমি* এবং গোটা পৃথিবীর মালিকানার জন্য মুসলমানরাই আল্লাহ্‌র *আপনজন।* কোরানেও আছে, *পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে আল্লাহ্‌র সৎ সেবকবৃন্দ।* সুতরাং অরুন্ধতী রায়, তত্ত্ব হিসাবে ফ্যাসীবাদ ইসলামের কাছে কিছুই নয়। আর বাস্তব প্রয়োগের কথা যদি বলতে হয়, তৈমুরলঙ মাত্র যে কয়েকদিনে বহু লক্ষ হিন্দুকে কোতল করেছিলেন, হিটলার বিষবাষ্প দিয়েও ঐ কদিনে তা পারেননি।

নিছক গুজবের ভিত্তিতে আপনি অনেক কিছু লিখেছেন। যেমন আপনি লিখেছিলেন, এহসান জাফরীর মেয়েদের বিবস্ত্র করে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। পরে স্বীকার করেছেন নেহাৎ গুজবের উপর ভিত্তি করে অসত্য কথা লিখেছিলেন। গুজবগুলি যারা রটনা করেছিল সেইসব

কুচক্রীদের মধ্যে আছে *টাইম* ম্যাগাজিনের মীনাক্ষী গাঙ্গুলী ও অ্যান্টনী স্পেথ, ত্রিপুরার প্রাক্তন ডি.আই.জি কে. এস. সুব্রামানিয়াম। কিন্তু আপনি সেইসব অসত্য কথা লেখার জন্য পাঠকদের কাছে ক্ষমা চাননি।

আপনার রচনার কিছু বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন বলবীর পুঞ্জ *আউটলুক* পত্রিকায়। আমরা সেই প্রতিবাদ পত্রের অনুবাদ করে দিলাম বাঙালী পাঠকদের সুবিধার্থে:

প্রথমে আপনার লেখা খানিকটা উৎকীর্ণ করেছেন বলবীর পুঞ্জ:

"বিজেপি সরকারযুক্ত একমাত্র বড় রাজ্য গুজরাট কয়েক বছর ধরে এক বিশাল রাজনৈতিক পরীক্ষা করার জন্য হিন্দু ফ্যাসীবাদের পরীক্ষাপাত্র হয়ে উঠেছে। তার ফলাফল লোকেরা দেখছে এখন। গোধরা বীভৎসতার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত পোগ্রম শুরু করে দেয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দল। সরকারী হিসাবমত মৃতের সংখ্যা ৮০০ হলেও নিরপেক্ষ মতে সংখ্যাটা ২০০০ ছাড়িয়ে গেছে। দেড় লাখেরও বেশী লোক বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। মহিলাদের নগ্ন করে গণধর্ষণ করা হয়েছে, শিশুর সামনে পিতামাতাকে হত্যা করা হয়েছে। ২৪০টি দরগা ও ১৮০টি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। আহমদাবাদে আধুনিক উর্দূ কবিতার জনক ওয়ালি গুজরাটীর সমাধি গুঁড়িয়ে রাতারাতি রাস্তা বানানো হয়েছে সেখানে। সঙ্গীতসাধক উস্তাদ ফৈয়াজ খানের সমাধি অপবিত্র করা হয়েছে, ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে জ্বলন্ত টায়ার। অগ্নিসংযোগকারীরা পুড়িয়ে দিয়েছে এবং লুট করেছে বহু দোকান, বাড়ী, হোটেল, কাপড়ের মিল, বাস এবং প্রাইভেট কার। লক্ষ লক্ষ মানুষ চাকরী খুইয়েছে। একদল হিংস্র জনতা প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ এহসান জাফরীর বাড়ী ঘিরে ফেলেছিল। তিনি ফোন করেছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজিকে, পুলিশ কমিশনারকে, চীফ সেক্রেটারীকে, এডিশনাল চীফ সেক্রেটারীকে, কেউ গ্রাহ্য করেনি। তাঁর বাড়ীর কাছে থাকা পুলিশের মোবাইল ভ্যান কিছু করেনি। হিংস্র জনতা তাঁর বাড়ীতে ঢুকেপড়ে তাঁর কন্যাদের নগ্ন করে পুড়িয়ে মারে। তারা তারপর জাফরীর মাথা কাটে এবং টুকরো টুকরো করে তাঁকে।"

এরপর শ্রী পুঞ্জ লিখেছেন: এইভাবে ছোটখাটো মানুষের ভগবতী অরুন্ধতী রায় গুজরাটের এক বিশাল চিত্র অঙ্কিত করেছেন তাঁর নিবন্ধে। শ্রীমতী রায় সঙ্ঘপরিবারের বিরুদ্ধে যত কিছু অভিযোগ তার প্রায় সব কিছুরই সংকলন করেছেন এই নিবন্ধে। লেখক যখন বুকার পুরস্কার প্রাপ্ত এবং প্রকাশ হয়েছে *আউটলুকের* মত বিখ্যাত পত্রিকায়, তখন এটিকে গুরুত্বের সঙ্গেই নিতে হয়। এবং এই ঘটনা-বর্ণনার সহবর্তী হিসাবে 'সত্যের' সেবা করবার জন্য শ্রীমতী রায় ব্যবহার করেছেন তাঁর অপূর্ব ভাষাজ্ঞান। তাঁর বীভৎস চিত্রময় বর্ণনা পড়ুন: *হিংস্র জনতা তাঁর বাড়ীতে ঢুকে পড়ে তাঁর কন্যাদের নগ্ন করে পুড়িয়ে মারে। তারপর জাফরীর মাথা কাটে এবং টুকরো টুকরো করেতাঁকে।"*

শ্রীমতী রায় যেন স্বচক্ষে দেখেছেন ব্যাপারটা। অথবা, তিনি শুনেছিলেন প্রত্যক্ষদশীর বিবরণ। বর্ণনাটি অবশ্যই হৃদয়-বিদারক। কিন্তু মিথ্যা! এহসান জাফরী দাঙ্গায় মারা গিয়েছেন

সত্যই। কিন্তু তাঁর কন্যাদের কেউ 'নগ্ন' করেনি, 'পুড়িয়ে'ও মারেনি। এহসান জাফরীর পুত্র টি. এ. জাফরী ২ রা মে'র *এসিয়ান এজে*এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "আমার ভাই বোনেদের মধ্যে আমি একাই ভারতে বাস করি। ভাই বোনেদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বড় এবং আমার ভাই এবং বোন আমেরিকায় বাস করে। আমার বয়স চল্লিশ এবং আমি আমেদাবাদেই জন্মেছি এবং বড় হয়েছি।"

জাফরী নিশ্চয় মিথ্যা কথা বলছেন না। সুতরাং অরুন্ধতী রায়ই বলছেন মিথ্যা কথা। বিভিন্ন মাধ্যম এরকম শত শত মিথ্যা কথা প্রচার করেছেন। সেগুলির কী হবে? সাত পাতা জোড়া নিবন্ধে রায়ের ভারত ও সঙ্ঘ পরিবারের বিরুদ্ধে ঘৃণা-অভিযোগ কেন্দ্রীভূত দুটি সুনির্দিষ্ট মানবিক দুঃখ-নাটকের উপর। একটি যে নিছক গল্প তা প্রমাণিত হয়েছে। বাকীটা সঙ্ঘ পরিবারকে রাক্ষস বানানোর জন্য গরল মিশ্রিত পরাবৃত্ত। বস্তুতঃ এই ধরনের রাক্ষস বানানোর অপপ্রয়াস থেকেই গোধরা কান্ডের সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মেতরবাদীদের এই ধরনের গরল মিশ্রিত প্রচার কিছু সাধারণ এবং সহজে প্রতারণার যোগ্য মুসলমানদের ভাবতে প্ররোচিত করেছে যে রাম সেবকরা রাক্ষস বিশেষ এবং তাদের পুড়িয়ে মারাই উচিত।

অরুন্ধতী গুজরাটকে সঙ্ঘ পরিবারের পরীক্ষা-পাত্র বলেছেন। আসলে গোধরাকে এক ধরনের রন্ধনপাত্র হিসাবেই ব্যবহার করেছেন ধর্মেতরবাদীরা। করসেবকদের পোড়ানোর পর তাঁরা অপরাধটিকে নিন্দা করার সঙ্গে সঙ্গে দোষ দিয়েছেন অপরাধের বলিদেরও। অপরাধটিকে অনিবার্য প্রমাণ করার জন্য নানারকম গল্প উদ্ভাবন করেছেন তাঁরা। হকারদের সঙ্গে করসেবকদের বিবাদ, নারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, প্ররোচনামূলক ধ্বনি দেওয়া ইত্যাদি। এবং শ্রীমতী রায় একইভাবে এই নিবন্ধে রাক্ষসায়ণ করে গেছেন সঙ্ঘপরিবারকে। সব কজন রাজনীতিবিদদের মধ্যে তিনি আশার আলো দেখেছেন লালুপ্রসাদ যাদবের মধ্যে। যে লালুপ্রসাদ যাদব বিহারের মানুষদের জাতি অনুযায়ী ভাগ করেছেন আগা গোড়া। তিনি তাঁর স্ত্রীর মাধ্যমে রাজত্ব করেন--যে রাজত্ব শুকিয়ে যাচ্ছে এবং যে রাজত্ব নানা রঙের কতকগুলি সেনার মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে। শ্রীমতী রায় লালুর কথা উৎকলিত করেছেন, *কোন মাঈ কা লাল কহতে হ্যায় কি ইয়ে হিন্দু রাষ্ট্র হ্যায়? উসকো ইহাঁ ভেজ দো, ছাতি ফুড় দুঙ্গা।*

লালু গোধরার মত ঘটনা ঘটাতে চান বলেই শ্রীমতী রায়ের লালুর প্রতি আকর্ষণ। একটা অসুস্থ পৈশাচিক মনোবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় এর মধ্যে। ফ্যাসীবাদ, গণধর্ষণ, গণহত্যা, পোগ্রম ইত্যাদি শব্দে পরিপূর্ণ শ্রীমতী রায়ের নিবন্ধ। ৯৮'র পোখরাণ পরমানুকেন্দ্রিক পরীক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন "রক্ততৃষ্ণার স্বাদেশিকতা হলো খোলাখুলি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক মুদ্রা।" ঘটনাক্রমে তাঁর এই বক্তব্য পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করেন পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল মুশারফ এবং পশ্চিমের ও আমেরিকার আরও কিছু লোক। কিন্তু গুজরাটে যা হয়েছে তা কি মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য পোগ্রম? হিন্দু ও মুসলমান মিলিয়ে ৯০০ নিরপরাধ জীবনের অবসান নিশ্চয় কোনও একটি সম্প্রদায়ের গণহত্যা আখ্যায় অ্যাখ্যায়িত হতে পারে না। এটি ১৮৯৩ অব্দে সংঘটিত বোম্বে ও আজমগড়ের দাঙ্গা থেকে শুরু করে ভারতের অসংখ্য

ধারাবাহিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটি দুঃখজনক ও লজ্জাজনক সংযোজন! মুঘল আমলে ১৭১৪ অব্দের হোলির দাঙ্গা থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত আহমদাবাদ সহর ১০টিরও বেশী গুরুতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখেছে। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে নিশ্চয় সঙ্ঘ পরিবার ছিলনা, ১৯৬৯ বা ১৯৮৫ অব্দের দাঙ্গার সময় নিশ্চয় সঙ্ঘ পরিবার শক্তিশালী ছিলনা। তাহলে গুজরাট যখন সঙ্ঘ পরিবারের 'পরীক্ষা-পাত্র' ছিলনা সে সময়কার দাঙ্গা সম্বন্ধে কী বলা যাবে?

দাঙ্গায় নিহতদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ হিন্দু। গোধরার ঘটনার পরে গুজরাটের বিভিন্ন অংশে ব্যাপক দাঙ্গা লেগে যায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে। যেহেতু দাঙ্গাকারীরা মূলতঃ হিন্দু, প্রথম তিন দিনে পুলিশের বুলেটে নিহতদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ হিন্দুই। বস্তুতঃপক্ষে ১৮ই এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে নিহতদের বেশীভাগই হিন্দু। কিন্তু তারপর থেকে মুসলমানরাই হিংসাত্মক কাজ বেশী করতে থাকে। ফলে হতাহতের সংখ্যা তাদের দ্বারাই বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুলিশ আজ পর্যন্ত ৩৪ হাজার দাঙ্গাকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। এদের মধ্যে বেশীভাগই হিন্দু। উভয় সম্প্রদায়ই ব্যবসা ও সম্পত্তির নিরিখে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এক লক্ষ মুসলমান ও ৪০,০০০ হিন্দু আশ্রয় শিবিরে আছে। এটা একটা ভয়ানক এবং দুঃখজনক দাঙ্গা, কিন্তু এটাকে মুসলিম গণহত্যা বলা কেন? এই আখ্যা কাকে বড় করে তুলবে? নিশ্চয় দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের এতে কোনও সুবিধা হবেনা? সুবিধা হবে আমাদের সীমান্তপারের শত্রুদের।

যদিও ভারত বহু দাঙ্গা দেখেছে, কিন্তু এই দাঙ্গায় ভারতের সম্মানহানি ঘটেছে গোটা পৃথিবীর কাছে। এর জন্য অবশ্যই দায়ী যারা গোধরায় করসেবকদের কামরায় আগুন লাগিয়েছে এবং যারা পরবর্তী সপ্তাহগুলিতে দাঙ্গায় মেতেছে। কিন্তু সত্যকারের খলনায়ক হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমের অরুন্ধতী রায়রা এবং একশ্রেণীর মানুষ যারা অর্ধসত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশিয়ে সঙ্ঘপরিবারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক এবং তাত্ত্বিক আক্রোশ চরিতার্থ করেছে। অরুন্ধতী রায় (ধর্মেতরবাদীদের একটি নিদর্শন চরিত্র) তাঁর ঘৃণাযুদ্ধ আরম্ভ করেছেন সঈদা নামক এক যুবতীর ঘটনা দিয়ে। যার "পেটটা চিরে দাঙ্গাকারীরা জ্বলন্ত কাপড়ের ফালি ঢুকিয়ে দেয়।" পার্লামেন্টে এই ধরনের বহু ভয়াবহ ঘটনা শুনেছি। সবচেয়ে বেশী শুনেছি যে সব ঘটনার কথা তা হচ্ছে ধর্ষণের পর গর্ভবতী নারীর পেট চিরে ভ্রূন বের করে তা ত্রিশুলে আটকে জয়োল্লাস করা! কিন্তু কেউই এই ধরনের একটি নির্দিষ্ট ঘটনা আমাকে প্রদর্শন করতে পারেননি। অরুন্ধতী রায় এই ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা করলেও তা গল্পই। ধর্মেতরবাদী গোষ্ঠী শুধু যে মিথ্যা ও অর্ধসত্য বলার জন্য দোষী তাই নয়, তারা যারা হিংসা আরম্ভ করেছেন তাদের অভিযোগ থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন। ২৮ শে ফেব্রুয়ারীর *হিন্দুস্থান টাইমসের* হেডলাইন *অযোধ্যাকান্ডের পশ্চাদফলে গুজরাট আহত* ধর্মেতরবাদীদের সংবাদ পরিবেশনের একটি নিদর্শন। এইভাবে মূল ঘটনার প্রাথমিক প্রতিবেদন থেকে দ্রুত দূরে সরে গিয়ে এক কুৎসিৎ মতুয়া বুদ্ধি দিয়ে রাম জন্মভূমি আন্দোলনের সঙ্গে এই বীভৎস অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে সংবদ্ধ করতে সচেষ্ট হলো এই পত্রিকা। অথবা আপনি ১ লা মার্চের *টাইমস অফ ইন্ডিয়ায়* সিদ্ধার্থ বরদারাজনের প্রতিবেদন, *গুজরাট যখন হত্যায় কাঁপছে তখন*

বিজেপি বেহালা বাজাচ্ছে সম্বন্ধে মত প্রকাশ করবেন? ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, "গোধরার ট্রেন যাত্রীদের উপর কাপুরুষচিত আক্রমণ........ সবরমতী এক্সপ্রেসের উপর এই আক্রমণ কতদূর পূর্বপরিকল্পিত তা কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করে দেখবেন, তবে গুজরাটী মুসলিমদের উপর সুপরিকল্পিত হিংসা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই।"

গোধরা অগ্নিসংযোগের ঠিক দুদিন পরে রচিত এই সাড়ে চারশো শব্দের প্রতিবেদনে করসেবকদের হত্যার কথা একবারই বলা হয়েছে। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে বরদারাজন দিল্লীতে বসে নিঃসন্দেহ হলেন যে প্রতিক্রিয়ার দাঙ্গা পূর্ব-পরিকল্পিত, কিন্তু সমর্থন করলেন গোধরার অসমর্থনযোগ্য অগ্নিসংযোগ। গুজরাটের দাঙ্গায় সত্যকে আড়াল করে রেখেছে ব্যাপক মিথ্যা ও পরিকল্পিত গল্প। ৩ রা মার্চ *টাইমস অফ ইন্ডিয়া* খবর দিল নরেন্দ্র মোদী, বলেছেন নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী "প্রতিটি কর্মের সমান ও বিপরীত প্রতিফল আছে।" ঘটনা হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের কথা বলেননি, এবং *টাইমস অফ ইন্ডিয়া* ছাড়া অন্য কোনও পত্রিকা এ সংবাদ প্রকাশ করেনি। কিন্তু পরে বহু সংবাদপত্র এই কুৎসিত রটনাকে কেন্দ্র করে সম্পাদকীয় রচনা করে বসলো। নরেন্দ্র মোদীর সমস্ত প্রতিবাদ ছেঁড়া কাগজের ঝুঁড়িতে ফেলে দেওয়া হলো। এখন আমরা টেলিভিশনে যুদ্ধ (কারগিল), টেলিভিশনে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ (WTC) এবং টেলিভিশনে দাঙ্গা (গুজরাট) দেখার যুগে বাস করছি। পড়ার চেয়ে দেখা আমাদের চেতনায় শতগুণ বেশী প্রভাব ফেলে। সংবাদ চ্যানেলগুলি একে অপরের সঙ্গে সবসময় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছে, কে অপরের উপর ছাপিয়ে যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে তারা অনেক সময় হাওয়াতেও ঢিল ছোঁড়ে, বিশেষতঃ সংকটজনক মুহূর্তে। গুজরাট দাঙ্গার বীভৎস দৃশ্যগুলি নির্বিচারে দেখিয়ে তারা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। এর সঙ্গে তুলনা করে দেখুন আফগানীস্থান যুদ্ধ বা WTC আক্রমণ সংক্রান্ত বি.বি.সি বা সি.এন.এন চ্যানেলের সংবাদ পরিবেশনকে। কতগুলি বীভৎস দৃশ্য আপনারা দেখেছেন? দাঙ্গার সংবাদ পরিবেশন সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্পাদকদের গিল্ড গুজরাটী সংবাদপত্রগুলির কড়া সমালোচনা করেছে, প্রশংসা করেছে ইংরেজী সংবাদপত্রগুলিকে। গুজরাটী সংবাপত্রগুলি হয়তো কিছু অতিবর্ণনা করেছে। কিন্তু আমি নিশ্চিত ইংরেজী সংবাদ মাধ্যমগুলিতে অরুন্ধতী রায়রা যেমন তৈরী করা গল্প দিয়ে দাঙ্গার বর্ণনা দিয়েছেন, তারা তেমন করেনি। বিস্ময়করভাবে সম্পাদকদের গিল্ড বৈদ্যুতিন মাধ্যমের এবং অরুন্ধতী রায়দের মিথ্যা ও অর্ধসত্য সংবাদ দ্বারা ভারতের সম্মান ক্ষুন্ন করা, সংকটজনক অবস্থায় বেশী করে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করা ও একশ্রেণীর নাগরিকদের রাক্ষস প্রতিপন্ন করার প্রয়াসের কোনও সমালোচনা করেনি। ধর্ষণকারীরা তাদের কুৎসিত অপরাধের জন্য অবশ্যই সাজা পাবেন। কিন্তু তাদের কী হবে যারা সত্য ও দেশকে ধর্ষণ করে চলেছে?

এবার অরুন্ধতী রায়ের আরও কিছু অভিযোগের জবাব দেওয়া যাক--যা শ্রী পুঞ্জ আলোচনা করেননি।

যেমন, ফৈয়াজ খাঁর সমাধির কথা। জবাবটা আমরা দিচ্ছিনা। দিচ্ছেন বাঙলার প্রমুখ পন্ডিত ব্যক্তি, নিত্যপ্রিয় ঘোষ। তিনি সঙ্ঘপরিবারের লোক, এমন সুনাম করার সামর্থ দেশের একজনেরও নেই। কী লিখেছেন ঐ বিদগ্ধ মানুষটি?

"খবরের কাগজে গৈরিক বাহিনীর অশিক্ষিত, অমার্জিত, অসাস্কৃতিক তান্ডবের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, বরোদায় ফৈয়াজ খাঁর সমাধি ধ্বংসের কথা, তুলনা করা হয়েছে বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তির ধ্বংসের সঙ্গে। শিল্পসংস্কৃতির বিশিষ্টজনেরা এই নরপিশাচদের ধিক্কার জানিয়েছেন। হীরেন মুখোপাধ্যায়ও তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন- বরদায় যখন কার্ফু ঘোষিত ছিল তখনই কবরখানায় আক্রমণ চলে, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় অনুমোদনে ধ্বংস সংঘটিত হয়। সমাধিটি কী অবস্থায় ছিল? ১৯৫৮ এ মৃত ওস্তাদ, তাঁর কবর দেখতে গিয়েছিলেন কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুর চোদ্দ-পনেরো বছর পরে। বরোদায় গিয়ে দেখলেন, ওস্তাদের মজ্‌হার কোথায়, সেটা জানাতো দূরের কথা, ওস্তাদ কে তাই কেউ জানেনা। খুঁজতে খুঁজতে তিনি শহরের অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে, একটি ছোট মোটর গ্যারাজের পিছনের দরজা দিয়ে, একটা কাঠা দশেক খোলা জায়গায় একাধিক নাম না জানা কবরের মধ্যে দেখতে পান, এককোণে ছত্রীওয়ালা কবর ওস্তাদের। প্রশ্ন জাগে, এমন একটি চূড়ান্ত অবহেলায় পড়ে থাকা কবরের উপর আক্রোশ হবে কার? যেখানে ওস্তাদকেই লোকে ভুলে গেছে। মহাশ্বেতা দেবী যখন কবর ধ্বংসের খবর পেয়ে ধিক্কার জানান, তখন নিশ্চয় কবর ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু সেটা কী ওস্তাদকে অসম্মান করার জন্য? যাঁর গানে রাধাকৃষ্ণের ছড়াছড়ি যিনি সঙ্গীত শুনে 'রাধে রাধে' বলে তারিফ জানাতেন, যিনি ধ্রুপদ গাইতেন 'ওম অনন্ত নারায়ণ হরি' দিয়ে, তাঁর উপর গৈরিক বাহিনীর আক্রোশ হবে কেন? কবরখানায় আক্রমণ বিশেষ করে ফৈয়াজ খাঁকেই অসম্মান, না, অন্ধভাবে কবর ধ্বংস, না জমির ধান্ধায় এই আক্রমণ? অর্থনীতিকেরা দাঙ্গার পিছনে জমিজমার লোভের কথা বলেন, গুজরাটের দাঙ্গাতেও শিল্পপতিদের লোভের কথা বলা হচ্ছে। ফৈয়াজ খাঁকেই অপমান করা হয়েছে, এমন নিশ্চিত প্রমাণ কি পাওয়া গেছে? এই ধ্বংসের সর্বভারতীয় প্রতিক্রিয়া হয়নি, যা ধিক্কার শোনা গেল শুধু কোলকাতায়।"

দুই

এবার জবাব দেওয়া যাক স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বিকৃত করার বিপজ্জনক উদ্যোগ প্রসঙ্গে। ইতিহাস কারা বিকৃত করেছে? গৈরিক বাহিনী, লাল বাহিনী না তেরঙ্গা বাহিনী?

ইতিহাস ঘটনাভিত্তিক, কোনও গল্প ইতিহাসের মর্য্যাদা পেতে পারেনা। কিন্তু, ১৯৮২ অব্দে ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এন.সি.ই.আর.টি) বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে একটি নির্দেশনামা দিয়েছেন, "মধ্যযুগকে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের যুগ বলে চিহ্নিত করা নিষিদ্ধ।"

অর্থাৎ, মধ্যযুগ যদি সত্যসত্যই হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষের যুগ হয়, তাহলে সেই সত্য গোপন করে যেতে হবে।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে গোপন করতে হবে ফিরোজ শাহ তুঘলক বা ঔরঙ্গজেবের বীভৎস অত্যাচারের কথা। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আতহার আব্বাস রিজভী তাঁর *শাহ ওয়ালিউল্লা ও সমকাল* পুস্তকে লিখেছেন, ঔরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বকালে প্রশাসনের নতুন একটি বিভাগ চালু করেন--ইহতিসাব বিভাগ। এই বিভাগের কাজ ছিল ইসলামী মৌলভী ও আলিমদের আর্থিক সাহায্যদান, জনসাধারণের নৈতিক চরিত্রের উপর লক্ষ্য রাখা এবং দমন পীড়নের মাধ্যমে ইসলামের উন্নতি সাধন। প্রথম প্রথম ইসলামী নৈতিকতা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বিভাগটিকে ব্যবহার করা হলেও পরে এটি হিন্দু দলনের কাজেই ব্যবহার করা হয়। প্রতিমা পূজার বিরোধিতা এবং ৮/১০ বছরের পুরানো মন্দির ধ্বংস করাই এই বিভাগটির কাজ হয়ে দাঁড়ায়। সামরিক অভিযানের সময় মন্দির ধ্বংসের নীতিকে ঔরঙ্গজেব পুনরুজ্জীবিত করেন। এই নীতি অনুযায়ী পালামৌ, কুচবিহার, রাজস্থান এবং পরে দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলি নির্দয়ভাবে ধ্বংস করা হয়।

উপরিলিখিত ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িকই। কিন্তু এই কথাগুলি লিখলে ইতিহাস সঠিক হবে না বাদ দিলে ইতিহাস সঠিক হবে? ঘটনা যদি সাম্প্রদায়িক হয় তার বিবরণও সাম্প্রদায়িক হবে। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা বাদ দিতে গেলে ইতিহাসকে বিকৃত করতে হবে। অরুন্ধতী রায়রা কি চাইছেন? সঠিক ইতিহাস? না ইতিহাসের নামে কল্পিত গল্প?

ইতিহাসের নামে কল্পিত গল্পের সেরা উদাহরণ পশ্চিম বঙ্গের শিশুদের অবশ্যপাঠ্য কিশলয় চতুর্থ ভাগের (চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য) *বাঁশের কেল্লা* নিবন্ধটি। নিবন্ধটি লেখকের নাম বিহীন। অর্থাৎ, লেখকের স্বনাম প্রকাশের সাহস নেই। তিতুমীর ছিলেন *তরিকা-ই-মুহাম্মদীয়া* নামক ইসলামী মৌলবাদী আন্দোলনের শরীক। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা দিল্লী দখল করলে তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ ইসলামী পন্ডিত শাহ আবদুল আজিজ দেশ *দার-উল-হরব* বা ইসলামের শত্রুর দেশ হয়ে গেছে ঘোষণা করলেন। এর ফলে জেহাদ করে দেশকে পুনরায় ইসলামী সাম্রাজ্যে পরিণত করার দায়-দায়িত্ব এলো দেশের মুসলমানদের নিকট। এই কঠিন কর্তব্য পালন করতে এগিয়ে এলেন শাহ আবদুল আজিজের শিষ্য রায়বেরিলীর সৈয়দ আহমদ। তাঁর বহু সাগরেদের মধ্যে একজন হলেন উত্তর চব্বিশ পরগণার হায়দরপুরের মীর নিশার আলি বা তিতুমীর।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে ইসলামী সাম্রাজ্যে হিন্দুরা ছিল তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক। তাদের জিজিয়া নামক কর দিয়ে নীচুতলার মানুষ হিসাবে নিজের দেশে ইসলামী আইনের বেড়াজালে র মধ্যে বাস করতে হতো। ইসলামী আইনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সাক্ষ্যের কোনও দাম ছিলনা। সেজন্য মুসলমানরা গ্রামের মধ্যে ঢুকে নারীধর্ষণ, খুন-জখম করে এবং ক্রীতদাস করার জন্য মানুষ ধরে নিয়ে চলে যেত। পরে আমরা এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবো।

তিতুমীরের কাজ ছিল গুরুর জন্য জেহাদী সংগ্রহ করা। কিন্তু তখনকার দিনে বাঙলার গ্রামের মুসলমানরা ছিল নামমাত্র মুসলমান। তারা নিজেদের ধর্মের কিছুই জানতো না।

এমনকি নমাজ পড়তেও জানতো না। তারা পীরের থানে যেত পীর পুজা করতে, নানারকম ঐহিক আকাঙ্খা পূরণের জন্য মানত করতে। কিন্তু ঐসব ইসলামে নিষিদ্ধ। ইসলাম কঠোর একেশ্বরবাদ। এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা ইসলামবিরোধী। কাজে কাজেই জেহাদের সৈনিক সংগ্রহের জন্য তিতুমীর প্রথমে গ্রামের নামমাত্র মুসলমানদের পাক্কা মুসলমানে পরিণত করতে সচেষ্ট হলেন। কারণ, পাক্কা মুসলমান না হলে জেহাদী চেতনা মনের মধ্যে জাগা সম্ভব নয়। তিনি তাদের রোজা নমাজ ইত্যাদি শেখাতে লাগলেন। বারণ করলেন পীরের দরগায় মানত বা পীরপুজা করতে। তখনকার দিনের গ্রাম্য মুসলমানদের পিতামাতা হিন্দুদের মতই নাম রাখতেন সন্তানের। বলাই মন্ডল, প্রভাত মন্ডল, নারায়ণ তরফদার ইত্যাদি নাম ছিল মুসলমানদেরও। তারা দাড়িও রাখতো না। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাদের পরিধেয় ছিল ধুতি আর কাঁধে থাকতো গামছা। বাহ্যিক রূপ দেখে হিন্দু-মুসলমান তফাৎ করা যেতনা। পরম সাম্প্রদায়িক সাম্যের মধ্যে বাস করতো গ্রামের হিন্দু-মুসলমান।

তিতু তাদের যে শুধু পীরপুজা করতে বারণ করলেন তাই নয়, তাদের মুসলমানী ধরনের নাম রাখতে এবং দাড়ি রাখতেও নির্দেশ দিলেন। দাড়ি রাখা পয়গম্বর হজরত মুহাম্মদের নির্দেশ। কিন্তু পীরপুজা করে ও পীরের দরগায় মানত করে গ্রামের মুসলমানরা মানসিক শান্তি ও আনন্দ পেত। সুতরাং তারা তিতুর এইসব কঠোর নির্দেশ ভাল মনে গ্রহণ করলো না। তিতুমীর তিন চারশোর মত সাগরেদ সংগ্রহ করেছিলেন। তাদের তিনি পাক্কা মুসলমানে পরিণত করছিলেন, যাতে তারা জেহাদে যোগদান করার মত সুদৃঢ় মানসিকতা অর্জন করে। তারা তিতুর নির্দেশ অনুযায়ী লুঙ্গির মত করে ধুতি পরতো। মাথার মাঝখানটা কামাতো এবং দাড়ি রাখতো। নিজেদের নাম পাল্টে আরবী ধরনের নামও নিয়েছিল তারা। গ্রামবাসীরা তাদের *মৌলভী* বলতো।

ওদিকে তিতুমীরের গুরু সৈয়দ আহমদ তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জেহাদ করছিলেন শিখ রাজা রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে। তাঁর আকাঙ্খা ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ জয় করে কাশ্মীর আক্রমণ করবেন এবং কাশ্মীর থেকে নেমে আসবেন ভারতের সমতলভূমিতে। এইভাবে সমগ্র ভারত জয় করে ভারতের মাটিতে পুনরায় স্থাপন করবেন ইসলামী সাম্রাজ্য। তিনি জেহাদ করতে করতে একসময় সীমান্ত প্রদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর পেশোয়ার জয় করেন। পেশোয়ার জয়ের সংবাদ তিতুর নিকট পৌঁছলে সাগরেদ সহ তিতু উৎসাহী হয়ে উঠেন এবং মৌলভীরা মহরমের সময় তারাগনিয়া গ্রামের পীরের দরগায় নজর দিতে যাওয়া গ্রামবাসী মুসলমানদের বাধা দেয় এবং দরগার গায়ে লাথি মেরে অসম্মান করে।

শান্তিপ্রিয় মুসলিম গ্রামবাসীরা এতে ব্যথিত হয়ে প্রতিকারের জন্য গ্রামের হিন্দু জমিদারদের কাছে নালিশ করে। প্রজাদের নালিশ শুনে তিতুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আরম্ভ করেন জমিদাররা। তাঁরা গ্রামের মুসলমানদের পিতৃদত্ত নাম পাল্টে অন্য নাম গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। দাড়ি রাখতেও বারণ করেন তাদের। কারণ, দাড়ি রাখা তখন গ্রামের মুসলমানদের রীতি ছিলনা।

একমাত্র মৌলভীরাই দাড়ি রাখতে আরম্ভ করেছিল। পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণ দেব রায় দাড়ির উপর আড়াই টাকা কর বসিয়ে মৌলভীদের নিরুৎসাহ করতে উদ্যোগী হন। এতে তিতু ভয়ঙ্কর ক্ষেপে যান। কারণ, দাড়ি রাখা যেহেতু পয়গম্বর হজরত মুহাম্মদের নির্দেশ, তাতে বাধা দেওয়া মুসলমানদের ধর্মে হস্তক্ষেপের সামিল। তিতু ও তার সাগরেদদের সঙ্গে জমিদারদের বিবাদ বেঁধে যায়। তারা প্রথমে সরকারের কাছে নালিশ করে। সরকারের কাছে নালিশ করে কোনও সুরাহা না হওয়াতে এবং জমিদাররা তিতুদের সঙ্গে শত্রুতা বৃদ্ধি করাতে তিতুর সাগরেদরা কলকাতায় যায় বড় আদালতে নালিশ করার জন্য। কিন্তু পূজার ছুটির জন্য কলকাতার আদালত বন্ধ ছিল এবং সেখানে তিতুর সাগরেদরা খবর পায় যে বালাকোটের যুদ্ধে তিতুর গুরু সৈয়দ আহমদ রণজিৎ সিংহের পুত্র শের সিংহের হাতে শহীদ হয়েছেন। পরে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে কিছু জেহাদী তিতুর গ্রামে উপস্থিত হয়। তাদের মুখ থেকেও সৈয়দ আহমদের শহীদত্বের সংবাদ পান তিতু। তিতু গুরুর কাছে জেহাদ করার জন্য শপথবদ্ধ ছিল। এখন জমিদারদের অত্যাচারের বদলা নেওয়ার জন্য তিতু জেহাদ শুরু করে। প্রথমে পুঁড়ার বাজারে গোহত্যা করে মন্দির অপবিত্র করে গরুর রক্ত লেপে। পরে গরুটি চার ভাগ করে টাঙিয়ে দেয় বাজারের চার কোণে। বাজারে হিন্দুদের কিছু দোকানও লুট করে। এর ফলে ব্যাপারটা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাতে পর্যবসিত হয়। হিংস্র তিতু হিন্দুদের গ্রাম আক্রমণ করে বলপূর্বক হিন্দু গ্রামবাসীদের ধর্মান্তরিত করতে থাকে। মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে এবং গোমাংস মুখে ঠেসে দিয়ে ব্রাহ্মণদের মুসলমান হতে বাধ্য করে। এমনকি যেসব মুসলমান তাদের দলে যোগ দেয়নি তাদেরও বাড়ী লুট করতে ও মারধোর করতে থাকে।

তিতুর অত্যাচারের বীভৎস চিত্র ফুটে উঠেছে তার সাগরেদ ও সহযোদ্ধা সাজন গাজীর গানে। ব্রিটীশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য সাজন গাজীর জেল হয়। জেলে বসে সাজন তিতুমীরের বিদ্রোহের কথা গানের আকারে লেখেন। সাজন গাজীর গানের কয়েকটি চরণ হলো:

বামুনের মেয়ে এনে নেকা দেয় কতো জনে
সাঁকা ভাঙি হাতে দিল চুড়ি।
বামুন গোনেরে ধরে কলমা পড়ায় জোরে
চুল ফেলে মুখে রাখে দাড়ি।
গাও গোস্ত তারা খাইয়া কাপড় পড়ে ওন্দারা দিয়া
কাছা খুলে সবে গেল বাড়ী।।

গ্রামাঞ্চলে নীল উৎপাদনে রত নীলকর সাহেবরা তিতুদের বিরোধিতা করলে তিতু নীলকরদের কুঠি আক্রমণ করে। কিন্তু পরে ঘুষ দিয়ে তিতুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নেয় কয়েকজন নীলকর। তিতু তাদের বিনা বাধায় নীল বুনতে অনুমতি দেয়। কারণ, ইসলাম ধর্মে খ্রীষ্টানদের জিজিয়া কর দিয়ে দার-উল-ইসলামে শান্তিতে বসবাস করতে দেওয়ার কথা আছে।

এছাড়া নীলকরদের অত্যাচারের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সে ধরনের অত্যাচার অনেক

পরের ঘটনা। ঐ সময়ে নীলকররা অত্যাচার করতো, এমন কথা ইতিহাসে নেই।

শিশুদের শেখানো হচ্ছে, তিতুমীর জমিদারদের জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। কৃষ্ণ দেব রায় নামে এক জমিদার প্রত্যেক প্রজার দাড়ির উপর আড়াই টাকা করে কর বসিয়েছিলেন। নীলকররা ইচ্ছামত কৃষকদের নীলচাষ করতে বাধ্য করতো। অনিচ্ছুক কৃষকদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাতো। এইসব অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তিতুমীর রুখে দাঁড়ালেন। হিন্দু-মুসলমান কৃষক দলে দলে তিতুর পাশে এসে দাঁড়ালো।.......তিতু নিজেকে শাসনকর্তা বলে ঘোষণা করলেন। আশে পাশের কয়েকটি গ্রামের হিন্দু মুসলমান কৃষক তাকে বাদশাহ বলে মেনে নিল।

ইতিহাস হচ্ছে, মাত্র দুজন হিন্দু তিতুকে সমর্থন করেছিল। তাদের মধ্যে একজন ভূষণার নাবালক জমিদার মনোহর রায়। তাকে তিতুর সঙ্গী জাদুকর মিস্কিন শাহ যাদু দেখিয়ে মোহিত করেছিল। অন্যজন ফটিক পাঠক নামক এক উন্মাদ। তাছাড়া তিতুর জেহাদী আন্দোলন ছিল একান্তই ইসলামী মৌলবাদী। সেই আন্দোলনে কোনও অমুসলমানকে শরীক করার কথা নয়। তঞ্চক লেখক শিশুদের সঙ্গে নিছক তঞ্চকতা করেছেন এক ভয়ঙ্কর অত্যাচারী মৌলবাদীকে দেশপ্রেমিক বানিয়ে। তিতুমীর মুসলমান রাজত্ব ফিরিয়ে আনার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মাত্রই স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়। সাম্য ও মৈত্রীই স্বাধীনতার পূর্বসর্ত। ইসলামী রাজত্বে হিন্দুরা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে বাস করতো, এটা বিস্মৃত হলে চলবে না।

নামগোত্রহীন লেখক উপসংহারে লিখেছেন, *তিতুমীর আর দেশের এইসব মানুষ সেদিন ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ গড়ে দিলেন। সেই পথই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজপথে পরিণত হয়েছিল।*

মার্কসীয় ঐতিহাসিক কান্টওয়েল স্মিথ লিখেছেন, এই বিদ্রোহ " সাম্প্রদায়িক মানসিকতা বৃদ্ধি করতে উৎসাহ দিয়েছিল, এবং মুসলিম জনগণের এক বড় অংশকে পরবর্তী কালে সাম্প্রদায়িক প্রচারের দ্বারা গ্রস্ত হতে সাহায্য করেছিল, এটা না ঘটলে যা সম্ভব ছিলনা।"

এ ছাড়া মার্কসীয় ঐতিহাসিক নরহরি কবিরাজ তিতুমীরের বিদ্রোহকে জেহাদ বলে অভিহিত করেছেন। সেই সঙ্গে বলেছেন, তিতুমীরের বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম সচেতন বিদ্রোহ বলা ভুল।

নামগোত্রহীন লেখক তো দাঙ্গাবাজ লম্পটদের নেতা তিতুমীরকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অগ্রদূত বানিয়ে দিলেন। সঙ্গে যে অনুশীলনী দেওয়া হলো তা আরও মারাত্মক। তিতুমীর একজন দেশপ্রেমিক। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এমন তিনজন দেশপ্রেমিকের নাম কর।

যে তিতুমীরের নেতৃত্বে মৌলভীরা মুখে গরুর মাংস ঠেসে দিয়ে হিন্দুদের ইসলামায়িত করেছিল, হিন্দুঘরের মেয়েদের ধরে এনে ধর্ষণ করেছিল, সেই তিতুমীরকে শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামী বানিয়ে ক্ষান্ত নয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তিতুমীরকে ক্ষুদিরাম বা বিনয়-বাদল-দীনেশের

সমকক্ষ করতে চায়!

শ্রীমতী রায়, ইতিহাসের এর চেয়ে বড় বিকৃতি কী হতে পারে? এটা বামমার্গীদের ইতিহাস বিকৃতিকরণের একটি কুৎসিত উদাহরণ।

আর একজন মুসলিম শাসক ফিরোজ শাহ তুঘলক নিজেই লিখেছেন যে তিনি পৌত্তলিকদের মন্দির ধ্বংস করেছেন ধর্মের কারণে, লোভের বশে নয়। তিনি লিখেছেন: *হিন্দুরা জিজিয়া কর দিয়ে জিম্মি রূপে নিরাপত্তা পেয়েছে। কিন্তু এখন তারা পয়গম্বরের পবিত্র আদেশের বিরুদ্ধে মন্দির তৈরী করতে আরম্ভ করেছে শহরের মধ্যে। পবিত্র ধর্মের নেতা হিসাবে আমি মন্দিরগুলি ধ্বংস করেছি, হত্যা করেছি পৌত্তলিক নেতাদের আর সাধারণ হিন্দুদের মারধোর করেছি, যাতে এই ধরনের ক্রিয়াকর্ম সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়।*

পৌত্তলিক হিন্দুরা কোনও উৎসব পালন করছে শুনলে ফিরোজ তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: *আমার ধর্মীয় বোধ এই ধরনের কেলেঙ্কারী দমন করতে প্রবুদ্ধ করতো। এটা ইসলামের প্রতি অপমান। উৎসবের দিনে আমি নিজেই উপস্থিত হতাম ঘটনাস্থলে। এই ঘৃণ্য অনুষ্ঠান করার জন্য পালনকারীদের ও নেতাদের কোতল করার আদেশ দিতাম। তাদের প্রতিমার মন্দিরগুলি ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করতাম সেই জায়গায়।* ফিরোজ শাহ তুঘলকের কথাগুলি নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক। কারণ, মানুষটাই ছিলেন সাম্প্রদায়িক। কিন্তু ফিরোজ শাহ তুঘলকের অস্তিত্ব, তাঁর হিন্দুবিরোধী ক্রিয়াকলাপ সবই ঐতিহাসিক সত্য। তাঁর সত্য কথাগুলি গোপন করা কী ইতিহাস বিকৃতি হবে না?

বিগত ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করে (সার্কুলার নং এস.ওয়াই.এল/৮৯/১, তাং ২৮.৪.৮৯) এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের কাছে ঐ বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কীভাবে ইতিহাসের বই লিখতে হবে তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঐ নির্দেশাবলীর প্রথম কথাই হলো ভারতের মুসলিম যুগকে কোনও রকম সমালোচনা করা যাবেনা। মুসলমান শাসকেরা যে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছে তা উল্লেখ করা যাবেনা।

বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হলো, " এই কারণে নবম শ্রেণীর ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকগুলির লেখক ও প্রকাশকদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে তাঁরা যেন তাঁদের বইয়ের ভবিষ্যৎ সংস্করণগুলিতে নীচে যেমন দেখানো হয়েছে সেই ভাবে, অশুদ্ধ অংশগুলিকে শুদ্ধ করে প্রকাশ করেন। আর যেসব বই ইতিমধ্যে ছাপা হয়ে গিয়েছে, তাতে নিম্নলিখিত অশুদ্ধ-শুদ্ধ তালিকাটি জুড়ে দেন এবং সেই রকম একখানা বই যেন ৭৪ নং রফি আহমদ কিদোয়াই রোড, কলকাতা-১৬ স্থিত পর্ষৎ অফিসে জমা দেন।"

সেই অশুদ্ধ-শুদ্ধের তালিকাটি নিম্নরূপ:

পুস্তকের নাম : ভারত কথা
প্রকাশক : বর্ধমান শিক্ষা সমিতি, শিক্ষা সংগঠন
প্রকাশকের নাম: সুখময় দাস

অশুদ্ধ	শু
পৃষ্ঠা ১৪০ : সিন্ধুদেশে আরবরা হিন্দুদের কাফের বলে মনে করতো না। তারা গোহত্যা বন্ধ করেছিল।	'তারা গোহত্যা বন্ধ করেছিল' অংশটি বাদ দিতে হবে
পৃষ্ঠা ১৪১: চতুর্থতঃ, বলপূর্বক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করাও একপ্রকার আক্রমণ। পঞ্চমতঃ বলপূর্বক হিন্দু রমণীদের বিবাহ করা ও তাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করাও উলেমাদের দ্বারা মৌলবাদ প্রসারের একটা দিক।	যদিও 'চতুর্থতঃ শব্দের পর থেকেই অশুদ্ধতা শুরু হয়েছে, তবে দ্বিতীয়তঃ থেকে 'উলেমা' পর্যন্ত পুরো অংশটাই বাদ হবে।
পৃষ্ঠা ১৪১: যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী মুতাজিলা দর্শন অন্তর্হিত হলো। একদিকে কোরান ও হাদিসকে ভিত্তি করে......	একদিকে কোরান ও হাদিসকে....' গোটা অংশটা বাদ দিতে হবে।

পুস্তকের নাম: ভারতবর্ষের ইতিহাস
লেখকের নাম: ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
প্রকাশকের নাম: চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃষ্ঠা ৮৯: সুলতান মামুদ ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম ও বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ করেছিলেন।	সুলতান ব্যাপক হত্যা, ধ্বংস ও লুণ্ঠন শুদ্ধ করেছিল ঠিকই, কিন্তু বলপূর্বক ধর্মান্তর করেছিল তার কোনও প্রমাণ নেই।
পৃষ্ঠা ৮৯: সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করে সে প্রায় ২ কোটি দিরহাম (স্বর্ণমুদ্রা) মূল্যের মূল্যবান জিনিষপত্র নিয়ে গিয়েছিল। সোমনাথের শিবলিঙ্গ গজনীতে নিয়ে গিয়ে সেখানকার মসজিদে তা সিড়ির মত ব্যবহার করেছিল।	'সোমনাথের শিবলিঙ্গ ....সিঁড়ির মত ব্যবহার করেছিল' অংশটা বাদ দিতে হবে।
পৃষ্ঠা ১১২: মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কটা খুবই স্পর্শকাতর বিষয় ছিল।	সমস্ত বিষয়টাই বাদ দিতে হবে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অ-মুসলমানদের মৃত্যু অথবা ইসলাম, এই দুইয়ের মধ্যে একটাকে বেছে নিত হতো।	
পৃষ্ঠা ১১৩: ইসলামী আইন অনুসারে অ-মুসলমানদের সামনে দুটো রাস্তা খোলা ছিল, হয় ইসলাম অথবা মৃত্যু। একমাত্র হানিফি মত অনুসারেই অ-মুসলমানদের জিজিয়া কর দিয়ে প্রাণরক্ষা করার ব্যবস্থা ছিল।	বিষয়টা এইভাবে লিখতে হবে, আলাউদ্দিনকে জিজিয়া কর দিয়ে সকল হিন্দুই সাধারণ জীবন যাপন করতে পারতো।
পৃষ্ঠা ১১৩: মেহমুদ ইসলামে প্রবল বিশ্বাসী ছিলেন, যার মূল কথা হলো হয় ইসলাম নয় মৃত্যু।	পুরো বিষয়টা বাদ দিতে হবে।

পুস্তকের নাম: ভারতের ইতিহাস
লেখকের নাম: শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশকের নাম: নর্মদা পাবলিশার্স

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃষ্ঠা ১৮১: মুসলমানরা যাতে দেখতে না পায় সেজন্য হিন্দু রমণীদের ঘরে বন্দী করে রাখা হতো।	পুরোটা বাদ দিতে হবে।

পুস্তকের নাম :ইতিহাসের কাহিনী
লেখকের নাম: নলিনীভূষণ দাসগুপ্ত
প্রকাশকের নাম: বি.বি.কুমার

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃষ্ঠা ১৩২: বিখ্যাত ঐতিহাসিক টড এর মতে আলাউদ্দিনের চিতোর অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল রানা রতন সিংহের সুন্দরী পত্নী পদ্মিনীকে হস্তগত করা।	পুরোটা বাদ দিতে হবে
পৃষ্ঠা ১৫৪-ইসলামী আইন অনুসারে অ-মুসলমানদের সামনে তিনটি রাস্তা খোলা ছিল। হয় মুসলমান হও, নতুবা জিজিয়া কর দাও অথবা মৃত্যু বেছে নাও। যে কোনও একটা ইসলাম শাসিত রাজ্যে যে কোনও অ-মুসলমানকে এই তিনটির মধ্যে যে কোনও একটিকে বেছে নিতে হত।	পুরোটা বাদ দিতে হবে

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃষ্ঠা ১৬১ : প্রথম দিকে মুসলমান শাসকেরা বলপূর্বক হিন্দুদের মুসলমান করে ইসলামের সাম্রাজ্য বাড়াতে খুবই তৎপর ছিল।	পুরোটা বাদ দিতে হবে

পুস্তকের নাম : ভারতের ইতিহাস
লেখকের নাম: পি মাইতি
প্রকাশকের নাম: শ্রীধর প্রকাশনী

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃষ্ঠা ১১৭: কথিত আছে যে, আলাউদ্দিন রানা রতন সিংহের সুন্দরী পত্নী পদ্মিনীকে লাভ করতে মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করেন।	পুরোটাবাদ দিতে হবে
পৃষ্ঠা ১৩৯: তখনকার দিনে মহিলাদের পর্দা রক্ষা করার মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ আছে মনে করা হতো। এই কারণে অভিজাত মুসলমানদের অনুসরণে অভিজাত হিন্দু রমণীদের মধ্যেও পর্দা চালু হয়। অনেকের মতে মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই হিন্দু সমাজে পর্দার প্রচলন হয়।	পুরোটাবাদ দিতে হবে

পুস্তকের নাম: ভারত কথা
লেখকের নাম : জি ভট্টাচার্য
প্রকাশকের নাম: বুলবুল প্রকাশন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃষ্ঠা ৪০: মুসলমানরা ভারতীয়দের উপর তাদের ধর্মবিশ্বাস চাপিয়ে দিতে অকথ্য অত্যাচার ও অন্যান্য অমানবিক পন্থা গ্রহণ করতো।	পুরোটা বাদ দিতে হবে।
পৃষ্ঠা ৪১: ইসলামের মধ্যকার উদার ও মানবিক দিকগুলো অত্যাচারিত হিন্দুদের মধ্যে আশা জাগাত্রে।	পুরোটা বাদ দিতে হবে। তার বদলে লিখতে হবে--ইসলামে জাতিভেদের কোনও স্থান নেই। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের অনুপ্রেরণা হিন্দুদের মধ্যে এক নবজাগরণের সূচনা করে। ফলে নীচ বর্ণের হিন্দুরা ইসলাম গ্রহণ করে।

মার্ক্স-ইসলাম অক্ষের ইসলাম প্রচার

এইসব অশুদ্ধি সংশোধনের দ্বারা মার্ক্স-ইসলাম অক্ষ ইসলামের তথ্য গোপন করতে চাইছে। কারণ, গজনীর মামুদ যে বলপূর্বক অজস্র ভারতীয়দের ইসলামায়িত করেছিলেন, তা ঐতিহাসিক সত্য। তার বিবরণ ঐতিহাসিক উথবী তাঁর *তারিখ-ই-ইয়ামিনী* পুস্তকে নথিবদ্ধ করেছেন। এইসব ইসলামায়িতদের মধ্যে আছে জয়পালের আত্মীয় সুখপাল এবং শুধুমাত্র বরনেই (বুলন্দশরে) ইসলামায়িত করা হয় রাজা সমেত দশ হাজার জনকে।

শুধু ইসলামের তথ্য গোপন নয়, সরকারী উদ্যোগে ইসলাম প্রচার করছে মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ। এবং তঞ্চকতা করে। উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে ইসলামে জাতিভেদ প্রথা নেই। এটা একটা বিরাট ধাপ্পা। আমাদের পুস্তকে (নবরূপে তিতুমীর) এই নিয়ে আলোচনা আছে। আবার আলোচনা করা হচ্ছে:

মুসলমান সমাজ মুলতঃ দাস-প্রভুর সমাজ। দাসরা কখনও প্রভুর সমান হতে পারেনা।

এ সম্পর্কে কোরানের আয়াত: "আল্লাহ্ তোমাদের কাউকে কাউকে খাদ্যবস্ত্রের দিক দিয়ে বেশী অনুগ্রহ করেছেন। যারা বেশী অনুগ্রহ পেয়েছে তারা সেই রসদ তাদের ডান হাতে পাওয়া দাস-দাসীদের দেয়না, কেননা তাতে তারা অশনে বসনে মনিবদের সমান হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহ তারা (মনিবরা) কি অস্বীকার করতে পারে? (১৬/৭)

এবং, "তোমাদের আমি যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণ কি তাতে অংশীদার? যাতে ওরা তোমাদের সমান হতে পারে, এবং তোমরা তোমাদের সমকক্ষদের যেমন ভয় কর তোমরা কি ওদের সেরূপ ভয় কর?" (৩০/২৮)

এ তো গেল দাসদের কথা। দাসীদের খাটানো বা বিক্রয় করা ছাড়াও দৈহিক সম্ভোগের সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এ সম্পর্কে কোরানের ৪/২৪ আয়াতে বলা হয়েছে, দাসী সধবা হোক আর কুমারী হোক তাদের অবাধে ভোগ করা যাবে। এ সম্পর্কে সহী মুসলিমের হাদিশের কথা আগেই বলা হয়েছে।

ইসলামে দাসপ্রথা সম্পর্কে টমাস পাট্রিক হিউয়েজ লিখেছেন, দাসপ্রথা ইসলামের বিবাহ আইন, বিক্রয়-সংক্রান্ত আইন ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে এই প্রথার বিনাশ ইসলামের ভিত্তিতেই আঘাত করে।

ভারতে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হয় ১৮৬১খ্রীষ্টাব্দে, ইংরেজের বিধানে। তুর্কী সাম্রাজ্যে এই প্রথা নিষিদ্ধ হয় ইংরেজের চাপে, ক্রিমিয়া যুদ্ধের পরে (১৮৫৫-৫৬)। কিন্তু খোদ আরবভূমি তুর্কী সুলতানের এই আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে খলিফা তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

বস্তুতঃ দাস ও প্রভু সম্পর্ক ইসলামী সমাজে চরম ও পরম জিনিষ। কিন্তু দাসকুলের বহিস্থ মুসলমানরা সামাজিক সাম্যের সম্পর্কে সম্পন্ন নন। মুসলমানদের মধ্যে বেশী নেকনজর পাওয়া গোষ্ঠী হচ্ছে কোরেশ গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর মধ্যেই স্বয়ং হজরত মুহাম্মদের জন্ম হয়েছিল। কোরানে প্রথম যুগের দুটি অধ্যায়ে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহভাজন হিসাবে কোরেশ গোষ্ঠীর গুণগান করা হয়েছে। কোরেশদের সঙ্গে অন্য মুসলমানদের বৈষম্যের কথা আছে হাদিশে।

সহী মুসলিমের ৪৪৭৩ নং হাদিশে আছে সমস্ত মানবজাতিই কোরেশদের তাঁবেদার, যারা মুসলমান তারা মুসলমান কোরেশদের তাঁবেদার, যারা কাফের তারা কাফের কোরেশদের তাঁবেদার।

অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে কোরেশরা হচ্ছে বড় ভাই। সেই সঙ্গে যোগ করা যায় সৈয়দরা হচ্ছেন আরও বড় ভাই। কারণ, তাঁরা শুধু কোরেশই নন, তাঁরা খোদ পয়গম্বরের বংশজাত কোরেশ। আরবী 'সৈয়দ' কথাটির অর্থ প্রভু। পয়গম্বর স্পষ্টবাক্যে বিধান দিয়ে গেছেন খলিফার পদ কখনও কোরেশ জাতির বাইরে যেতে পারবে না।

পয়গম্বর স্বীকৃত এই কোরেশ-অকোরেশ ভেদাভেদ খলিফাদের আমলে আরব-আজম (অনারব) ভেদাভেদে পরিণত হয়। ভারতের হিন্দু বংশজাত মুসলমানরা তুর্কী বিজেতাদের কাছ থেকে কাফেরের বেশী মর্য্যাদা পায়নি। তুর্কী জন্ম-গর্বিত জিয়াউদ্দিন বারাণী ভারতীয় মুসলমানদের বলতেন অন্ত্যজ জাতি। ঐ সময় ভারতীয় মুসলমানরা আশ্রফ, আজলফ, আর্জল ও আতরাফে বিভক্ত হয়। সব কটি শব্দই আরবী, যার তাৎপর্য আরব দেশ থেকেই ঐ ধারণাগুলি আমদানি করা। আবার আশ্রফ মানে সম্ভ্রান্ত। এদের কেউ শেখ, কেউ সৈয়দ, কেউ পাঠান, কেউ মোগল। অর্থাৎ, আশ্রফরাও একীভূত গোষ্ঠী নন। কিন্তু আজলফ বা বাজে লোকদের সঙ্গে এদের পার্থক্য মনিবের সঙ্গে গোলামদের পার্থক্যের চেয়ে কম নয়।

তবে এ কথা অনস্বীকার্য কোরানে অনেক জায়গায় বলা হয়েছে, "মুসলমান যেন মুসলমানের রক্ত পাত না করে, কেননা তারা ভাই ভাই।" কিন্তু এটা কোনও সামাজিক সাম্যের বাণী নয়। মুসলমান মুসলমানের রক্তপাত করবে না এ কথার অর্থ এই নয় যে গোলাম মুসলমানের গোলামী তুলে নিয়ে মনিবের সমান মর্য্যাদা দিতে হবে। এমনও নয় যে কোরেশ অকোরেশে ভেদাভেদ মুছে যাবে, বা, এমনও নয় যে আরব মুসলমান অনারব মুসলমানকে, সৈয়দ মুসলমান জোলা মুসলমানকে কন্যাদান করবে। সুরা আহজাব বলে কোরানের একটা অধ্যায় আছে। ঐ সুরা নাজিল হওয়ার আগে মুহাম্মদ মদিনায় এসে একজন মোহাজির বা মক্কা আগতের সঙ্গে একজন আন্সার বা মদিনাবাসী মুসলমানের ব্রাদারহুড পত্তন করেন। কিন্তু আল্লাহ্ এই সুরায় পরিষ্কার বিধান দিলেন: আল্লাহ্র বিধান অনুসারে বিশ্বাসী ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্মীয় তারা নিকটতর। অর্থাৎ পাতানো ভ্রাতৃত্ব থেকে নিকটতর হচ্ছে রক্তের সম্পর্ক।

বস্তুতঃ সব মানুষ সমান, এই ধারণা নিতান্তই আধুনিক। প্রাক্ আধুনিক পৃথিবীতে 'সব মানুষ সমান' এ ধারণা ছিল অজানা। রুশো এবং টমাস জেফার্সনই সামাজিক সাম্যের বাণী প্রথম উচ্চারণ করেন।

বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, প্রাক্-আধুনিক মুসলিম বুদ্ধিজীবিরা ভারতীয় ধর্মগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামকে কখনও সামাজিক সাম্যের ধর্ম হিসাবে অভিক্ষেপিত করেননি। তাঁরা ইসলামকে ভারতীয় বহুঈশ্বরবাদী ধর্মের বিপরীতে একেশ্বরবাদী ধর্ম হিসাবেই অভিক্ষেপিত করেন। অর্থাৎ, তুলনাটা ধর্মতাত্ত্বিক, ধর্ম-সামাজিক নয়। ইসলাম সামাজিক সাম্যের কথা বলে, এ

ধারণাটি নিতান্তই আধুনিক। ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের পর, আরও বিশদ করে বলতে গেলে মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের উপর ফরাসী বিপ্লবোত্তর ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণার প্রভাবের ফলে তাঁরা ইসলাম সম্পর্কে এইরকম প্রচার আরম্ভ করেন। সৈয়দ আমীর আলি তাঁর *মহাম্মদ জীবনীতে* এবং *স্পিরিট অফ ইসলাম* পুস্তকে প্রথম ইসলামকে মহান ধর্ম হিসাবে অভিক্ষেপিত করেন। তিনি লেখেন, ''ইসলাম জাত বা বর্ণের পার্থক্য স্বীকার করেনা; সাদা বা কালো, নাগরিক বা সৈনিক, শাসক বা প্রজা, তারা সবাই সমান, শুধু তত্ত্বেই নয়, বাস্তবেও। মাঠে বা বৈঠকখানায়, তাঁবুতে বা প্রাসাদে, মসজিদে বা বাজারে, তারা স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করে। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন, একনিষ্ঠ অনুগামী এবং একান্ত শিষ্য ছিলেন একজন নিগ্রো ক্রীতদাস....মুহাম্মদের সমগ্র শিক্ষা ইসলামে জাতবিভাগ অসম্ভব করে তুলেছে। এবং ইসলামী আইনের কোনও শব্দকে ক্রীতদাসত্ব রূপে বর্ণনা করা শব্দের অপব্যবহার ছাড়া কিছুই নয়।''

তিনি মুহাম্মদ জীবনীতে লিখেছিলেন, ''দাসপ্রথাকে মুহাম্মদ স্বল্পস্থায়ী বলেই মনে করেছিলেন, এবং মনে করতেন যে পরিস্থিতি ও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর বিনাশ ঘটবে''।

মসজিদের মিনার থেকে যে আজান দেয় তাকে বলে মুয়াজ্জিন। মুয়াজ্জিনের গলার জোর থাকা বাঞ্ছনীয়। আজান হচ্ছে নমাজ পড়ার ডাক। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন বিলাল ছিলেন এক হাবসী বাঁদীর পুত্র। এতে কিছু প্রমাণ হয়না। হিন্দুদের পূজায় প্রতিমা গড়ে কুম্ভকার, ঢাক বাজায় বাদ্যকর। তার অর্থ এই নয় যে, হিন্দু সমাজে কুম্ভকার বা বাদ্যকরকে কিছু উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। আর ক্রীতদাস এবং মুক্ত মুসলমান যে এক নয়, এটা বলার প্রয়োজন করেনা। প্রতিটি যুদ্ধবন্দীই ইসলাম অনুসারে ক্রীতদাস হয়ে যায়। এবং বাঁদীদের খুশীমত সম্ভোগ করা ইসলাম বিহিত। এ সম্পর্কে সহী মুসলিমের ৩৪৩২নং হাদিশে আগেই বর্ণিত হয়েছে।

তসলিমা নাসরিনের 'আমার মেয়েবেলা' তে আমাদের কোরান-হাদিশ ভিত্তিক বক্তব্যের সমর্থন সহজেই পাওয়া যাবে। সুতরাং মার্ক্স-মুসলিম অক্ষ পশ্চিমবঙ্গের মধ্য শিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমে শুধু যে ইসলামের তথ্য গোপন করছে তাই নয়, ইসলামের সম্প্রসারণের জন্য ইসলাম সম্পর্কে কিছু মনগড়া গল্প পরিবেশন করেছে কোমলমতি ছাত্রদের কাছে।

তিন

শ্রীমতী রায় গুজরাটের সি.বি.এস.ই পরীক্ষার কথাও তুলেছেন। উনি লিখেছেন, ছাত্র ছাত্রীদের ভয় দেখানো হচ্ছে স্কুলে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার ব্যাপারে।

গুজরাটের সি.বি.এস.ই পরীক্ষা নিয়ে যে অপপ্রচার চালানো হয়েছে, সে সম্পর্কে লিখেছেন নিত্যপ্রিয় ঘোষ। আমরা তাঁর কথাই উচ্চারণ করছি: গুজরাটের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে যে প্রহসন হয়ে গেল, সেটাও কোনও নিরীহ প্রহসন নয়। দাঙ্গার ফলে কোনও কোনও শিক্ষাকেন্দ্রে যথাসময়ে পরীক্ষা নেওয়া যায়নি, যেমন গুজরাটের আহমেদাবাদ ও বরোদা শহরে। এইসব কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়ার কথা ১৮ ই এপ্রিল। সব মিলিয়ে ১.৬ লক্ষ

পরীক্ষার্থী। মুসলিম অধ্যুসিত এলাকা থেকে কয়েকটি পরীক্ষাকেন্দ্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় আইন শৃঙ্খলার কথা ভেবে। পরীক্ষা কেন্দ্র স্থানান্তরের বিরুদ্ধে সভা করে অ্যাফেক্টেড সিটিজেন্স অফ আহমেদাবাদের নেতারা পরীক্ষা বয়কটের ডাক দিলেন। বোর্ড জানাল পুলিশ সুরক্ষার আশ্বাস দিয়েছে, চিন্তার কোনও কারণ নেই, ছাত্রছাত্রীদের জন্য যানবাহন ও পুলিশের সুব্যবস্থা থাকবে। পরের দিন বোর্ড জানাল প্রথম দিন ৯২.২৫ শতাংশ পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু বহু কাগজে লেখা হলো ৯০ শতাংশ মুসলমান ছাত্ররা পরীক্ষা বয়কট করেছে। ছবি ছাপা হলো আহমেদাবাদে এক সম্পূর্ণ ফাঁকা হলে বিষণ্ণ শিক্ষয়িত্রী বসে আছেন, পরীক্ষার্থীরা আসেনি। আর একটি ছবিতে দেখা গেল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে তিনটি ছাত্র বসে আছে পরীক্ষার ঘরে। ওই ১৯ তারিখেই বিভিন্ন এজেন্সী মারফৎ পাওয়া খবর জড়ো করে ওই খবরের কাগজগুলিই ভিন্ন খবর দিচ্ছে। ছবিগুলিও এজেন্সী মারফৎ পাওয়া, ছবির ক্যাপশন এজেন্সী দিয়েছে না খবরের কাগজগুলি বানিয়েছে তা বোঝার উপায় নেই। হিন্দু আর মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের কি আপার্টহেট প্রথায় আলাদা আলাদা ঘরে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে? স্কুল অনুযায়ী কেন্দ্র পড়ে, একই স্কুলের হিন্দু ছাত্ররা এক জায়গায় বসবে, মুসলমানরা অন্য জায়গায় এটা সম্ভব? অথবা একটা স্কুলে সবাই মুসলমান, এটাও কি সম্ভব? তাহলে ওই ফাঁকা পরীক্ষা কেন্দ্রের তাৎপর্য কী? খবরেও লেখা হয়েছে এই অ্যাফেক্টেড সিটিজেন্স অফ আহমেদাবাদের মুখপাত্র বলেছেন, আহমেদাবাদের ৮০০০ মুসলমান ছাত্রের ৩৬০০ অনুপস্থিত। অর্থাৎ অনুপস্থিতের সংখ্যা ৪৫ শতাংশ। কিন্তু সংবাদটির শিরোনাম—৯০ শতাংশ মুসলমান ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা বয়কট। ওই খবরে আরও বলা লেখা হল, বরোদায় বয়কটের তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি। কোনও কোনও এজেন্সীর খবর, দুই তৃতীয়াংশ মুসলমান বয়কট করেছে পরীক্ষা। যথারীতি পরের দিন সম্পাদকীয় লেখা হলো পরীক্ষা বয়কট নিয়ে। পরে অবশ্য এইসব খবর বেমালুম চেপে বলা হচ্ছে, পরীক্ষায় কোনও ব্যাঘাত হয়নি।

সরস্বতী বিদ্যালয় বনাম মাদ্রাসা শিক্ষা

পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে অরুন্ধতী রায়দের অপপ্রচারের জবাব দেওয়া গেল। এবার আসা যাক সরস্বতী বিদ্যালয় বনাম মাদ্রাসা শিক্ষা সংক্রান্ত বিতর্কে। কারণ, অরুন্ধতী রায় লিখেছেন, দেশজুড়ে শয়ে শয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখা আর সরস্বতী শিশু মন্দিরে হাজার হাজার হাজার বালক ও কিশোরের মগজ ধোলাই হচ্ছে। ঠেসে দেওয়া হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আর ভুল ইতিহাস।

বাচ্ছাদের মগজ যে ধর্মেতরবাদীরা আগেই ধোলাই করে রেখেছে, সে সংবাদ আগেই দিয়েছি। এখন দেখা যাক সরস্বতী বিদ্যামন্দিরে শিশুদের কী শেখানো হচ্ছে আর মাদ্রাসায় কী শেখানো হচ্ছে। সরস্বতী শিক্ষা মন্দিরে যা শেখানো হয় তার একটা বিবরণ দিয়েছেন অঞ্জলী মোদী *দি হিন্দু* পত্রিকায়। সেটির অংশবিশেষ পুনর্মুদ্রিতকরেছেন সৈয়দ সাহাবুদ্দিন তাঁর *মুসলিম ইন্ডিয়া* পত্রিকায়। এটা প্রত্যাশিত ও সহজবোধ্য যে সবচেয়ে খারাপ ব্যাপারটাই অঞ্জলী মোদী দেখিয়েছেন তাঁর রচনায়। আমরা সাহাবুদ্দিনের পত্রিকা থেকে সমস্তটাই উৎকলিত করছি,

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন্তব্য ও প্রশ্ন জুড়ে দিচ্ছি বন্ধনীর মধ্যে:

বিদ্যাভারতী উদ্ভাবিত কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী ছাত্র ও শিক্ষকদের সংস্কৃতি জ্ঞান অনুশীলন করা হয়। গত বছর সংস্কৃতি জ্ঞান পরীক্ষা পুস্তকের ইতিহাস অংশে বলা হয়েছে, "উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ জেলায় যেখানে আজকের অযোধ্যা অবস্থিত, সেখানে সরযু নদীর তীরে সূর্যবংশীয় রাজাদের রাজধানী প্রাচীন অযোধ্যা অবস্থিত ছিল। মনু এবং মহারাণী শতরূপা অযোধ্যায় দশরথ ও কৌশল্যারূপে পুনর্জন্ম নিয়েছিলেন এবং তাঁদের গৃহে সাক্ষাৎ নারায়ণ অবতাররূপে (শ্রীরাম) জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোতিষবিদ ও পুরাণ অনুযায়ী রাম ৮,৮৬০০০ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।"

(ভারতীয় পুরাণ অবম্বন করে যা লেখা হয়েছে তা মার্ক্সীয় ঐতিহাসিকদের মনঃপুত না হতে পারে, কিন্তু তা নিয়ে মার্ক্স-মুসলিম অক্ষের মাথা ব্যথা করার কী হলো? এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ বা সাম্প্রদায়িকতা কিছু নেই।)

'ইতিহাসে'র এই শিক্ষা 'জাতীয় শিক্ষার' অংশ যা বিদ্যাভারতীর ১৯৭৪১টি বিদ্যালয় মারফৎ ২৪,০০০০০ ছাত্রকে দেওয়া হয়। দীননাথ বাত্রা, বিদ্যাভারতীর প্রধান বলেন এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সঙ্ঘের চিন্তাধারা সঞ্চারিত করা হয়। এর লক্ষ্য 'হিন্দুত্বের মানসিকতা সম্পন্ন নিঃস্বার্থপর নাগরিক' তৈরীর শিক্ষা দেওয়া।

(যেহেতু হিন্দুত্ব কোনও অপরাধ নয়, সেহেতু হিন্দুত্বের মানসিকতা সম্পন্ন নিঃস্বার্থপর নাগরিক তৈরীতে ইসলাম-ধর্মেতরবাদী অক্ষের সমালোচনা করার কোনও অধিকার নেই)

প্রথম বিদ্যাভারতী স্কুল স্থাপিত হয়েছিল ১৯৫২ অব্দে। তারপর থেকে এর বৃদ্ধি ঘাত দ্বারা সূচিত হয়। ১৯৯৮ থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩০০০ থেকে ১৯৭৪১ এ পৌঁছেছে। এইগুলি বিনা বেতনের স্কুল, ব্যক্তিগত দানের দ্বারা চলে। বাত্রা বলেন, বিদ্যাভারতী বিদ্যালয় চালানোর জন্য সরকারের কাছে আর্থিক অনুদানের জন্য কোনও আবেদনও করেনি, পায়ও নি। দেশজুড়ে বিদ্যাভারতীর বিদ্যালয়ে 'সংস্কারের' কথা বলা হয়। এই 'সংস্কার' মোটামুটি বলতে গেলে সংস্কৃতে প্রার্থনা, সরস্বতী বন্দনা, শিক্ষকদের 'আচার্য' বলা, শিক্ষকদের পাদস্পর্শ করে প্রণাম, পিতামাতাদের পাদস্পর্শ করে প্রণাম।

(এই সংস্কারগুলি খারাপ নাকি ? কোন নিরিখে? পিতামাতার পাদস্পর্শ করে প্রণাম করা ভারতীয় দন্ডবিধির কত ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য ?)

কিছু কিছু বিদ্যালয় তুলসীগুল্ম রোপণের অভিযান চালায়, পরিবেশ সচেতনতার অংশ হিসাবে।

(তুলসীগাছ পোঁতার ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক নাকি? নাকি এটা অবৈজ্ঞানিক? এতে ইসলাম-ধর্মেতরবাদী অক্ষের আপত্তিটা কীসের ?)

বাত্রা বিশ্বাস করেন যে এইসব বিদ্যালয়ের 'পরিবেশ' অন্য কিছু থেকে এই বিদ্যালয়ের 'পার্থক্য' সূচিত করে।

বিদ্যাভারতী বিদ্যালয়ের দেওয়ালগুলি কথা বলে, যদি কেউ শুনতে চায়। সেখানে নানা 'মহাপুরুষদের' ছবি টাঙ্গানো আছে। আর.এস.এস গুরু গোলওয়ালকর এবং হেড্‌গাওয়ার,

দয়ানন্দ সরস্বতী, বিবেকানন্দ, শিবাজী, রাণা প্রতাপ, সুভাষ চন্দ্র বসু, চন্দ্রশেখর আজাদ, কোনও কোনও সময় সর্দার প্যাটেল, কিন্তু মহাত্মা গাঁধী নয়।

(মুসলিম মৌলবাদী আবুল কালাম আজাদের ছবি যদি ঘরে টাঙ্গানো যায়--যে আজাদ হিন্দুদের সঙ্গে একযোগে আন্দোলন করার জন্য কোরান-হাদিশের শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, যেহেতু মুহাম্মদ একদা ইহুদীদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করে মদিনায় বাস করেছিলেন, অতএব হিন্দুদের সঙ্গে আন্দোলন করাও বৈধ, তবে গোলওয়ালকর-হেডগাওয়ারের ছবি অবশ্যই টাঙ্গানো যাবে। কারণ, মুহাম্মদ যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয়ের পর ইহুদীদের বিতাড়ন করেছিলেন মদিনা থেকে। আজাদের অনুগামীদের চিরকাল সেটাই ধান্ধা।

আর অঞ্জলী মোদীরা যদি প্রচার করেন যে শঙ্করাচার্য বা বিবেকানন্দ মহাপুরুষ নয়, তবে তাদের বিনা দ্বিধায় নরাধম আখ্যা দিতে হবে। গাঁধীজীর ছবি না টাঙ্গানো এমন কিছু গর্হিত অপরাধ নয়। পশ্চিমবঙ্গের খুব কম লোকের বাড়ীতে গাঁধীর ছবি দেখা যায়। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তিনি যে আচরণ করেছিলেন, তাতে সাধারণ বাঙালী তাঁকে খুব প্রশংসা করে না। আমরা, যারা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে গাঁধীকে দেখতে চাই, গাঁধীর খুব প্রশংসা করতে পারছি না। পরে আমরা খেলাফৎ আন্দোলনের সময় গাঁধীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবো। তাতে দেখাবো কীভাবে হিন্দুদের বুকে ছুরি মেরে তিনি খেলাফৎ আন্দোলন তথা সোনার পাথরবাটি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের খেলায় মেতেছিলেন। খেলাফৎ আন্দোলন ছাড়াও অন্য পরিপ্রেক্ষিতে গাঁধীজীর সম্বন্ধে আরও কিছু ঐতিহাসিক তথ্য জানাবো।)

এইসব মহাপুরুষদের সজ্জায় সজ্জিত বিদ্যাভারতী পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি অদ্ভুতভাবে আবার সি.বি.এস.সি বা স্থানীয় পর্যদের দ্বারা অনুমোদিত--যারা জাতির ইতিহাসে গাঁধীর প্রখ্যাতি স্বীকার করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিদ্যাভারতীর বিদ্যালয়গুলি যারা পরিচালনা করেন তারা কিভাবে তাদের সত্যগুলির সঙ্গে পর্যদগুলির সিলেবাস ও পাঠ্যপুস্তকের তথ্য ও পরিসংখ্যানের সঙ্গে সামঞ্জস্য করেন?

(অঞ্জলী মোদী যাকে বলছেন 'তথ্য' তা যে তথ্য নয় তা আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশুপাঠ্য নিবন্ধ 'বাঁশের কেল্লা' বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি। আমরা দেখিয়েছি এন.সি.ই.আর.টি কীভাবে ইতিহাস বিকৃত করতে নির্দেশ দিয়েছে। বস্তুতঃ যা আজকাল ভারতজুড়ে ইতিহাস বলে চালানো হচ্ছে তা দুভাবে বিকৃত করা হয়েছে। *দি স্টেটসম্যান* পত্রিকায় এক সুধী দেখিয়েছেন, জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম অংশগ্রহণের তাগিদে 'সাম্প্রদায়িক ত্রিকোণ' তত্ত্ব প্রচার করে বলেন, ব্রিটীশ আগমনের আগে হিন্দু-মুসলিম গলাগলি করে থাকতো। ইতিহাস পুস্তকগুলিতে এই তত্ত্বের সপক্ষে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গভর্ণর জেনারেল মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোনের ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে'র একটি পত্রের কথা উল্লেখ করেন। ঐ পত্রে এলফিনস্টোন লিখেছিলেন, বিভক্ত করো ও দেশ শাসন করো হচ্ছে রোমীয় নীতি: এখন আমাদের এই নীতি অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু ঐ পত্র লেখার আগেই সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ *আসবাব-ই-বাগাওয়াত-ই-হিন্দ* পুস্তকে লেখেন হিন্দু-মুসলমান দুটি পৃথক *বিবদমান* জাতি। তিনি সেই তত্ত্ব অনুযায়ী ভারতীয় সেনাকে হিন্দু-

মুসলমানে বিভক্ত করতেও পরামর্শ দেন ব্রিটীশকে।

বস্তুতঃ ভারতের ইতিহাসে কোথাও লেখা নেই যে ব্রিটীশ আগমনের আগে হিন্দু-মুসলিম সখ্যতা ছিল। বরং বিপরীত ঘটনার কথাই পাওয়া যায়। পরে আমরা এ নিয়ে আরও কিছু আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় ধরনের ইতিহাস বিকৃত করেছে মার্ক্স-আলিগড় অক্ষ। মুসলমানদের বীভৎস জেহাদকে শ্রেণী সংগ্রাম বলে অভিক্ষেপ করা এই অপলাপবাদীদের উদ্দেশ্য। নারীধর্ষণ, ধর্মান্তরকরণ, মন্দির অপবিত্রকরণ, বলপূর্বক গোমাংস ভক্ষণ করানো যাদের আন্দোলনের প্রক্রিয়া, তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে অভিক্ষেপ করার অপচেষ্টাকে এখন ইতিহাস বলে সম্মানিত করা হচ্ছে।

এমনকি অমলেশ ত্রিপাঠীর মত কংগ্রেসী ঐতিহাসিকও রায়বেরিলীর সৈয়দ আহমদের তরিকা-ই-মুহাম্মদীয়া (ওয়াহাবী) আন্দোলনকে শ্রেণী সংগ্রাম বানিয়েছেন। শুধু ওয়াহাবী জেহাদই নয়, মোপলা জেহাদকেও শ্রেণী সংগ্রাম বানানো হয়েছে মার্ক্স-আলিগড় অক্ষ দ্বারা। ইতিহাস বিকৃতির প্রত্যেকটি কর্মের জন্য গোপন করা হয়েছে ইসলামের তথ্য।)

গোলওয়ালকরের প্রমাণ আকারের ছবির তলায় বসে, নয়া দিল্লীর এক সরস্বতী বাল মন্দিরের অধ্যক্ষ জানালেন, যখন আপনি একজন শিশুকে ভাল মন্দ বিচার করতে বলছেন, তখন আপনি বলছেন শিবাজী ভাল, তখন একই সঙ্গে কীকরে বলবেন, ঔরঙ্গজেবও ভাল এবং দুটি ভাল লোকের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধেছিল?

(সমস্যা শুধু সরস্বতী বাল মন্দিরের শিক্ষকের নয়, যাঁরা ইতিহাস বোঝেন এবং ইতিহাসে রাজনীতি করতে উৎসুক নন, তাঁরা প্রত্যেকেই বলেন একটা তৈরী করা ইতিহাস তাদের পড়াতে হয়। এই ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের বিবেকের সায় নেই।)

তিনি যোগ করলেন, কংক্রীটের উপর জল ঢাললে গড়িয়ে চলে যায়। কিন্তু আপনি যদি একই জায়গায় অনবরত জল ঢেলে যান, তবে একসময় গর্ত হবেই। আমরা সেইভাবেই কাজ করি। স্পষ্টতই তিনি আশা করেন, চতুর্থ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত নিজেদের তৈরী এই ইতিহাসের জল ঢালার ফল এক সময় কাজ হবে। বিশেষতঃ বিদ্যাভারতীর ৭০,০০০ শিক্ষকের এক-তৃতীয়াংশ যখন এই ধরনের পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার জন্য তিন ধাপের পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হয়েছে।

(এতে মার্ক্স-মুসলিম অক্ষের আপত্তি করার সঙ্গত কারণ নেই। তারা তো সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেদের তৈরী কৃত্রিম ইতিহাস সারা দেশের শিশুদের গেলাচ্ছেন। শিক্ষার রাতাকরণ চলবে, গৈরিকীকরণ নয়। কেন?)

এক ইতিহাস শিক্ষকের পদ্ধতি আরও সুন্দর। তিনি বললেন, পাঠ্যপুস্তকে যা আছে আমরা তা বলি। উদাহরণস্বরূপ পাঠ্যপুস্তকে বলা হয়েছে, 'শেষে কংগ্রেস দেশবিভাগ মেনে নিল।' আমি ছাত্রদের বলি বাড়ী গিয়ে ঠাকুরদাদার সঙ্গে আলোচনা কর, যিনি দেশবিভাগ দেখেছেন। তাঁর কাছ থেকে শোনো দেশবিভাগ অত্যাবশ্যক ছিল কিনা। তারপর আমি ক্লাসে আলোচনা করি। তারা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারে যদিও কংগ্রেস দেশবিভাগ মেনে নিয়েছিল, এটা অত্যাবশ্যক ছিলনা।

(এতে অঞ্জলী মোদীরা আপত্তির কী দেখলেন? 'ঠাকুরদাদারাও' ইতিহাসের চরিত্র। তারা দেশবিভাগকে কীভাবে দেখেছেন, সেটাও ইতিহাসের বিচার করার কথা। এটাই ঐতিহাসিক পদ্ধতি। কংগ্রেসের নেতারা যে বয়স হয়ে যাচ্ছে, ক্ষমতা ভোগ করা যাচ্ছে না, এই বিচারে তাড়াতাড়ি দেশবিভাগ মেনে নিয়েছিলেন, এটা তো লেনার্ড মোসলেকে বলেছিলেন নেহরু। দেশবিভাগের প্রথম ছক তো রাজাজী তৈরী করেছিলেন গাঁধীর সম্মতি নিয়ে।)

ইংরেজী শিক্ষক বলেছেন, প্রতি অনুশীলনেই আপনি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব আলোচনা করতে পারেন।....গীতা থেকে। আমি উদাহরণ দিয়ে দেখাতে পারি : আমি ছাত্রদের বলি এমনকি এই বিদেশী লেখকের রচনাতেও গীতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

(পশ্চিমের কর্মতৎপর জীবনের সঙ্গে গীতার কর্মযোগের সাযুজ্য প্রদর্শন করে ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করা কী সাম্প্রদায়িকতা না গর্হিত অপরাধ?)

হিন্দী শিক্ষক বলেন, মন থেকে মিথ্যাগুলি দূর করা খুব শক্ত, তাদের শেখানো হয় যে কুতুব মিনার কোনও মুসলিম তৈরী করেনি। মিনারের গা থেকে মুসলিমরা দেবদেবীর মূর্ত্তি তুলে ফেলে সেগুলিকে আরবী লেখা দিয়ে ভরে দিয়েছে। মিনারের উপর থেকে পৃথ্বিরাজ চৌহানের ভগ্নি যমুনা নদীকে দেখতেন।

আবেগভরে শিক্ষক বললেন, একটা মিথ্যাকে দশবার বললে সেটা সত্য হয়ে দাঁড়ায়। এটা এখনও ঘটছে।

(একটা মিথ্যাকে দশবার বললে সেটা যে সত্য হয়ে দাঁড়ায় সেটা তো আমার গোধরা কান্ডেও দেখছি। মোদীর মুখ দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রে কথা। মোদী ও কথা না বললেও মোদী বলেছে বলে সবাইকে বিশ্বাস করানো হয়েছে। ফলতঃ যারা বাপের জন্মে নিউটনের নাম জানেনি, তারাও নিউটনকে চিনে গেছে। আমরা শিখেছি শের শাহ তার পাঁচ বছরের রাজত্বের মধ্যে ঢাকার সোনার গাঁ থেকে পাঞ্জাবের সিন্ধুনদ অবধি গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করেন। এছাড়া তিনি নির্মাণ করেন, আগ্রা থেকে দক্ষিণে বুরহানপুর, আাগ্রা থেকে চিতোর হয়ে যোধপুর পর্যন্ত এবং লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত রাজপথ। শের শাহের ঐ রাজত্বকাল যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেই কাটে। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ই মে হুমায়ুনকে পরাজিত করে তিনি দিল্লী অধিকার করেন। ঐ বছর পাঞ্জাবের গক্কর জাতির বিদ্রোহ দমন করতে তাঁকে ঝিলম নদীর তীরে যেতে হয়। সেখান থেকে ফিরে ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে তাঁকে বাঙলায় আসতে হয় বিদ্রোহ দমন করতে। পরের বছর ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজপুত রাজাদের বিরুদ্ধে অভিযান করে মালব অধিকার করেন। ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মধ্য ভারতের রাইসিন দুর্গ অধিকার করেন এবং সেই বছরেই তিনি অভিযান চালান মারওয়াড়ের রাজার বিরুদ্ধে। পরের বছর ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাঠোর রাজ মালদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কালিঞ্জর দুর্গে এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। দেখা যাচ্ছে শের শাহ রাজত্ব করেছিলেন মোট ৫ বছর তার মধ্যে পুরো একবছর কাটে কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধে। বাকী চার বছর নানা যুদ্ধে। এতো অল্প সময়ের মধ্যে এবং এতো ব্যস্ততার মধ্যে কারও পক্ষে কি ৬০০০ কিমি লম্বা একটি রাজপথ নির্মাণ করা সম্ভব? আজকের এই কারিগরি উন্নতির দিনেও কি ভারত সরকার

এতো লম্বা একটি রাজপথ ৪ বছরের মধ্যে নির্মাণ করতে পারবে?

কোনও ঐতিহাসিকই শের শাহের রাস্তা তৈরীর গল্পের কোনও সূত্র নির্দেশ করেন না। এইসব আষাঢ়ে গল্প পড়লে মনে হবে ছোটবেলা থেকে শুধু রাস্তা তৈরীই শেরশাহের ধ্যানজ্ঞান ছিল। তাই দিল্লীশ্বর হবার সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে তিনি রাস্তা তৈরী করতে আরম্ভ করেন এবং রাজত্বের ৫ বছর শুধু রাস্তাই তৈরী করেছিলেন।

এবার কুতব মিনারের কথায় আসা যাক। কুতুবমিনার যে স্থানে আছে সে জায়গাটার নাম মেহরৌলি। কুতুব মিনারের চারপাশে ইতস্ততঃ ছড়ানো ভাঙ্গা দালান কোঠা, আর এইসব ভাঙ্গাচোরা দালান কোঠার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে কুতুব মিনার। কুতুব মিনারের চারিদিকে ঐসব ভাঙ্গা দালান কোঠা ছিল সাতাশটি নক্ষত্রের মন্দির, ঐ স্থান থেকে আধ মাইল দূরে ছিল আঠাশ নক্ষত্রের মন্দির। ঐ মন্দিরগুলি ভেঙ্গে সেই সব মাল-মসলা দিয়ে কুত-উল-ইসলাম মসজিদ নির্মিত হয়। মসজিদের গায়ে শিলালিপিতে এইসব কথা লেখা আছে। লেখা আছে কুতুবুদ্দিনের জীবনীকার হাসান নিজামীর 'তাজ-উল-মাসির' পুস্তকে। কিন্তু এই পুস্তকে কুতুব মিনারের কোনও কথা নেই। আর একটি গ্রন্থেও কুতুবউদ্দিনের ইতিহাস পাওয়া যায়—সেটি মিনহাজউদ্দিন সিরাজের বিখ্যাত *তবকাৎ-ই-নাসিরী*। এই গ্রন্থেও কুতুবউদ্দিনের মিনার তৈরীর কথা নেই। সুলতান কুতুব মিনার নির্মাণের মত এতবড় একটা কাজ শুরু করলেন, কিন্তু কেউ তা লিপিবদ্ধ করলেন না, তা কি করে হয়? রিজভীর মতে কুতুবউদ্দিন মিনারের প্রথম তলটি নির্মাণ করেন। তিনি লিখেছেন, হিন্দু কারিগররা ইসলামী চিন্তামত মিনারটি নির্মাণ করে। কারিগররা নাগরী অক্ষরে নির্মাণকালও লিপিবদ্ধ করে—১২৫৬ সম্বৎ। ভিতের তিন মিটার উপরে ঘন্টা, ফুলের মালা ও পদ্মফুল আঁকা থাকার কথাও তিনি লিখেছেন। কিন্তু মিনারে গায়ে যে সনটি আছে তা ১২০৪ বিক্রম সম্বৎ-- ১১৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৫৬ সম্বৎ নয়। কিছু কিছু ইতিহাস পুস্তকে লেখা হয়েছে ঐ শিলালিপি কাঁচামাল হিসাবে অন্য স্থান থেকে এসেছে। রিজভী বলছেন যে ঐ শিলালিপি খোদাই করা হয়েছে কারিগরদের দ্বারা। কারিগরদের নামও লেখা আছে শিলালিপিতে। শিলালিপিটি যেভাবে যত্ন সহকারে মিনারের গায়ে খোদাই করা হয়েছে তাতে মনে হয়না তা কাঁচামাল হিসাবেই এসেছে। মনে রাখতে হবে ১১৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কুতুবউদ্দিন ভারতে আসেন নি।

আরও কিছু তথ্যে আসা যাক। কুতুল ইসলাম মসজিদের নিকটে আছে দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ। চতুর্থ শতাব্দীতে নির্মিত ঐ স্তম্ভে ব্রাহ্মী লিপিতে এক ধ্বজের কথা আছে। ঐ ধ্বজের নাম প্রপাংশু বিষ্ণুধ্বজ। মিনার ও ধ্বজ একই কথা। কুতুব-উল-ইসলাম মসজিদের গায়ে এক ব্রাহ্মী শিলালিপিতে লেখা আছে, 'সূর্যমেরু পৃথ্বীঃ যন্ত্রৈঃ মিহিরাবলী যন্ত্রেণ'।

এর থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে:

(১) প্রাচীনকালে নিকটে একটি মিনার বা ধ্বজ ছিল।

(২) সেই ধ্বজ ও মন্দিরের সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল।

ঐ সব কর্মকান্ডের সঙ্গে বরাহমিহির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন।

(৩) সংস্কৃত মিহিরাবলী থেকেই মেহেরৌলি শব্দ এসেছে।

কুতুবমিনারকে মুসলিম সৌধ বলে প্রচার চালান প্রত্নতত্ত্ববিদ জন মার্শাল। মার্শাল লেখেন, মূল পরিকল্পনা থেকে শুরু করে এই মিনারের গঠন ও অলঙ্করণ সর্বাংশে ইসলামী। মসজিদে আজান দেবার জন্য হোক, আর গজনীর মিনারের মত স্বতন্ত্র এক মিনার হোক, একমাত্র মুসলমানরাই এই ধরনের মিনারের সঙ্গে পরিচিত ছিল। হিন্দুদের কাছে এই ধরনের মিনার ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত।

কিন্তু, সরসীকুমার সরস্বতী লিখেছেন, কেমন করে ভারতীয় বা হিন্দু স্থাপত্যের বিভিন্ন কল্পনা পশ্চিম এশিয়াতে যায় এবং বিশেষ করে পারস্যের কলাকুশলীদের দ্বারা ক্রমে তা বিশেষ রূপ পায়, তা আর্থার উপহ্যাম পোপ খুব সাফল্যের সঙ্গেই প্রমাণ করে গিয়েছেন। বাস্তবিকপক্ষে কৌণিক খিলান, অষ্টকোণযুক্ত সৌধ এবং গম্বুজ ভারতের হিন্দু স্থপতিরাই আবিষ্কার করেন, কিন্তু আজ তা ইরাণী স্থাপত্যরূপে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে শিল্পের আদান প্রদানের দ্বারা ইসলামের অভ্যুদয়ের বহু পূর্বেই ঐসব স্থাপত্যকলা ভারত থেকে পশ্চিমে চলে যায়, যার উপর কোনও প্রভাব ফেলা ইসলামের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব।

জন মার্শাল ও অন্যান্য ইতিহাসকাররা বলেন নমাজের আগে আজান দেওয়ার জন্য মিনারের সৃষ্টি। কিন্তু কুল-উল-ইসলাম মসজিদের তুলনায় মিনারের আকার বড়। অর্থাৎ, ঘোড়ার থেকে চাবুকের দাম বেশী। মসজিদ থেকে মিনারের দূরত্বও যথেষ্ট। আজান দেওয়ার চেয়ে চাঁদ দেখার জন্যই মিনারের প্রয়োজন বেশী। কারণ, চন্দ্র দর্শন ইসলামী আচার পালনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

ধ্বজ বা মিনার হিন্দুদের কাছে নেহাৎ অপরিচিত ছিলনা। দিল্লীর লৌহস্তম্ভ তার প্রমাণ। লৌহস্তম্ভ মুসলমানরা ভাঙ্গেনি। তাই আজও বর্তমান। কুতুব মিনারের গায়ে কুতুবুদ্দিনের নাম না থাকলেও তাঁর ভ্রাতা গিয়াসুদ্দিন ঘোরীর শিলালিপি আছে। ঐ একই ব্যক্তির শিলালিপি আছে গজনীর মিনারেও। গিয়াসুদ্দিন গজনীর মিনার মেরামত করেন। অর্থাৎ, গজনার মিনার আগে থাকতেই ছিল সেখানে। মনে রাখতে হবে গজনীর অবস্থান সেকালের গান্ধার দেশে।

এবার কুতুব মিনার সংক্রান্ত ভারতীয় বক্তব্য শোনা যাক। কুতুব মিনার ছিল মেরুস্তম্ভ বা অবজার্ভেটরী। লৌহস্তম্ভ ও মেরুস্তম্ভ দুটিই চতুর্দশ শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্যের দ্বারা নির্মিত হয়। স্তম্ভ নির্মাণ তত্ত্বাবধান করেছিলেন বরাহমিহির। মেরুস্তম্ভ ছাড়াও ঐ অঞ্চলে ছিল ২৮ নক্ষত্রের মন্দির। ঐ মন্দির ও মিনার ছিল মিহিরাবলী নামক আশ্রমের অর্ন্তগত। আর্বী ভাষায় মেরুস্তম্ভ হচ্ছে 'কুৎব মিনার'। স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ দিল্লীর পুরাকীর্তি সংক্রান্ত তাঁর পুস্তক *আতর-ই-সানাদিদ* এ কুতুব মিনারকে মুসলিম কীর্তি বলে মানতে চাননি। সুতরাং পুরো কুতুব মিনার মুসলিম কীর্তি কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।)

পাঠ্যের ফল ফলেছে। নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্ররা শেখানা বুলি বলে, ওরা বলে হিন্দুরা গোমাংস ভক্ষণ করতো। সেটা ঠিক নয়। ওরা বলে আর্যরা বাইরে থেকে এসেছে। এই ধারণা পরিবর্তিত করতে হবে। ওরা বলে গুরু তেগবাহাদুর লুটেরা ছিলেন, যখন তিনি দেশের জন্য জীবন দিয়েছিলেন।

(বৈদিক যুগে হিন্দুরা গোমাংস ভক্ষণ করতো। পরে পৌরাণিক যুগে গোমাংস নিষিদ্ধ হয়ে যায়, এটাই হিন্দুধর্মের ঘটনা। কিন্তু এ নিয়ে মার্ক্স-ইসলাম অক্ষের এত মাথাব্যথা কেন? ভারতীয় ধর্ম কি একটা তিন-চারশো পাতার ধর্মগ্রন্থের উপর নির্ভশীল যে তাতে যা লেখা আছে কপিবুক স্টাইলে সেটাই মেনে চলতে হবে? ভারতীয় ধর্ম, প্রাকৃতিক, বিবর্তনশীল। কয়েকপাতা ধর্মপুস্তকের নিগড়ে নিবদ্ধ নয়। সুতরাং অতীতে হিন্দুরা গোভক্ষণ করতো কি করতো না তা তরলমতি ছাত্রদের জানানো কি অত্যাবশ্যক? না তাদের নিজস্ব সংস্কার নিয়ে বাঁচতে দেওয়া উচিত? গোমাংস খাওয়াটা তো কোনও সুসংস্কার নয়। খাদ্যাখাদ্য মানুষের রুচির উপর নির্ভরশীল। ইংরেজরা ঘোড়ার মাংস খায়না। তারা কেন ঘোড়ার মাংস খায়না, বা, ঘোড়ার মাংস না খাওয়া কুসংস্কার, এসব গবেষণা নিতান্তই বন্ধ্যা। তেমনই বন্ধ্যা গবেষণা অতীতে হিন্দুরা গোমাংস খেত, না খেত না। এই নিয়ে যদি কেউ ছাত্রদের মিথ্যা তথ্যও দেয়, তাহলে তা সামাজিক অপরাধের পর্যায়ে যায়না। কিন্তু, সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুদের গোমাংস খাইয়ে ইসলামীকরণ সামাজিক অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং সন্দেহ করা হচ্ছে, তিতুমীরের মত জেহাদীদের দ্বারা বলপূর্বক গোমাংস খাইয়ে ইসলামীকরণের সাফাই গাইবার অসৎ উদ্দেশ্যেই ইসলাম-ধর্মেতরবাদী অক্ষ গোমাংস ভক্ষণ নিয়ে গবেষণা করতে উদ্যত।

আর আর্যরা বাইরে থেকে এসেছিল, তা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে নাকি? সিন্ধু সভ্যতার মানুষদের সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার মানুষদের সংঘর্ষ হলো, অথচ বৈদিক আর্যরা সিন্ধুর নগর-সভ্যতা গ্রহণ করলো না, এটা কি করে হয়? সিন্ধু সভ্যতার সেই মানুষরাই বা গেল কোথায়? এসব প্রশ্নের কি উত্তর মিলে গেছে?

আর্য আগমন তত্ত্বের ভিত্তি ভাষাবিজ্ঞান। নামেই এটি বিজ্ঞান। কিছু অনুমান ছাড়া ভাষাবিজ্ঞান অন্য কিছুই নয়। বিহেভিয়ার এবং ব্যবহার একই রকম কথা, অতএব একই গোষ্ঠীর ভাষা। বারাসত এসেছে দ্বার অশ্বত্থ থেকে; বা, বারো অসৎ থেকে। এটার নামই ভাষাবিজ্ঞান।

অঞ্জলী মোদীরা কি জানেন, আর্য আক্রমণ তত্ত্বের পৃষ্ঠপোষকরা এখন আর আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই? বাসাম বিরোধিতা করেছেন মর্টিমার হুইলারের। আর্য আক্রমণ তত্ত্বের আধুনিক প্রবক্তা মাইকেল উইটজেল *ফ্রন্টলাইন* পত্রিকায় লিখেছেন, "বড়জোর প্রথম দিককার বৈদিক সংস্কৃতভাষীদের কয়েকজন হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।"

অর্থাৎ, হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার একটা ক্ষীণ সম্পর্ক স্বীকার করছেন তিনি। এরপর এঁরা একদিন যে স্বীকার করবেন না সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার সম্পর্ক, এ নিশ্চয়তা কি অঞ্জলী মোদিরা দিতে পারবেন?

আর, তেগ বাহাদুর সম্পর্কে কানিংহাম লিখেছেন, তেগবাহাদুর মুঘলদের বিরুদ্ধে কাশ্মীরের হিন্দুদের প্রতিরোধের প্ররোচনা দেন এবং খোলাখুলিভাবে সম্রাটকে অগ্রাহ্য করেন। গোলাম হুসেন *সীয়ার-উল-মুতাক্ষরীনে* লিখেছেন, "এই লোকটি বহুমানুষের নেতৃত্বে আসার ফলে উচ্চাকাঙ্খী হয়ে ওঠেন এবং জুটি বাঁধেন হাফিজ আদম নামক এক মুসলমান ফকিরের সঙ্গে।.....এই দুজন নিজেদের বহু অনুসরণকারী সঙ্গে নিয়ে লুটপাঠের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ

করতে থাকেন। ফলে গোটা পাঞ্জাব প্রদেশ ছারখার হয়ে যায়।"

সীয়ার লেখা হয় মুলতঃ সরকারী দলিল-দস্তাবেজের ভিত্তিতে। লক্ষ্ণৌর *নাদায়েৎ-উল-উলেমার* বিদ্বান মহিউদ্দিন আহমদ লিখেছেন, এটা অসম্ভব নয় যে সেই শান্তস্বভাব সুফি-সন্তদের যুগে, যখন সুফি সন্তরা অসম্ভব জনপ্রিয় ছিল এবং তারা সরকারী কাজকর্ম থেকে দূরে থাকাই পছন্দ করতো, তখন সুফিদের উৎপাত বলেই মনে করতো শাসকেরা। ফলে প্রদেশের কর্মচারীরা তেগবাহাদুর সম্বন্ধে সম্ভবতঃ অতিশয়োক্তি করেছে। যাই হোক, যা হবার তা হয়ে গেছে, ব্যাপারটা চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছে মুসলিম ও শিখদের মধ্যে।"

মহিউদ্দিন আহমদ *সীয়ারের* ইতিহাসকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে নিষেধ করছেন। কিন্তু অঞ্জলী মোদিরা *সীয়ারকেই* ব্যবহার করতে উন্মুখ। তাঁর তেগবাহাদুরকে লুটেরা বানিয়ে ছেলেদের নিকট পরিবেশন করবেনই। কারণ, তেগবাহাদুর হচ্ছে হিন্দু। তাদের দুর্বৃত্তরূপে অভিক্ষেপ করা খুব সহজ ও লাভজনক। যদিও কানিংহাম তেগবাহাদুরকে মুঘলবিরোধী বীররূপেই অভিক্ষেপিত করেছেন।)

এক অধ্যক্ষ বলেন তিনি ১৯৫০ এর দশকে আর.এস.এস এর শাখায় শোনেন স্কুল শিক্ষায় অনেক ভুল শেখানো হয়। বিদ্যাভারতী বিদ্যালয়ে যোগদানের আগে তিনি আর.এস.এস' এর প্রচারক ছিলেন। এখন তিনি প্রতিভাবান ছাত্র খোঁজেন, যাতে স্থানীয় শাখা তাদের নিয়ে কাজ করতে পারে।

(ইসলাম-ধর্মেতরবাদী অক্ষের তাতে আপত্তি কী?)

শিক্ষার মাধ্যমে আর.এস.এস'এর চিন্তাধারা প্রচারের আরও নিবিড় প্রতিষ্ঠান হচ্ছে অন্য একটি আর.এস.এস স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান *সেবা ভারতী* পরিচালিত বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের খরচ জোগায় বিদেশে বসবাসরত ভারতীয়রা। ২১ টি প্রদেশ থেকে ২৮৫ জন তপশীলিভুক্ত জাতি ও উপজাতির ছাত্র এই বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ করে।

অধ্যক্ষ আশা করেন বিদ্যালয়টি ভবিষ্যতের প্রশাসকদের তৈরী করবে, যারা জেলার উন্নয়নের জন্য "এখানকার সংস্কার নিয়ে কাজ করবে।"

(তারা এক একটি হর্ষ মান্দার তৈরী হবেনা বলে কি অঞ্জলী মোদীর আপত্তি?)

বিদ্যাভারতীর বিদ্যালয়ের তুলনায় এই বিদ্যালয়ে সঙ্ঘের মতধারায় শিক্ষাদানের ব্যাপারটা অনেক প্রবল। শাখাতে যোগদান, ব্যায়াম ও ধীঋদ্ধ 'আলোচনা' বিদ্যালয়ের কঠিন কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত, যার জন্য বরাদ্দ সময় ভোর সাড়ে চারটা থেকে রাত সাড়ে দশটা। শুধু মাত্র রবিবার ছাত্ররা টিভি দেখার অনুমতি পায়।

(মার্ক্স-মুসলিম অক্ষের আপত্তি করার কি আছে?)

অধ্যক্ষ বলেন, বিদ্যালয়ের মধ্যে খোলা আবহাওয়া আছে। ছাত্ররা যে কোনও বিষয়ে চিন্তা করতে পারে ও বলতে পারে। বিদ্যালয়ে ১০,০০০ পুস্তকের এক পাঠাগার আছে। সেই পাঠাগারের পুস্তকগুলি এমনভাবে নির্বাচিত করা হয় যাতে ছাত্ররা গোলামীর কথা না বলে গৌরবের কথা বলে। বলে তাজমহল একটা মকবারা নয়, হিন্দু মন্দির।

(তাজমহল হিন্দু মন্দির না হলেও একটি রাজপ্রাসাদকে পুনর্নির্মাণ করে সৃষ্টি হয়েছে,

এইটাই ইতিহাস। এই ইতিহাস কোনও সঙ্ঘপরিবারের হিন্দু লেখেনি, লিখেছেন শাহজাহানের সভা ইতিহাসকার আবদুল হামিদ লাহোরী তাঁর 'বাদশাহনামা' গ্রন্থে। এই গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ৪০৩ ও ৪০৪ পৃষ্ঠায় তাজমহল সম্পর্কে লেখা আছে:

"শুক্রবার, ১৫ই জমাদিয়াল আওয়াল, পরপারের যাত্রী পবিত্রা হজরৎ মমতাজ মহল-উল-জামানীর সেই পবিত্র মৃতদেহ, যা অস্থায়ীভাবে কবরস্থ করা হয়েছিল তা যুবরাজ সুজা বাহাদুর, ওয়াজির খাঁ, এবং সতিউন্নিসা খানম, যারা মৃতের মন-মেজাজের ব্যাপারে খুবই ওয়াকিবহাল ছিলেন, এবং রাণীদের রাণীর মনোভাব বুঝতেন, এবং তাঁর কার্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাদের সাহায্য নিয়ে রাজধানী আকবরাবাদে (আগ্রা) আনা হলো, এবং সম্রাট আদেশ দিলেন যে প্রত্যহ গরীব-দুঃখী ও ফকিরদের মধ্যে জাকাত (ভিক্ষা) বিতরণ করা হোক। শহরের দক্ষিণে যেখানে সবুজ ঘাসে ঢাকা বিশাল উদ্যান, যার মাঝখানে সেই বিশাল ইমারৎ, যা পূর্বে রাজা মানসিংহের সম্পত্তি ছিল এবং যার বর্তমান মালিক তাঁর পৌত্র রাজা জয়সিংহ সেখানেই স্বর্গবাসী রাণীকে কবরস্থ করা হবে স্থির করা হয়েছিল। যদিও রাজা জয়সিংহ পূর্বপুরুষদের সেই সম্পত্তিকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করতেন, তথাপি সম্রাট শাহজাহানকে তা বিনা মূল্যে ছেড়ে দিতে রাজী হন। কিন্তু ধর্মীয় নিয়ম ও মৃতার প্রতি মর্য্যাদার কথা চিন্তা করে সতর্ক সম্রাট সেই প্রাসাদ বিনা পয়সায় নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবেনা বিবেচনা করে শরীফাবাদ (নামক স্থান) তাঁকে দিলেন। কাজেই সেই বিশাল প্রাসাদ (আলি মঞ্জিল) এর বদলে জয়সিংহকে সরকারী জমি দেওয়া হলো। ১৫ ই জমাদিয়াল আওয়াল সেই শবদেহ আগ্রায় পৌছবার পর পরের বছর সেই শোভন শবদেহকে চির বিশ্রামে শায়িত করা হলো। আকাশচুম্বী মহিমান্বিত সেই সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত রাজধানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সরকারী আদেশে সেই পূণ্যবতী রমণীর দেহকে সাধারণের দৃষ্টির আড়াল করলো এবং সেই আকাশ-সমান গাম্ভীর্যপূর্ণ, শীর্ষদেশে গম্বুজ শোভিত মহিমান্বিত বিশাল প্রাসাদ পরিণত হলো এক মহিমান্বিত স্মৃতিসৌধে। পরম শক্তিমান বাদশার ইচ্ছানুসারে অভিজ্ঞ ইমারৎবিদরা জ্যামিতির ভিত্তি স্থাপন করলো এবং সেই প্রাসাদ নির্মাণের জন্য ব্যয় হলো ৪০ লক্ষ টাকা।"

কিন্তু খরচ সম্বন্ধে কে কি বলছে দেখা যাক:

রমেশ চন্দ্র মজুমদার—৫০,০০,০০০ টাকা; অতুল চন্দ্র রায়—৫০,০০,০০০ টাকা; মুহাম্মদ দীন (ইলাস্ট্রেটেড উইক্লীতে)—১,৫০, ০০, ০০০ টাকা; গাইড টু তাজ অ্যাট আগ্রা—১,৮৪, ৬৫, ০০০ টাকা; কানোয়ার লাল, দি তাজ—৪,১৮,৪৮, ৮২৬ টাকা; কীন'স হ্যান্ড বুক ফর ভিজিটার্স টু আগ্রা অ্যান্ড ইটস নেবারহুড—৯,১৭, ০০,০০০ টাকা; তাভার্নিয়ে—৩,০০, ০০০ টাকা।

কবে তাজমহল নির্মাণ আরম্ভ হয়েছিল এবং কবে শেষ হয়েছিল সে নিয়ে নানা বক্তব্য আছে: *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার* মতে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়ে শেষ হয়েছে ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে; মুহাম্মদ দীনের মতে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়ে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়েছে; আর.সি অরোরার মতে ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়ে ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়েছে; তাভার্নিয়ের মতে ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়ে ১৬৬৩ অব্দে শেষ হয়েছে; *কলম্বীয়া গেজেটের* মতে

১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়ে ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়েছে।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার গল্প হচ্ছে, ভারত, পারস্য, মধ্য এসিয়া ও আরও আরও দূর দেশের স্থপতিদের নিয়ে একটা পরিষদ গঠিত হয় এবং এই পরিষদই তাজের নক্সা তৈরী করে। চুড়ান্ত নক্সার কৃতিত্ব দেওয়া হয় পারস্য বা তুরস্কের স্থপতি উস্তাদ ঈশা নামক এক ব্যক্তিকে।

এখন আমাদের মনে রাখতে হবে এই ঘটনা ঘটেছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে--যখন স্থলে ঘোড়া এবং জলে দাঁড়টানা নৌকাই ছিল একমাত্র দ্রুতগতির বাহন। গরুর গাড়ীর গতি ছিল সর্বাধিক ৪০ মাইল (৬৫ কিমি)। সেই যুগে আজকের মত গ্লোবাল বিশ্বব্যাপী দরপত্র আহ্বান করে, নক্সা নির্বাচন করে এবং দরদাম ঠিক করে ১ বছরের মধ্যে তাজ তৈরী শুরু হয়ে গেল, এটা কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের লোক বিশ্বাস করবে না।

সুতরাং ছাত্রদের জন্য কোন গল্পটা চলবে? শাহ জাহানের সভা ইতিহাসকার আবদুল হামিদ লাহোরীর *বাদশাহনামার* কথা না *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার* গল্প?

পাঠাগারের ক্ষেত্রে সবাই এক নিয়মে চলেন। কোনও ধর্মেতরবাদী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে *ভয়েস অফ ইন্ডিয়ার* হিন্দুত্ববাদী বই খরিদ করা হয়না--তার মধ্যে যত সত্যই থাকুক না কেন। মার্ক্স -ইসলাম অক্ষও খোলা চিন্তায় বিশ্বাসী নন। নিজেদের মতবিরুদ্ধ কথা শুনলে তাঁরা গালিগালাজ করেন।)

অর্থনীতি শিক্ষায় বলা হয় যে " অর্থনীতির পুস্তকে বলা হয় ভারত একটি গরীব দেশ। ....আমরা তাদের অমন কথা বলিনা। আমরা শিশুদের শেখাই, ভারত খুব ধনী দেশ, এই দেশে সবুজ বিপ্লব হয়েছে। দেশে দুগ্ধের উৎপাদন রেকর্ড পরিমাণ, ভারত থেকে ডেনমার্কে গরু রপ্তানী হয়।"

(এক অর্থে ভারত তো ধনীই। যে দেশে ১০০ কোটিরও বেশী লোকের অন্ন সংস্থান হয় সে দেশকে খাদ্য সম্পদে ধনী তো বলা যায়ই। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ সৃষ্টি হয়েছে মার্ক্স-ইসলাম অক্ষের দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি থেকে ইসলামী অনুপ্রবেশের দ্বারা, ভারতের সম্পদ ক্ষয় করে দিচ্ছে। এ ছাড়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দ্বারা প্ররোচিত সন্ত্রাসের জন্যও ক্ষয় হয়ে চলেছে ভারতের সম্পদের এক বিশাল অংশের। সামগ্রিক অর্থনীতিতে ভারত দরিদ্র হলেও উৎপাদনের নিরিখে নয়।)

সমস্ত ছাত্ররা গোমাংস ভক্ষণ অন্যায় বলে মেনে নিতে না পারে। কারণ, অনেকেই এসেছে গোমাংস ভক্ষক সমাজ থেকে। সেজন্য অধ্যক্ষ বললেন, অরুণাচল প্রদেশের মত স্থানে প্রচারকারী খ্রীষ্টানরা বলে গোমাংস পুষ্টিকর। এই বালকদের অন্য কিছু বোঝাতে হয়। আমরা তাদের বলি গরু আমাদের মাতা। ভগবান তার মধ্যে বাস করে। গরু যে দিকে তাকিয়ে থাকে সেদিকের বাতাস বিশুদ্ধ। গোমুত্র ছাড়া ক্যানসারের চিকিৎসা নেই।

(এগুলি কুসংস্কার হতে পারে, তবে নিশ্চয় সাম্প্রদায়িকতা নয়।)

বিদ্যালয়ের পরিধির বাইরে সঙ্ঘের আরও শিক্ষাকার্যক্রম আছে। বিদ্যাভারতী গরীব

অধ্যুষিত অঞ্চলে এবং বস্তীতে সংস্কার কেন্দ্র স্থাপন করে। তারা কিছু স্পর্শকাতর অঞ্চলেও দৃষ্টিক্ষেপণ করে। উত্তর-পূর্ব ভারত, জম্মু ও কাশ্মীর, বস্তার, বিহার-নেপাল সীমান্ত ইত্যাদি। ঐসব জায়গায় আদিবাসীদের জন্য ৫০ টির মত কেন্দ্র আছে। উদ্দেশ্য সম্বন্ধেঅধ্যক্ষ বললেন, উত্তর-পূর্বে আপনি বিচ্ছিন্নতার বার্তা শুনবেন..ঐসব অঞ্চলে অনেক বাঙলাদেশী অনুপ্রবেশকারী আছে।

(মিথ্যা কথা?)

বিহার-নেপাল সীমান্ত, পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত, ঐসব অঞ্চল বিদেশী অর্থের মাদ্রাসায় পরিপূর্ণ। মুসলমানদের শিক্ষা দিতে হবে তারা এই দেশে জন্মেছে, এই দেশ দ্বারা পালিত হচ্ছে এবং দেশের জন্য তাদের বাঁচতে হবে।

(সাম্প্রদায়িকতা নাকি? এগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় সুনাগরিকের কর্তব্য। প্রতিটি নাগরিককে রাষ্ট্রের অনুগত হতে হয়। ভারতে বাস করে ভারত-পাক ক্রিকেট খেলার সময় পাকিস্তানের সমর্থক হওয়া সুনাগরিকের কর্তব্য নয়। ভারত-পাক ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে কোলকাতার উপকণ্ঠে দাঙ্গা লাগে কীকরে? দেশ ভাগ করে পাকিস্থান সৃষ্টি করার পরেও ভারতের মুসলমানরা আবার নিজেদের কী করে মিল্লি বলে ঘোষণা করে? গঠন করে অল ইন্ডিয়া মিল্লী কাউন্সিল, মিল্লি শব্দের অর্থ যখন ইসলামী জাতি ? কবি ইকবাল তরানা-এ-হিন্দী (সারে জহাঁসে অচ্ছা) বাতিল করে *তরানা-এ-মিল্লি* লিখেছিলেন। তার প্রথম স্তবকে গোটা পৃথিবীই মুসলমানদের বলে দাবী করেছিলেন।)

বস্তার? সেখানে আছে বনবাসী আর নক্সালওয়াড়ী। 'বনবাসী' হচ্ছে সঙ্ঘের দেওয়া আদিবাসীদের নাম। তাদের মতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। .... তারা ভারতের আদি অধিবাসী, যারা মধ্য এসিয়া থেকে আগত আগন্তুকদের দ্বারা কোনঠাসা হয়ে গিয়েছে, এই তত্ত্ব থেকে দূরবর্তী। সঙ্ঘের মতে এরা হিন্দুদের হারানো জাতি, যাদের পুনর্জাগরণ প্রয়োজন। সঙ্ঘের আর এক সংস্থা, একাল বিদ্যালয় সংস্থা আদিবাসী অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপন করছে এই আশায় যে আদিবাসীরা তাদের 'হিন্দু উত্তরাধিকার' সম্পর্কে সচেতন হবে। এই সংস্থা কয়েক হাজার বিদ্যালয় পরিচালনা করেন, যার উদ্দেশ্য আদিবাসীদের মনে করিয়ে দেওয়া যে তারা আদিবাসী নয়, বনবাসী হিন্দু।

(সঙ্ঘ যদি আদিবাসীদের 'বনবাসী' বলে তাতে ইসলাম-ধর্মেতরবাদী অক্ষের আপত্তির কী থাকতে পারে? ঝাড় কথাটির অর্থ বন। ঝাড়খন্ডিদের বনবাসী বললে আপত্তি করা কেন? তাদের জন্য যদি বিদ্যালয় পরিচালনা করে, তাদের ত্রিপুরার খ্রীষ্টান আদিবাসীদের মত সন্ত্রাসবাদী হতে না দিতে চায়, তাতেই বা আপত্তি কীসের? স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এই অক্ষ চাইছে না যে সঙ্ঘ আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করুক। খ্রীষ্টান মিশনারীরা আদিবাসীদের 'ভূত প্রেতের উপাসক' বলে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করুক এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের আমদানি হোক। মিজরামের খ্রীষ্টানদের মত তারাও বলুক 'এটা খ্রীষ্টের দেশ'।

শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছিলেন এক সাধকের কথা, যে সারাদিন একটি ঝর্ণার কাছে গিয়ে তার

অপার সৌন্দর্য অবলোকন করে আর প্রশংসা করে, বাঃ, বাঃ কী সুন্দর! সেই সাধকও হিন্দু। বাস্তবিকপক্ষে 'হিন্দু' কোনও বিশেষ উপাসক সম্প্রদায়ের নাম নয়। ভারতীয় সর্বব্রহ্মবাদী মাত্রই হিন্দু। কোনও হিন্দু মনে করেনা, সাঁওতালদের ধর্মান্তরিত করা প্রয়োজন বা সাঁওতালরা বৃহৎ হিন্দু সমাজ থেকে পৃথক। কিন্তু বিদেশী বিচ্ছিন্নতাবাদী ধর্মব্যবসায়ীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যই সঙ্ঘকে কিছু ব্যবস্থা নিতে হয়েছে--যে বিদেশী ধর্ম ব্যবসায়ীরা অসুস্থ গরীব আদিবাসীদের অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে বলেন ওষুধ নয়, যিশুই তোমার রোগ সারিয়ে দিয়েছেন; সুতরাং, তোমরা যিশুর শরণাপন্ন হও। তাতেই যে সঙ্ঘ মার্ক্স-ইসলাম অক্ষের চক্ষুশূল হয়েছে, অঞ্জলী মোদীর রচনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

এছাড়া, গোন্ড উপজাতি ছিল ক্ষত্রিয়। তাদের রাণী দুর্গাবতীকে পরাজিত করে আকবর গোন্ডয়ানা অধিকার করেন। দুর্গাবতী নামটাই সূচিত করে যে তারা হিন্দু ছিল। পরাজিত গোন্ডরা অবহেলায় হারিয়ে যায় সভ্যসমাজ থেকে। তারা পরিণত হয় উপজাতিতে। এটাই ইতিহাস।)

এখন স্বচ্ছ যে অরুন্ধতী রায়রা সরস্বতী বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের বিন্দু-বিসর্গ না জেনে সেই পাঠ্যক্রমের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা আছে বলে চিল চিৎকার জুড়ে দেন, বলেন, সরস্বতী বিদ্যামন্দিরে হাজার হাজার বালক ও কিশোরের মগজ ধোলাই হচ্ছে, ঠেসে দেওয়া হচ্ছে "সাম্প্রদায়িকতার বিষ।" অঞ্জলী মোদীর বিবরণকে সত্য ধরে নিলেও দেখা যায় যে তাঁর অভিযোগ অনুযায়ী পাঠ্যক্রমের মধ্যে 'কুসংস্কার' আছে, 'ইতিহাস বিকৃতি' আছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ তিনি করতে পারেননি।

এর বিপরীতে মাদ্রাসা শিক্ষার কথা আলোচনা করা যাক। মাদ্রাসা শিক্ষায় সরকারী অর্থ ব্যয় হয়। মাদ্রাসায় কোরান ও হাদিশ পড়ানো হয়। কোরানে কী আছে তা তো আগে একটু আভাষ দিয়েছি। কোরান সমগ্র মানবসমাজকেমুমিন (ইসলাম বিশ্বাসী) ও কাফের (ইসলামে অবিশ্বাসী) এ বিভক্ত করেছে। কোরানে কাফেরদের বলা হয়েছে, "তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে যদি না তোমরা এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন করো।" ৬০/৪

কোরান বলছে, যারা মুহাম্মদের নবীত্বে বিশ্বাস করেনা তারা কাফের এবং পশুর সমান (৭/১৭৯); এরা সবাই নরকে যাবে(৩/৮৫)।

আর পৌত্তলিকদের প্রতি কোরানের নির্দেশ, ইসলাম অথবা মৃত্যু—একথা আগেই লিখেছি।

ইসলাম নিয়ে পরে আরও আলোচনা থাকছে। জেহাদ, ইসলামের ষষ্ঠ স্তম্ভ, ইসলামের সম্প্রসারণের জন্য আগ্রাসী যুদ্ধ। সুতরাং ইসলামের জেহাদ-তত্ত্ব মানবিকতা বিরোধী। এইসব মানবিকতা বিরোধী তত্ত্বসমূহ সরকারী অর্থের সাহায্যে কোমলমতি ছাত্রদের পরিবেশন করা হয় ভারত নামক ধর্মেতরবাদী রাষ্ট্রে। আর অরুন্ধতী রায়রা বিনা পয়সার সরস্বতী বিদ্যালয়ের পাশাপাশি রাখছেন সরকারী অর্থে পরিপুষ্ট মাদ্রাসার মানবিকতা-বিরোধী শিক্ষাকে!

চার

হিন্দুত্বকে ফ্যাসীবাদ বলা একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। অরুন্ধতী রায়ও তাই করেছেন। উনি লিখেছেন, প্রথম একটা ধাপ, বিশ্বব্যাপী হিন্দু সাম্রাজ্যের ডাক দেওয়া, ইতিহাসে আমরা যেমন দেখেছি, ব্যর্থতায়, ফ্যাসীবাদীদের গলায়, রোমান গৌরব ফিরিয়ে আনার, জার্মানি জাতির বিশুদ্ধিকরণ, অথবা ইসলামী সুলতানরাজ তৈরীর প্রয়াসে।

হিন্দুরা কখনও বিশ্বজুড়ে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়না। তারা চায় শুধুমাত্র তাদের অধিষ্ঠান-ভূমি অটুট থাকুক। হর্ষবর্ধনের আমলে এক বিশাল ভূমিতে হিন্দু সংস্কৃতি বর্তমান ছিল। সেই বিশাল ভূমির মধ্যে ছিল আজকের আফগানিস্থানও। বামিয়ানের ধ্বংসকৃত বৌদ্ধমূর্ত্তি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু জয়ের পর থেকে সেই সংস্কৃতি বিপদগ্রস্ত, তাড়িত। ভারতের দুই দিকে দুই শরিয়তী রাজ্য—একদা যা ছিল হিন্দু সভ্যতার ক্রীড়াভূমি। পাকিস্থানে হিন্দুদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। মরুতীর্থ হিংলাজের দেবীমূর্তি করাচীর এক হিন্দুর গৃহে অত্যন্ত গোপনে সংরক্ষিত রয়েছে। বাঙলা দেশের অবস্থা তথৈবচ। সেখানে কী চলছে তার বীভৎস বিবরণ অন্য পর্বে থাকছে। বাঙলাদেশী বুদ্ধিজীবি সালাম আজাদ কোলকাতায় এসে স্পষ্ট বলে গেছেন, বাঙলাদেশের হিন্দুদের হয় দেশত্যাগ করতে হবে, নতুবা তাদের ইসলামায়িত হতে হবে। এ ছাড়া তাদের বেঁচে থাকার কোনও রাস্তা নেই। শুধু তাই নয়, অনুপ্রবেশের মাধ্যমে দুই শরীয়তি রাষ্ট্রের সীমান্ত এখন ভারতের দিকে আগুয়ান। দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র এখন গ্রাস করতে চায় ভারতভূমি। সে তথ্য পরের পর্বে দেওয়া হয়েছে।

পক্ষান্তরে ইসলামই চায় বিশ্বজুড়ে রাজত্ব করতে। কি তাত্ত্বিকভাবে, কি বাস্তবে এই সত্যই পৃথিবীর ইতিহাসে লেখা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। ইসলামের কাছে হিটলার-মুসোলিনী নিতান্তই শিশু। পার্থক্য শুধু একজায়গায়—মুসলমান হয়ে গেলে ইসলামের তরবারী থেকে বাঁচা যায়। কিন্তু, হিটলারের তরবারীর ডগায় মতবাদ পরিবর্তনের লিখন নেই। সেখানে ইহুদীরা জন্মগতভাবেই বধ্য। এই দিক দিয়ে ইসলামের সঙ্গে স্টালিনবাদের সাযুজ্য আছে। স্টালিন নিজের মতবিরোধীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতেন। আবার, স্টালিনের বলির সংখ্যা হিটলারের বলির চেয়ে বেশী। অরুন্ধতী রায়রা কিন্তু স্টালিনের কথা বলেন না। তাঁরা হিটলারের গণহত্যার কথাই বলেন। মরা কুকুরকে সহজেই লাথি মারা যায়। কিন্তু হিটলারের লাস দিয়ে চাপা আছে স্টালিনের লাস। পরে এই নিয়ে আলোচনা হবে।

এখন আসা যাক ইসলামী গণহত্যার কথায়। তৈমুরলঙ কয়েকদিনেই বহু লক্ষ হিন্দুকে কোতল করেছিলেন। তৈমুরের আত্মকাহিনী থেকেই শোনা যাক সে ব্যাপারে: "আমি মনঃস্থির করতে পারছিলাম না আমার অভিযান কোন দিকে নিয়ে যাব, চীনের কাফেরদের বিরুদ্ধে না ভারতের পৌত্তলিক কাফেরদের বিরুদ্ধে। এই ব্যাপারে আমি কোরান থেকে প্রত্যাদেশ চাইছিলাম এবং আমি তা পেয়ে গেলাম: হে পয়গম্বর, অবিশ্বাসী ও ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো এবং তাদের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করো।"

"সেদিন, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার সারা রাতে প্রায় পনেরো হাজার তুর্কী সৈন্য লুণ্ঠনে,

হত্যায় এবং ধ্বংসে ব্যস্ত ছিল। শুক্রবার যখন প্রভাত হলো তখন আমার সমস্ত সৈন্য নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে গেল। তারা শহরে গেল এবং লুন্ঠন, হত্যা ও বন্দী করা ছাড়া অন্য কিছু তাদের মাথায় রইলো না। সারাদিন ধরে তা চললো। পরের দিন শনিবার ১৭ তারিখে সারা দিন একই ভাবে চললো। লুটের মালের পরিমাণ এতই বেশী যে তাদের প্রত্যেকে পঞ্চাশ থেকে একশোটা নারী-পুরুষ বা শিশুর মালিক হলো।''

''আমি তখন স্মরণ করলাম আমি হিন্দুস্থানে এসেছি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং আমার উদ্যোগ এমনই আশীর্বাদপুত যে যেখানে আমি গিয়েছি, সেখানে জয়ী হয়েছি। কয়েক লক্ষ পৌত্তলিক ও অবিশ্বাসীদের আমি হত্যা করেছি, এবং আমি তরবারি রঞ্জিত করেছি কাফেরদের রক্তে।''

(এলিয়ট ও ডাউসন, তৃতীয় খন্ড)

ইসলামের ইতিহাসে তৈমুর একা নয়, বহু শত তৈমুর ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেছে।

এমন যে মহান মুঘল সম্রাট আকবর তাঁর কীর্তিকর্মের কথাই বলা যাক। *সাড়ে চুয়াত্তর* বলে একটা হাসির ছবি একদা বাঙালীর হৃদয় কেড়ে নিয়েছিল। ছবিটাতে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিলেন বাঙলা ছবির চিরকালীন নায়ক-নায়িকা সুচিত্রা-উত্তম। কিন্তু *সাড়ে চুয়াত্তর* কথাটি হাসির নয়। বড় দুঃখের ঐ কথাটি।

১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর মেবারের রানা উদয় সিংহের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। অবরোধ করেন চিতোর দুর্গ। চারমাস অবরোধ করার পরও সুরক্ষিত দুর্গের পতন ঘটলো না। উপরন্তু, রাজপুতরা জয়মল ও পট্ট নামক দুই সেনাপতির নেতৃত্বে দুর্গ থেকে বাইরে এসে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে বহু মোগল সৈন্য হতাহত করতে লাগলো। কোনও উপায়ান্তর না দেখে আকবর চিতোর দুর্গের দেওয়াল পর্যন্ত 'সাবাৎ' খোঁড়ার নির্দেশ দিলেন। চামড়া দিয়ে ঢাকা পরিখাকে সাবাৎ বলে। দুই দিক দিয়ে দুটি সাবাৎ দুর্গের দেওয়াল পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সেই দুই জায়গায় বারুদ জমিয়ে প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটানো হলো এবং প্রাচীরের এক অংশ ধ্বংস হয়ে গেল। দুর্গ রক্ষার কোনও উপায় না দেখে রাজপুত রমণীরা জহরব্রতের অনুষ্ঠান করলেন। প্রায় ৩০০ রমণী জ্বলন্ত আগুনে আত্মাহুতি দিলেন। দুর্গের মধ্যে তখন ৮০০০ রাজপুত সৈন্য অবশিষ্ট ছিল। তারা প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে সকলেই প্রাণ বিসর্জন দিল।

পরদিন প্রভাতে সম্রাট আকবর হাতিতে চড়ে দুর্গে প্রবেশ করলেন। তখন দুর্গের অভ্যন্তরে ৪০,০০০ অসামরিক রাজপুত প্রজা। ঐ অসামরিক প্রজারা যুদ্ধের সময় সৈন্যদের সাহায্য করেছিল, এই অপরাধে ঐ রাজপুতদের গণহত্যার আদেশ দিলেন ক্রুদ্ধ আকবর। সেই ৪০,০০০ রাজপুতকে হত্যা করা হলো। কতজন রাজপুতকে হত্যা করা হলো, তা জানতে ইচ্ছা হয় সম্রাটের। কিন্তু অত মৃতদেহ গুনবে কে? শেষে সম্রাটের আদেশক্রমে সব মৃতের পৈতা খুলে আনা হয় এবং তা ওজন করা হয়। তার ওজন দাঁড়ায় সাড়ে চুয়াত্তর মণ (২৭৬০ কেজি)। রাজপুতদের পৈতার ওজন ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বিস্ময়করভাবে ২২৫ গ্রাম ধরেছেন।

তা ধরলেও মৃত রাজপুতদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২২৬ জন। আসল সংখ্যাটা এর অন্ততঃ কুড়ি গুণ।

চিতোর দুর্গের সেই গণহত্যার ঘটনাকে চিরস্মরণীয় রাখার জন্য আজও রাজপুতরা সাড়ে চুয়াত্তর সংখ্যাটিকে অত্যন্ত অভিশপ্ত বলে গণ্য করেন। একে তারা 'তিলাক' বলেন। আজও কোনও রাজপুত কাউকে চিঠি লিখে সাড়ে চুয়াত্তর লিখে দিলে প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ সেই চিঠি খোলেন না। সাড়ে চুয়াত্তর সংখ্যাটির সঙ্গে কত রক্তপাত, কত বেদনা ও চোখের জল লুকিয়ে আছে তা আমরা ভুলে গেছি। আজকে সাড়ে চুয়াত্তরকে ইসলামী বর্বরতার সূচক হিসাবেই স্মরণ করা কর্তব্য। দেখা যাচ্ছে, দুটি মাত্র ঘটনাতেই কয়েকলক্ষ মানুষের নিপাত ঘটেছে ইসলামের হাতে। শুধুমাত্র ভারতেই ইসলামী বর্বরতার ফলে বহু কোটি মানুষের জীবনপাত ঘটেছে, যার শুরু হয়েছিল মুহাম্মদ ইবন কাশিমের দেবল বন্দর (করাচী) অধিকার দিয়ে। দেবল বন্দর অধিকার করে বন্দর নগরের সমস্ত পুরুষ অধিবাসীদের হত্যা করেছিলেন মুহাম্মদ ইবন কাশিম। নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস হিসাবে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন স্বদেশে।

আর মনে রাখতে হবে গণহত্যা শুধু ফ্যাসীবাদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। স্টালিন আছে, পল পট আছে, আছে মাও সে তুং। এটা মনে রাখা দরকার, যে ১৯১৭ থেকে সোভিয়েট রাজত্বে খুন হওয়া মানুষের সংখ্যা সরকারী মতে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ এবং আলেকজান্ডার সোলঝনিৎসিনের মতে ৩ কোটি ৬৭ লক্ষ। মাও সে তুঙের আমলে চীনে খুন হওয়া মানুষের সংখ্যা ৩ কোটি। এই ৩ কোটি মানুষের রক্ত বিন্যস্ত কমিউনিস্ট অধিগ্রহণ, লং মার্চ ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যে। পল পটের দ্বারা নিহত মানুষের সঠিক সংখ্যা আজও নির্ধারণ হয়নি। সাম্যবাদ ফ্যাসিবাদ রূপ মুদ্রার উল্টো পিঠ ছাড়া কিছুই নয়।

উদাহরণস্বরূপ কাটিন গণহত্যার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গণহত্যা ঘটেছিল স্টালিনের আদেশে। পোলান্ডের স্মোলনস্ক শহরের কাছে কার্টিন বনাঞ্চলে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে এক গণকবরের সন্ধান পাওয়া যায়। ২৮ মিটার লম্বা ১৬ মিটার চওড়া ঐ গণকবরে ৪১৪৩ জন পোল সৈন্যকে মাথার পিছন দিকে গুলি করে হত্যা করে পর পর থাকবন্দী করে সাজান ছিল। সামরিক পোষাকপরা সৈন্যদের পকেটে ছিল ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসের সংবাদপত্র। সোভিয়েট রাশিয়ার পতনের আগে পর্যন্ত এই গণহত্যার দায় নাৎসীদের উপরই চাপানো হতো। এখন জানা যাচ্ছে স্টালিনের নির্দেশেই ঐ হত্যাকান্ড ঘটানো হয়েছিল। ঐ সৈন্যরা রুশ সরকারের কাছে শুধুমাত্র 'বাড়তি' হয়ে গিয়েছিল। তাদের কাজে লাগানো যাচ্ছিল না, আবার ছেড়েও দেওয়া যাচ্ছিল না। সুতরাং নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল তাদের।

আসলে হিন্দুদের 'ফ্যাসীবাদী' অভিধা দিয়ে ইসলাম আর কমিউনিজমের গণহত্যাকে গোপন করতে চায় মার্ক্স-মুসলিম অক্ষ।

তৃতীয় পর্ব

মহাশ্বেতা দেবী

মহাশ্বেতা দেবীকে আমাদের আলোচনায় রেখেছি। কারণ, উনি কার্ল মার্ক্স, এঞ্জেলস, লেনিন বা কোনও রাজনৈতিক তত্ত্ব পড়েননি। তার বদলে পড়েছেন মানুষ, মানুষের অভাব আর ক্ষুধা। ক্ষুধা ছাড়া তাঁর কাছে কোনও তত্ত্ব নেই। কারণ হিসাবে উনি উল্লেখ করেছেন একটি ঘটনার কথা। একদা তিনি সিংভূমের কিছু আদিবাসীদের সঙ্গে খেতে বসেছেন। সেখানে ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করা হয়েছে শুধু মাত্র লবণ আর লঙ্কা। তিনি শুধিয়েছিলেন আর কিছু আছে কিনা খাবার সঙ্গে। এক মধ্যবয়সী মহিলা উত্তর দিয়েছিলেন, ক্ষুধা মিশিয়ে ভাত খেতে।

এটা পড়ে আমার আশ্চর্যই লেগেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের অনেক আগেই মহাশ্বেতা ঘটকের জন্ম। উনি কি সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখেননি? কিংবা দেশভাগ ও তৎজনিত উদ্বাস্তু স্রোত? ভিটেমাটি ছাড়া সেইসব নিরন্ন মানুষদের ক্ষুধাকাতরতা? ক্ষুধা দেখতে সিংভূম যেতে হবে কেন? ওঁনার নিজের জেলা মুর্শিদাবাদ একটু ঘুরে দেখেছেন কি? গ্রাম বাঙলার অসংখ্য ভূমিহীন ক্ষেতমজুর আজও আধপেটা খাওয়া। পেটভরা খাবার বলতে কি বোঝায় তা তারা এখনও জানেনা। খানিকটা ভাত রান্না হলো, সেই ভাত সবাই সমানভাবে ভাগ করে নিল। আর একটু ভাত লাগবে কি? শুনলে তারা হাঁ করে চেয়ে থাকে। এমন আশ্চর্য কথা তারা কস্মিন কালে শোনে নি।

পশ্চিমবঙ্গে নিরন্ন ভূমিহীন কৃষক বা বেকার শ্রমিক কিছু কম নেই। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী ক্ষুধাকে সিংভূমেই দেখতে চান। কারণ, নিরন্ন বঙ্গবাসীর ক্ষুধা কিছুটা ক্লিশে হয়ে গেছে। কাজে কাজেই দেশভাগের ফলে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান থেকে লুণ্ঠিত, ধর্ষিত, বিতাড়িত নরনারী তাঁর কথাসাহিত্যে তেমন কাজে লাগেনা। সেই যে পিতৃপুরুষের ধর্ম রক্ষার্থে, জীবন রক্ষার্থে, নারীর সম্ভ্রম বাঁচাতে কাতারে কাতারে মানুষ ত্যাগ করেছিল তাদের বহুপুরুষের ভিটেমাটি, তাদের ছবিগুলি বড় বিবর্ণ। কোনও সাহিত্যিকেরই কাজে আসেনা সেগুলি। তাই মহাশ্বেতা দেবী এখন শাহ আলম ক্যাম্প দেখতে যান। দেশভাগের পরে সেই উদ্বাস্তুরা যখন ক্যাম্পে ক্যাম্পে বাস করতো তখন মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য লিখতেন *মধুরে মধুর* উপন্যাস। কাশ্মিরী পন্ডিতরা আজ দশ বছর ধরে স্বভূমেই উদ্বাস্তু হয়ে আছেন, তাদের ক্যাম্পে গিয়ে তাদের দুরবস্থা দেখতে যাওয়ার কথা স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারেন না তিনি। তেলাপোকা বা টিকটিকি নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আসল মূল্যবান হচ্ছে সংখ্যালঘুদের জীবন। তাছাড়া মানুষকে খাওয়ানোর একটা ব্যাপার আছে। তেলাপোকার গল্প কেউ খায়না। মানুষকে নতুন নতুন জিনিষ খাওয়াতে হয়, বুঝেসুঝে গল্প সৃষ্টি করতে হয়। এখন খেড়িয়া-শবর বা সাঁওতাল-মুন্ডাদের নিয়ে কাজ করলে একটা নতুনত্ব হয়। তাছাড়া এই বিশ্বায়নের যুগে পাঠককে, জনতাকে, খাওয়ানোর জন্য খবর সৃষ্টি করতে হয়। সত্যি কথা সত্যি খবর সব সময় লিখতে

নেই, বলতে নেই। ছেচল্লিশের নোয়াখালি নিয়ে উপন্যাস? স্পিলবার্গের *শিন্ডলার্স লিস্টের* মত? যে নোয়াখালিতে যত না খুন হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী হয়েছিল ধর্মান্তর। যত ধর্মান্তর ঘটেছিল তার চেয়ে বহুগুণ বেশী হয়েছিল ধর্ষণ। তাই নিয়ে উপন্যাস? উরে বাবা, তা কি হয়! ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ না!

আজকের ধর্মেতরবাদী ভারতে সব সত্য কথা লিখতে নেই। তাতে কেউ 'উস্কানি' পেতে পারে। কিন্তু হিন্দুদের ব্যাপারে যা খুশী লেখা যায়। মিথ্যা, অর্ধমিথ্যা, ডাহা মিথ্যা। লিখতে কোনও অসুবিধা নেই। কী করবে হিন্দুরা? মানহানির মামলা করবে? করুক, দেখি ওদের কত টাকা আছে। বেগতিক দেখলে উকিলের মারফৎ ক্ষমা চেয়ে নেব অখন। ক্ষুর দিয়ে তো কিছু কেটে নেবেনা! ইসলাম-ধর্মেতরবাদী অক্ষ কত খুশী হবে হিন্দুদের গালাগাল করতে দেখলে! স্টেটসম্যানে এ.জে নুরানী নামক এক ইসলামী মৌলবাদী একটি নিবন্ধ লিখলেন। তার সঙ্গে ব্যঙ্গ চিত্র। গাঁধী ঘাতকের জামায় আর.এস.এস তকমা। আর.এস.এস মামলা করলো। মামলায় সমূহ পরাজয় দেখে আদালতের বাইরে মামলা মিটিয়ে নিল পত্রিকা। চাওয়া হলো 'অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য' মার্জনা।

এটাই আধুনিক ভারতের ইতিহাস। এখানে সব সত্যকথা লেখা যায়না। কিন্তু হিন্দুদের বিরুদ্ধে যা খুশী লেখা যায়। তাই লিখেছেন আমাদের বুদ্ধিজীবিরা। সেই সব লেখা সংকলিত হয়েছে ঢাউস সাইজের বইতে। দামী কাগজে ছেপে। এই পর্বে আমাদের আলোচনার বিষয় *গুজরাট দিচ্ছে ডাক* ও *গুজরাট: নরমেধ যজ্ঞ* নামক দুটি সংকলন পুস্তকে মহাশ্বেতা দেবীর রচিত প্রবন্ধ।

একটি প্রবন্ধে মহাশ্বেতা দেবী উদ্বিগ্ন হয়ে ৩.৩.০২ তারিখে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দিয়েছেন। স্বাভাবিক। দাঙ্গা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ বা নরহত্যা কেই বা চায়? উনি লিখেছেন, "গত কয়েকদিনে যে গণহত্যা চলছে তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সুকৌশলী ষড়যন্ত্রের ফল—"," তথাকথিত সংঘ পরিবারের উস্কানি দেওয়া কর্মপদ্ধতির জন্যই এটা ঘটেছে।"

এখন *উস্কানি* শব্দটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। *উসকানি* শব্দের অর্থ সংসদ বাঙ্গালা অভিধানে-প্রবর্ধন, উত্তেজন, প্ররোচনা। *উসকা* নামক দেশী শব্দের অর্থ বাড়িয়ে দেওয়া, উত্তেজিত করা, প্ররোচিত করা (স্ফোটকাদির মুখে খোঁচা দিয়ে)। কোনও বস্তু আদতে না থাকলে তা বাড়িয়ে দেওয়া যায়না। উসকে দেওয়া যায়না।

উত্তেজন সংস্কৃত শব্দের অর্থ উদ্দীপন, উৎসাহ দান বা কর্মপ্রবৃত্তি সঞ্চারণ।প্রবল বা তীক্ষ্ণ করা। প্ররোচনা শব্দের অর্থ, (প্রধানতঃ মন্দার্থে) নিয়োজন, প্রবৃত্তকরণ, উৎসাহদান। সুতরাং উস্কানি হচ্ছে এমন একটা শব্দ যা অন্যের কুপ্রবৃত্তি জাগ্রত করে। যে স্থিতধী, বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন, যার মনে কুপ্রবৃত্তি নেই, তাকে হত্যায়, অগ্নিসংযোগে, ধর্ষণে প্ররোচিত করা যায়না। সে অন্যের প্ররোচনায় কর্ণপাত করেনা। কিন্তু মানুষকে যদি এমন একটি তত্ত্বে বিশ্বাস করানো যায় যে হত্যা করায় অন্যায় নেই, তাহলে সে ঠান্ডা মাথায় নরহত্যা করতে পারে। যদি এমন একটা তত্ত্বে বিশ্বাস করনো যায় যে ধর্ষণ বৈধ, তবে সে ধর্ষণ করবে বিনা দ্বিধায়। একই

ভাবে বিনা দ্বিধায় করবে অগ্নিসংযোগ।

যাঁরা কেবল টিভির গ্রাহক তাঁরা স্পানিশ টিভি খুললে প্রায়ই দেখতে পাবেন একটা গুতুন্তে ষাড়ের সঙ্গে লড়াই করছে একজন মানুষ। মানুষটির হাতে একটা লাল কাপড়। লাল কাপড় নাড়িয়ে ষাড়টাকে উসকাচ্ছে মানুষটা। গরু রঙ চেনেনা। গরু সাদা কালো টিভি। আসলে কাপড়টা নাড়ার জন্যই রেগে যাচ্ছে ষাড়টা। রাগটা ষাড়ের জন্মগত প্রবৃত্তি। তাকেই উসকে দেওয়া হচ্ছে।

রাগী বাবার কথা আগেই বলেছি। ভারত নামক ধর্মেতরবাদী (থুড়ি, ধর্মনিরপেক্ষ) রাষ্ট্রে একজন রাগী বাবা আছেন; তাঁকে সমঝে চলতে হবে সবাইকে।

কিন্তু হিন্দুদের ব্যাপারটা অন্য। হিন্দুদের বিশ্বাস রামায়ণ একটি ধর্মগ্রন্থ। অখন্ড কাল চারটি যুগে বিভক্ত: সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। ত্রেতা যুগের অবতার হচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্র। কিন্তু নোবেল লরিয়েট অমর্ত সেন ফতোয়া জারী করলেন, রামায়ণ ধর্মগ্রন্থ নয়, মহাকাব্য। অতএব হিন্দুরা তোমাদের বিশ্বাসটা পাল্টাও। রামচন্দ্র কোনও অবতার নয়, নিতান্তই মহাকাব্যের নায়ক। তিনি যে অযোধ্যায় জন্মেছিলেন তার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

হিন্দুদের কাছে ঐতিহাসিক প্রমাণ চাওয়া অতি সহজ। হিন্দুরা সহিষ্ণু। হিন্দুদের মস্তিষ্ক বৈদান্তিক। দেহটাও তুলতুলে। জোরে ধমক দিতেও জানেনা। কিন্তু অন্য ধর্মের বিশ্বাসগুলির ঐতিহাসিক প্রমাণ চাওয়ার সাহস কোনও ধর্মেতরবাদীর নেই। বাবা ভয়ানক রাগী। মহাশ্বেতা দেবী উসকানি শব্দটি ব্যবহার করে দেখিয়ে দিয়েছেন রাগী বাবার অস্তিত্ব।

কিন্তু বাবা কেন রাগী, তা কি কেউ কোনওদিন চিন্তা করেছেন? মহাশ্বেতা দেবী জাতি দাঙ্গা কথাটি ব্যবহার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন ভারতে দুটি জাতি বাস করে। যারা পরস্পরে দাঙ্গা করে। কিন্তু দাঙ্গা যদি চিরকালের জন্য বন্ধ করতে হয়, তবে দাঙ্গার কারণ খুঁজতে হবে। সন্ধান করতে হবে দাঙ্গার উৎস। উৎসটি নির্মূল করলেই চিরকালের জন্য থেমে যাবে দাঙ্গা।

কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী আবার পড়ায় উৎসাহী নন। তিনি মার্ক্স পড়েননি, এঞ্জেলস পড়েননি, কোনও পলিটিক্যাল থিয়োরী পড়েননি। তাঁকে কিছু পড়তে বলাও তো দুষ্কর। তিনি যদি কোরানটা পড়েন, তবে বাবা কেন রাগী বুঝতে পারবেন। বাবা রাগী না হলে তো কেউ তাঁকে উসকানি দিতে পারেনা। কোরান পড়লে বুঝতে পারতেন সেমীয়(Semitic) ঈশ্বর কোনও বিধর্মীকে সহ্য করতে রাজী নন, বিশেষতঃ পৌত্তলিকদের তো নয়ই। পৌত্তলিকদের জন্য বিধান ইসলাম অথবা মৃত্যু। গোটা কোরান জুড়ে আছে বিধর্মীদের প্রতি ক্রোধ আর ঘৃণা। সেই ক্রোধ ও ঘৃণা পাঠকদের মনে সঞ্চারিত হতেই পারে।

পৃথিবীর ইতিহাসে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের গ্রন্থ প্রচার করছে। এ রকম কি কেউ আগে শুনেছে? ব্যাপারটা সত্য। *স্বস্তিকা* পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে: *কোরান পড়ুন, ইসলামকে জানুন।*

এবার সংঘপরিবারের 'উসকানি দেওয়া কর্মপদ্ধতির' কথা বলা যাক। স্বাধীনতার আগেই এই অধমের জন্ম। নিবাস কলকাতার কাছেই। ট্রামে উঠে বসলেই কলকাতায় পৌছানো

যেত। তখন কলকাতার মোড়ে মোড়ে ছিল নানান মূর্তি। ইংরেজ রাজাদের, রাণীদের, তাঁদের সেনাপতিদের, বড়লাটদের। কলকাতার রাস্তার নাম ছিল ইংরেজ লাট-বেলাটের নামে। উপনিবেশবাদী রাজা-মহারাজাদের নামে। তাদের সেনাপতিদের নামে। ইংরেজরা উপনিবেশবাদী ছিল ঠিকই। কিন্তু তারা ছিল সভ্য—পৃথিবীর যে কোনও জাতির চেয়ে। আজও তাই। স্বাধীনতার পঞ্চান্ন বছর পরে আজও শোনা যায়, *এর থেকে ব্রিটীশ আমল ভাল ছিল।*

উত্তর সাগরের দ্বীপপুঞ্জবাসী আমাদের দেশে এনেছে সামাজিক সাম্যের আইন। এই আইনের চোখে সব অপরাধী, সব সাক্ষীই সমান। অপরাধ সমাজের বিরুদ্ধে, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। কোনও ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে অপরাধ থেকে পার পাওয়া যাবেনা (আজকের পশ্চিমবঙ্গে আগেকার ইসলামী আইন চালু হচ্ছে। কোনও কোনও স্থানে ব্যক্তিগত উদোগে ক্ষতিপূরণ দিয়ে হত্যা মামলা মিটমাট করে নেওয়া হচ্ছে)। তারা এনেছে ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের আলো, ফরাশী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী। তারাই ভারতের পুরাণো সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করে আমাদের মনে আত্মসম্ভ্রম ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। তারাই প্রতিষ্ঠা করেছে *এসিয়াটিক সোসাইটির* মত প্রতিষ্ঠান। তারাই সম্পাদনা করেছে *স্যাক্রেড বুক অফ দি ইস্ট* এর মত অসাধারণ গ্রন্থমালা।

কিন্তু ব্রিটীশ শাসনের সমস্ত চিহ্ন আমরা দেশ থেকে মুছে দিয়েছি। পাল্টে দিয়েছি যাবতীয় রাস্তার নাম। যাবতীয় ইংরেজদের মূর্তি সরিয়ে দিয়েছি কলকাতার বুক থেকে। ব্রিটীশ দেশছাড়ার আগেই ভেঙ্গে দিয়েছি হলওয়েল মনুমেন্ট। কেন? ব্রিটীশরা ছিল সাম্রাজ্যবাদী।

আমার এক চেতলাবাসী বন্ধু কলকাতা ময়দানে যাবতীয় জনসভায় যোগ দিতেন। চেতলা থেকে ময়দান পায়ে হেঁটে যেহেতু বেশী দূরে নয়। প্রতিটি সভায় ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের মুন্ডুপাত না করে কেউ মাইক্রোফোন ছাড়তো না। হয়তো আজও ছাড়েনা—জানিনা। একদিন আমার যুবক বন্ধু চুপে চুপে এক বামপন্থী আধা-নেতাকেশুধালেন, আচ্ছা, ব্রিটীশ এ দেশে না এলে কী হতো?

--*দেশটা জঙ্গলে ভরে থাকতো। জঙ্গলের আইনই এখানে চলতো।* নেতাটি নিস্পৃহ কণ্ঠে উত্তর দিলেন।

যাঁরা ইতিহাস পড়েন তাঁরা জানেন সিপাহী বিদ্রোহের পরে খোদ দিল্লীতে জঙ্গলের রাজত্বই চলছিল। সিপাহী বিদ্রোহের আগেও তাই ছিল। লর্ড লেক দিল্লী অধিকার করার পর ধীরে ধীরে শান্তি ফিরে আসে দেশে। শুধু দিল্লী কেন গোটা দেশেই জঙ্গলের রাজত্ব ছিল। ছিল আজব আইন। ডিরোজিও প্রবর্তিত ক্যালিডোস্কোপ পত্রিকা লিখেছে, “under the Mohammadan code of law, circumstantial evidence was never admitted. it was necessary that the crime should be substantiated by two eye witnesses and these Mahommedans. When it is recollected, that the Mussulmauns formed only a tenth part of the population, and these too the ruling class, it must be appar-

ent that this iniquitous rule of evidence, could only serve to secure impunity to those Mahommedans, who cruelly murdered their fellow creatures of the Hindoo faith."

(ইসলামী আইন অনুসারে পারিপার্শ্বিকতার বিচার বিশ্লেষণ থেকে লব্ধ প্রমাণের কোনও মূল্য নেই। অপরাধ প্রমাণ করতে হবে দুজন মুসলমান সাক্ষীর দ্বারা। কিন্তু যখন এটা স্মরণ করা হয় যে জনসংখ্যার মাত্র এক দশমাংশ হচ্ছে মুসলমান, এবং এরা হচ্ছে শাসক শ্রেণীর তখন স্বচ্ছ হয় যে এই অসাম্যের সাক্ষ্য-আইন যারা নিষ্ঠুরভাবে হিন্দুদের হত্যা করে, সেইসব মুসলমানদেরই দন্ডের হাত থেকে রেহাই দেবে।)

ব্রিটীশ আসার আগে কেমন সুন্দর মিশ্র সংস্কৃতির মধ্যে বাস করতো হিন্দুরা দেখা যাক *সাধারণ জ্ঞানার্জিকা সভার* কার্যবিবরণী থেকে: এবার উদ্ধৃতিটা শুধুমাত্র ইংরেজীতেই দিলাম:
But upon nothing has the pernicious influence of this cursed power operated so powerfully as upon the condition of the Hindoo women. The cause of that state of seclusion and imprisonment in which the females of this land are preserved, may be traced to the tyranny of the Mehomedan Emperors.

"The Muselman is raging through the land
Prayer in his tongue and murder in his hand
Farewell! the city's joy, the country's rest,
Farewell! the happy sunshine of the brest
Farewell! the bright heroic hopes of youth,
Farewell! the love of Excellence and truth;
Farewell! the scenes where aged virtue prayed
While fearless beauty spotted in the shade."

এই যখন দেশের অবস্থা তখন অস্ত্রধারী মুসলমান দেখলেই গ্রামের হিন্দুরা গ্রাম ছেড়ে পালাতো। কারণ, মুসলমানরা খুন-জখম-ধর্ষণ যা খুশী তাই করতো। বাধা দিলে তা গণ্য হতো বিদ্রোহ বলে। ইসলামী আমলে হিন্দুরা ছিল তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক।

কিন্তু আমরা ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদকে দুবেলা গালাগাল করলেও ইসলামী সাম্রাজ্যবাদ বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব মানিনা।

আমরা কতকগুলি ধাপ্পা দিই:

(১) ব্রিটীশ আমলের আগে হিন্দু-মুসলমান গলাগলি করে থাকতো। ব্রিটীশ এসেই ডিভাইড অ্যান্ড রুল করে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়ে দেয়।

(২) রাম জন্মভূমি মন্দির বলে কোনও মন্দির ছিলনা। বাবরের সেনাপতি মীর বাঁকি কোনও মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ করেননি। গোটা ব্যাপারটা ব্রিটীশের কারসাজি। তারাই এই

বিতর্কটা সৃষ্টি করে।

(৩) ইসলাম মানে শান্তি (রাহুল সাংকৃত্যায়ণ ও এম. এন রায়)।

(৪) ইসলাম ধর্মে সামাজিক সাম্যের কথা আছে।

(৫) ইসলামী জেহাদগুলি আসলে শ্রেণী সংগ্রাম (ওয়াহাবী জেহাদ, তিতুমীরের জেহাদ, মোপলা জেহাদ)। তিতুমীর আবার দেশপ্রেমী—নেতাজী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বা গাঁধীর মতই। শিশুপাঠ্য *বাঁশের কেল্লায়* শিশুদের তাই শেখানো হয়।

রামজন্মভূমি মন্দির পুনরুদ্ধারের জন্য হিন্দুরা মুঘল যুগ থেকে সংগ্রাম করে আসছে। হিন্দুদের একটি পবিত্রস্থান যা ১০৪৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে এবং ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রতিবন্ধকতাহীন ভাবে একটি হিন্দু মন্দির হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল সেটাকেই বিশুদ্ধ মসজিদ বলে দাবী করছিল মুসলিম নেতারা, আর তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে অযোধ্যার ঐতিহাসিকতা নিয়ে দাবী করছিল এবং করছে ধর্মেতরবাদীর দল, বুদ্ধিজীবির দল। সঙ্গে সঙ্গে উঠতে বসতে গাল দিচ্ছিল হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলিকে। কারণ, সংখ্যালঘু ভোট। অথচ কেউ তখন সামান্যতম প্রতিবাদ করেননি যখন আজিজ আহমেদের বহুল প্রচারিত পুস্তকে তথ্যসূত্র উল্লেখ করে লেখা হয়েছিল, "বাবরের পৌত্তলিকতা বিরোধিতার চরম প্রকাশ তাঁর আদেশে ১৫২৮-২৯ অব্দে মীর বাঁকি কর্তৃক অযোধ্যার রাম জন্মভূমি মন্দির ধ্বংস।" তখন কেউ বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করেননি।

রামজন্মভূমি মন্দিরে অস্তিত্বের বিপক্ষে ইসলাম-ধর্মেতরবাদী অক্ষের বক্তব্যের জবাব হিসাবে ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে বহু গুরুত্বপূর্ণ দলিল পেশ করার পরেও এইসব অপলাপবাদীদের মতের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। এইসব গুরুত্বপূর্ণ দলিলের মধ্যে আছে উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের বহিঃস্থ মুসলমানদের পাঁচটি দলিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমান কর্মচারীদের দুটি দলিল, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর দুজন ইউরোপীয় পর্যটকের দুটি দলিল), সব কিছুতেই মন্দির ধ্বংসের প্রমাণ। ইঞ্জিনীয়ারাদি ইতিহাসের তথ্য গোপনকারী অপলাপবাদীরা তাঁদের রচিত পুস্তকে এইসব সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। বাঙলার কিছু বুদ্ধিজীবিও এই 'বাদ্যবাদকদের কামরায়' উঠে বসেছিলেন এবং আজও বসে আছেন।

অযোধ্যা বিতর্কে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার বিষয় যে ভারতীয় তথ্য গোপনকারী অপলাপবাদীরা ইউরোপীয় অপলাপবাদীদের মত আরও এক ধরনের চাতুর্য অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বিরুদ্ধ বক্তাদের চরিত্র হনন করছেন, যাতে জনগণের মন যুক্তি থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। ১৯৯০ এর ডিসেম্বরে জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও গবেষকরা ভারতের তথাকথিত ধর্মেতরবাদী সংবাদপত্রগোষ্ঠির সহায়তায় অধ্যাপক বি. বি. লাল ও ডঃ এস. পি. গুপ্তের পেশাগত সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এই দুজন পুরাতত্ত্ববিদ বাবরী মসজিদের নীচে একটি হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন। এই দুজনের এবং অন্যান্য পুরাতত্ত্ববিদদের প্রতিবাদের সংবাদ ধর্মেতর সংবাদপত্রগুলিতে খুব অল্পই স্থান পেয়েছে। ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারীতে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিকদের এক সভায় ইরফান হাবিব যাঁরা হিন্দুদের বক্তব্যের সমর্থনে সরকার আয়োজিত বিতর্কে যোগদান করেছিলেন

সেই সব বিদ্বানদের উপর বিষোদগার করেছিলেন তাঁর কুখ্যাত ভাষণটিতে। তাঁর বক্তৃতার ঝাঁজ ছিল বিশেষ করে অধ্যাপক বি. বি. লালের বিরুদ্ধে। এইক্ষেত্রে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট এ. কে সিংহের বক্তব্য ছাপা হয়েছিল ইংরেজী *সানডে* পত্রিকায়। এই প্রতিবাদের বিষয় বস্তু অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এটা প্রায়োগিক বিষয়ে পূর্ণ, সর্বসাধারণের পক্ষে বোধগম্য নয়। এর ইংরেজীও ছিল অত্যন্ত খারাপ। সুতরাং লেখাটি সাধারণের মনে কোনও ছাপ ফেলতে পারেনি। আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ার তাঁর বাবরী মসজিদ রাম জন্মভূমি বিতর্ক পুস্তকে হিন্দুদের কিছু অসম্পূর্ণ ও কম বিশ্বাস উৎপাদক বক্তব্য সন্নিবেশ করেছেন। ভাবখানা যেন হিন্দুদের বক্তব্যও তিনি সাধারণকে শোনাতে উৎসুক। কিন্তু হিন্দুদের বক্তব্যের মধ্যে সবচেয়ে জোরালো ও যুক্তিযুক্ত অংশ সুকৌশলে বাদ দিয়েছেন তিনি। পাঠকের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়েছেন সবচেয়ে সিদ্ধান্তকর যুক্তিগুলি। কিন্তু কৌশলে ইতিহাসের ইচ্ছাকৃত বিকৃতিকে ঢেকে দিয়েছেন এক নিরপেক্ষতার আবরণে।

অ্যানাটমি অফ কনফ্রন্টেশন পুস্তকে জে. এন. ইউ ঐতিহাসিকবৃন্দ অধ্যাপক এ. আর. খানের জোরালো যুক্তিসমূহ উল্লেখই করেননি, অধ্যাপক হর্ষনারায়ণ ও এ. কে চ্যাটার্জীর প্রামাণ্য সাক্ষ্যের (প্রথমে ইন্ডিয়ান একসপ্রেসে প্রকাশিত। পরে *ভয়েস অফ ইন্ডিয়ার* হিন্দু *টেম্পল: হোয়াট হ্যাপন্ড টু দেম : এ প্রিলিমিনারী সার্ভে* নামক পুস্তকে প্রকাশিত) কথা শুধুমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সবিস্তারে আলোচনা করা হয়নি, অস্বীকার করা তো দূরের কথা। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের হিজিবিজি পুস্তিকা ও বি.জে. পি বক্তার অজ্ঞতামিশ্রিত বক্তব্য উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে সবিস্তারে।

বাবরী মসজিদ সমর্থক ভারতীয় অপলাপবাদীদের ঐতিহাসিকদের চতুরালী হচ্ছে এক ধরনের ভয়াবহ জোচ্চুরী, যাতে একজনের বক্তব্য থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে আদতে যা বলা হয়েছে তার বিপরীত বক্তব্য প্রমাণ করা। যখন তাদের চালাকী বিফল হয়ে গেল তখন জে.এন.ইউ এর ঐতিহাসিকরা প্রথমতঃ অধ্যাপক বি.বি. লালকে বিশ্বাসঘাতক ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ভাড়া করা লেখক বলে গালি দিতে লাগলো। এসব করেও যখন তারা বিফল হলো, তখন তারা অধ্যাপক বি. বি. লালের খ্যাতিকে ব্যবহার করে প্রমাণ করতে চাইলো বাবরী মসজিদের স্থলে কোনও মন্দির ছিলনা।

তাদের পুস্তিকা *দি পলিটিক্যাল অ্যাবিউস অফ হিস্ট্রীতে* এইসব ঐতিহাসিকরা ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষার ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের অযোধ্যা ও অন্যান্য রামায়ণ-বর্ণিত স্থানের খননকার্যের প্রতিবেদন থেকে অধ্যাপক বি. বি. লালের প্রতিবেদনের সারাংশ উৎকলিত করে প্রচার চালাতে লাগলো যে বাবরী মসজিদের স্থলে কোনও মন্দির ছিলনা। তারা ঐ প্রতিবেদনের বক্তব্য খুব ভাল ভাবেই জানতো। কাজে কাজেই তারা ঐ প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে লাগলো বাবরী মসজিদের আশপাশের এলাকা খনন করে নবম শতাব্দীর পূর্বেকার কোনও মন্দির পাওয়া যায়নি। তারপর তারা বলতে লাগলো, ঐ বিতর্কিত স্থানে পুরাতাত্ত্বিক খননের ফলে কোনও মন্দিরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি, যদিও অধ্যাপক লালের ঐ প্রতিবেদনে বিতর্কিত স্থানে একাদশ শতাব্দীর একটি দালানের ধ্বংসাবশেষের কথা বলা হয়েছিল। পরে তারা বারবার

একই প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে, 'পরবর্তী সময়ের কোনও গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য নেই।'' কিন্তু ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে যার তাৎপর্য ছিলনা ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে তার তাৎপর্য অসীম।

ইরফান হাবিবের পূর্বোক্ত বক্তৃতার প্রতিবাদে এ.কে. সিংহের বক্তৃব্যের শেষ অনুচ্ছেদে দেখানো হয়েছে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে মার্ক্সীয় ঐতিহাসিকদের বক্তব্য বাবরী মসজিদ বিতর্কের আগে ও পরে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। আজ কমিউনিস্ট নেতাদের কাছে, বাবরী মসজিদ অ্যাকসন কমিটি ও ভন্ড ধর্মেতরবাদীদের কাছে রামায়ণ-মহাভারতের নাম উচ্চারণও জাতীয়তাবিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িকতা বলে বিবেচিত।

যে রামজন্মভূমি মন্দির পুনরুদ্ধারের জন্য হিন্দুরা যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ করে আসছে, তারা প্রত্যাশা করেছিল দেশ স্বাধীন হবার পরে, মুসলমানরা লড়াই করে দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান হাসিল করার পরে তারা অন্ততঃ তাদের তিন বিখ্যাত ধর্মস্থান পুনরুদ্ধার করতে পারবে—বারাণসীর বিশ্বনাথ, মথুরার কৃষ্ণ-জন্মভূমি ও অযোধ্যার রাম জন্মভূমি মন্দির। কিন্তু কিছু ধর্মেতরবাদী উকিল ও ব্যারিস্টার বিলিতি বইএর পাতা উল্টে উল্টে সেকুলারিজম নামক এক অদ্ভুৎ বস্তু আহরণ করলেন। তুচ্ছ হয়ে গেল হিন্দুদের আশা-আকাঙ্খা। গোটা রাষ্ট্র হলো সংখ্যালঘু তোষণের বারাণসী।

ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের সব চিহ্ন মুছে দেবার পরে ভারতের বুকে ইসলামী সাম্রাজ্যবাদীদের অধিকৃত তিনটি হিন্দু তীর্থ পুনরুদ্ধারের দাবী কি খুব অন্যায় দাবী? উস্কানি দেওয়া কর্মপদ্ধতি? হিন্দুরা কি খুব অন্যায় দাবী করছে? এই দাবীর বিরোধিতা করে মিথ্যা ইতিহাস রচনা করা কি বৌদ্ধিক সততার পরিচয়?

রাষ্ট্র হবে ধর্মেতরবাদী। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেওয়ানী আইন চলবে দেশে। হিন্দুরা যদি অভিন্ন দেওয়ানী আইন দাবী করে, সেটা কি খুব অন্যায্য দাবী হবে? সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিলের দাবী কি খুব অসঙ্গত? এই অসঙ্গত ধারার বিরুদ্ধে সংঘ পরিবার যদি প্রতিবাদ জানায় সেটা কি খুব অন্যায়? উস্কানি দেওয়া কর্মপদ্ধতি?

বলা হয় ব্রিটীশ এসে এ দেশে ডিভাইড অ্যান্ড রুল করে হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করেছে। এর জন্য দাখিল করা হয় মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোনের একটি চিঠি। চিঠিটি এলফিনস্টোন লিখেছিলেন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে। কিন্তু তার আগেই ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ খাঁ সিপাহী বিদ্রোহের ময়না তদন্ত করতে গিয়ে *আসবাব-ই-বাগাওয়াত-ই-হিন্দ* পুস্তকে হিন্দু-মুসলমান *দুটি বিবদমান জাতি* বলেই উল্লেখ করেছিলেন। তিনি ব্রিটীশ সরকারের সমালোচনা করে লিখেছিলেন, হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যকে ব্যবহার করে ভারতীয় সৈন্যের মধ্যে অনৈক্যকে সুনিশ্চিত করা উচিত ছিল। আজ থেকে প্রায় ৬২ বছর আগে নীরোদ চন্দ্র চৌধুরী 'শনিবারের চিঠি' তে এক প্রবন্ধে তথ্য সহকারে দেখিয়েছিলেন ব্রিটীশ শাসন যখন দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়নি ভারতের মাটিতে তখন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বারাণসীতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একের পর এক দাঙ্গা লেগেছিল। আতহার আব্বাস রিজভী

শাহ ওয়ালী উল্লাহ ও সমকাল পুস্তকে অষ্টদশ শতাব্দীর ভারতে সংঘটিত কতকগুলি হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কথা লিখেছেন। এর মধ্যে আছে ফারুখশীয়ারের রাজত্বকালে ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দের হোলির রাতে আহমদাবাদের মিশ্র এলাকাতে চাঁচর পোড়ানো নিয়ে দুই সম্প্রদায়ে দাঙ্গা। তিন দিন স্থায়ী ঐ দাঙ্গায় অনেক হিন্দু ও মুসলমান মারা যায়। এছাড়া সৈয়দ আহমদ বেরেলবী ও তিতুমীরের ওয়াহাবী জেহাদের ঘটনা আছে, যার সঙ্গে কোনও মতেই ব্রিটীশের উস্কানি জড়িত নয়। আছে হাজি শরিয়ৎউল্লা ও দুদু মিঞার ফরাজী আন্দোলনের ঘটনা। ফরাজী আন্দোলনের একটি ঘটনার বিবরণ দিচ্ছি: ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল ফরিদপুর জেলার শিবচরে হাজী শরিয়ৎউল্লার পারলৌকিক অনুষ্ঠানের শেষে ফরাজীরা ৭ টি গ্রামে ৭৬ টি হিন্দু বাড়ী লুট করে ছিল। ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে লুটপাট করে ভেঙ্গেছিল বহু দেবমূর্তি।

এটা যদুনাথ সরকার বা রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতহিন্দু মৌলবাদী ঐতিহাসিকদের বিবরণ নয়। মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক নরহরি কবিরাজের রচনা।

সুতরাং অশোক মেহতা ও অচ্যুত পট্টবর্ধনের *সাম্প্রদায়িক ত্রিকোণ* তত্ত্ব ভিত্তিহীন তঞ্চকতা ছাড়া কিছুই নয়। আজকের পার্টিলাইনের ঐতিহাসিকরা মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক বজায় রাখার জন্য ইতিহাস বিকৃত করে ছদ্ম মৌলবাদী হাবিব ও ইঞ্জিনীয়ারদের সাম্প্রদায়িক বক্তব্যকে সমর্থন জানাচ্ছেন। আজ হিন্দুরা যদি এই ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় তা হলে কি খুব অন্যায় হবে? উস্কানি দেওয়া কর্মপদ্ধতি হবে? সেটা কি ইতিহাসের গৈরিকীকরণ বলে নিন্দা করতে হবে?

আগেই বলেছি, পশ্চিমবঙ্গের শিশুদের শেখানো হচ্ছে ইসলাম সামাজিক সাম্যের ধর্ম, আর হিন্দু ধর্ম সামাজিক অসাম্যের। অথচ কোরান-হাদিশের কোথাও বলা নেই এসব কথা। শেখানো হচ্ছে, ইসলাম মানে শান্তি। এসব নিছক ধাপ্পা। ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ। একেশ্বর আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ। এটাই ইসলাম শব্দের কোরানীয় অর্থ। আর ইসলামের সঙ্গে শান্তির আড়াআড়ি সম্পর্ক। কারণ, ইসলামের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হচ্ছে জেহাদ। জেহাদ আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ। ইসলাম প্রসারণের জন্য। সেখানে পৌত্তলিকদের হত্যা করার জন্য ওৎ পেতে বসে থাকার কথা বলা আছে, পৌত্তলিকদের দেখামাত্র হত্যা করার কথা বলা আছে। কোরানের একটি অধ্যায়ের নাম *লুটের মাল*। কোরানে আছে লুট করা মালের ৮০ শতাংশ লুটেরাদের প্রাপ্য। লুট করা কি শান্তিপূর্ণ ব্যাপার? আজকে হিন্দুরা যদি এইসব সত্যকথা উচ্চারণ করে, সেটা কি গৈরিকীকরণ হয়ে যাবে। সেটা কি উস্কানি দেওয়া কর্মপদ্ধতি বলে গণ্য হবে?

ইসলাম গোটা পৃথিবীর মানব সম্পদকে দুটি শিবিরে ভাগ করেছে--বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসী। অবিশ্বাসীদের উচ্ছেদ করে বিশ্বজুড়ে আল্লাহ্‌র রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের অন্তিম উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যের কেউ প্রতিবন্ধকতা করলেই তার বিরুদ্ধে জেহাদ করতে হবে। জেহাদের সময় ইসলামের তরবারী উচ্চ-নীচ গরীব-ধনী ভেদাভেদ করেনা। অবিশ্বাসী মাত্রই শত্রু।

তিতুমীর গরীব হিন্দু চাষীদের রেহাই দেয়নি। তাদেরও বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করেছিল। ছেছল্লিশের নোয়াখালিতে নিম্নবর্গের গরীব হিন্দু চাষী বউরা গোলাম সারোয়ারের সাঙ্গপাঙ্গদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তারাও *গণিমতের মাল* হয়ে সমানভাবে ধর্ষিতা হয়েছিল কোরানীয় বিধান(৪/২৪) অনুযায়ী। সুতরাং এইসব জেহাদগুলিকে যারা শ্রেণী সংগ্রাম বানাচ্ছে তাদের অসৎ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো কি উস্কানি দেওয়া কর্মপদ্ধতি বলে গণ্য হবে?

এরপর রাষ্ট্রপতির কাছে মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন, "আইনগত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে নিতে হবে, যারা গোধরায় তথাকথিত করসেবকদের হত্যা করেছে,..."

আইনগত ব্যবস্থা নেয় আদালত। সেই ব্যবস্থা নেওয়ার কতকগুলি পদ্ধতি আছে। অভিযোগ>তদন্ত>সন্দেহ> গ্রেপ্তার>আরও তদন্ত> সাক্ষ্য-প্রমাণ, সাক্ষী>বিচার >শাস্তি। বিচারক বিচার করেন সাক্ষ্য-প্রমাণ ও সাক্ষীর বক্তব্যের ভিত্তিতে। ইসলামী দাঙ্গায় অংশগ্রহণকারীরা বেশীভাগ সময়েই ভদ্রলোক(গরীব লোক মানে ছোটলোক, এ তত্ত্বে আমি বিশ্বাসী নই)। তাদের অনেকেই সমাজবিরোধী বলে পরিচিত নয়। তাদের উত্তেজিত করা হয় মসজিদ থেকে। জেহাদে প্রবৃত্ত করা হয় ধর্মের দোহাই দিয়ে। সুতরাং এখানে পুলিশী ইনট্যালিজেন্স কোনও কাজে আসেনা। এমনই গোধরায় মুসলমানদের সংখ্যা ৪৫ শতাংশ। সিগন্যাল ফলিয়া অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেখানে কোনও নিরপেক্ষ সাক্ষী পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, পয়গম্বরের মদিনা ঘোষণা অনুসারে এই ধরনের বিবাদের ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিধর্মীদের বিরুদ্ধে এককাট্টা থাকতে হবে।

সুতরাং গোধরার অগ্নিকান্ডে নিরপেক্ষ সাক্ষীর অভাবে অভিযোগ প্রমাণ করা যাবেনা। একজনও শাস্তি পাবে না। কিন্তু পাল্টা দাঙ্গার ক্ষেত্রে কিছু না কিছু লোকের শাস্তি হবে। যদিও সবাই শাস্তি পাবে, এমন ঘটনা ঘটবে না। কারণ, এখানেও সেই সাক্ষ্য-প্রমাণ ও সাক্ষীর প্রশ্ন আছে। গণহত্যা করেও যে কেউ শাস্তি পায়না, তার নজির তো পশ্চিমবঙ্গেই আছে। দিনের আলোয় বিজন সেতুর উপর সতেরোজন আনন্দমার্গীকে পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। সেই অপরাধের জন্য একজন লোককেও অভিযুক্ত করতে পারেনি সরকার। আজকের যেসব বুদ্ধিজীবিরা গুজরাট নিয়ে চিৎকার করছেন, তারা সেদিন মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন। ব্যতিক্রমী ছিলেন শুধু মৈত্রেয়ী দেবী।

আনন্দমার্গীরা ছিল হিন্দু, সংখ্যালঘু নয়। কিন্তু তারাও কোন না কোন মায়ের সন্তান ছিল। কোনও না কোন নারীর স্বামী। সেই সব নারীদের কান্না বাঙলার কোনও কবির কলমে অশ্রু ঝরাতে পারেনি। পারবে কি করে। হিন্দু মানেই তো ঘৃণ্য। ঘৃণ্য মানুষদের জন্য কি কেউ কলম চালায়? আনন্দমার্গীরা যদি খ্রীষ্টান মিশনারী হতো, তাহলে গোটা পৃথিবী নড়ে চড়ে বসতো।

আজকের ধর্মেতরবাদী ভারতে সরকারী অর্থ সাহায্য নিয়ে সাম্প্রদায়িক মাদ্রাসা শিক্ষা চলছে। সারা দেশ জুড়ে ধর্মেতরবাদী শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকা সত্ত্বেও। মাদ্রাসায় পড়ানো হয়

কোরান-হাদিশ। পড়ানো হয় জেহাদের তত্ত্ব। মাদ্রাসা পরীক্ষায় পঞ্চাশ নম্বরের ভারত ইতিহাস আরম্ভ হয় মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয় দিয়ে। তার আগে ভারত জাহিলিয়া (অন্ধকার) অবস্থায় ছিল। সুতরাং অশোক পড়ার দরকার নেই। দরকার নেই সিন্ধু সভ্যতা পড়ার। মৌর্য যুগ গুপ্ত যুগ তো দূরস্থান। সরকারী পয়সায় এই রকম ক্ষতিকর ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা নিয়ে কিছু ভারতীয় নাগরিক উৎপাদিত হচ্ছে, এসব নিয়ে আমাদের বুদ্ধিজীবিরা কোনও দিন ভাবনা চিন্তা করেন না। করবার মত সৎসাহসও নেই। অথচ এইসব অসম্পূর্ণ শিক্ষা পাওয়া শিশুদের অন্তরেই লুকিয়ে আছে ভবিষ্যৎ শিশুদের পিতা। ধর্মেতরবাদী রাষ্ট্রে মুসলমানদের তীর্থ করার জন্য ভর্তুকী দেওয়া হয়। হিন্দুদের কর দিতে হয় গঙ্গাসাগরে তীর্থ করার জন্য।

এইসব ঘটনা তিলে তিলে গুজরাট সৃষ্টি করে। এইসব ব্যাপার নিয়ে মহাশ্বেতা দেবী কি কোনও দিন রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখেছেন?

এর পরে মহাশ্বেতা দেবী রাষ্ট্রপতিকে লিখেছেন, গত তিন দিনের ঘটনায় এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত সময়ে ব্যবস্থা না নিয়ে সরাসরি এই গণহত্যায় মদত জুগিয়েছেন।

পুলিশ ও সরকারের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ যে কোনও ঘটনার পরে সর্বদাই করা হয়। এগুলি খবরের কাগজ খুললেই পাওয়া যায়। ব্যবস্থা নেওয়ার কতকগুলি পদ্ধতি আছে। পুলিশ প্রশাসনকে সেই সব পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। মহাশ্বেতা দেবীর কি সেই সব জটিল প্রশাসনিক পদ্ধতির ব্যাপারগুলি জানা আছে? আমরা বাইরের লোকরা অনেক কিছু বলতে পারি—গাড়ী ঢিমে তালে চললে ট্রেনের যাত্রীরা ড্রাইভারের থেকেও ভাল গাড়ী চালানো বোঝে। টিভির ক্রীড়া দর্শকরা শচীন সৌরভের থেকে ভাল ক্রিকেট বোঝে। সৌরভ আউট হলে বলে, বলটা ঐভাবে না খেলে যদি এইভাবে খেলতো। যে কোনও হিংসাত্মক ঘটনার ক্ষেত্রে পুলিশী অকর্মন্যতার অভিযোগ ওঠে।

মহাশ্বেতা দেবীও মনে করেন এর থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যেত। এ মনে করায় দোষ নেই। মহাশ্বেতা জনগণেরই একজন। তিনি বিশেষজ্ঞ নন। মহাশ্বেতা দেবী প্রত্যাশা করেছিলেন গোধরার নারকীয় হত্যাকান্ডের পর সরকার এমন ব্যবস্থা নেবেন যে সংখালঘুদের একটা জীবনও হানি হবেনা। তা হয়নি। কারণ, তা হয়না। কোনও সরকারই মুকেশ শর্মার 'শক্তিমান' নয় যে এক লহমায় সবকিছু করে ফেলবে। আবার গোধরা কান্ডের পর হিন্দুরা সুবোধ বালকের মত দেশের আইন ও প্রশাসনের দিকে তাকিয়ে থাকবে, এমত আকাঙ্খা করাও ঠিক নয়। তাতে দেশের বর্তমান আইন ও সংবিধান মান্যতা পেলেও সমাজ-বিজ্ঞান ব্যর্থ হয়ে যায়, ব্যর্থ হয়ে যায় মনোবিজ্ঞান। কারণ, এক রোগা ডিগডিগে কিশোর যদি এক বলবান যুবককে চড় মারে এবং সেই বলবান যুবক যদি কাঁদতে কাঁদতে কিশোরের পিতার কাছে নালিশ করতে যায় তবে সেই যুবককে মানসিক রোগগ্রস্ত ধরে নিয়ে মনস্তত্ত্ববিদের নিকট নিয়ে যেতে হয়। কৌরবদের হস্তে অপমানিত দ্রৌপদী পান্ডবদের কাপুরুষতায় ব্যথিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করে দুঃশাসনের রক্ত বিনা সে চুল বাঁধবে না। আবার আইন-কানুন সব সমস্যার সমাধান করতে

পারেনা। আগেই বলেছি, বিজন সেতুর উপর আনন্দমার্গীদের কারা হত্যা করলো তা আজও জানা যায়নি। কাশ্মীরে মুহাম্মদের পবিত্র কেশগুচ্ছ চুরি গেলে রক্ত ঝরে বাঙলাদেশে। ভারতে রামমন্দিরের শিলান্যাস হলে বাঙলাদেশে ভাঙে দুশো মন্দির। মসজিদ বা মন্দির সরকার ভাঙেনা। ভাঙে দ্রৌপদীর অপমানিতা মানসিকতা। তবুও, কেন্দ্রে এবং গুজরাটে যখন বিজেপি সরকার তখন তার গাফিলতি তো অত্যন্ত বেশী পরিমাণে থাকবেই!

অন্য রাজ্যে যখন পার্টি ক্যাডাররা খুনজখম করে তখন ব্যাপারটা জনরোষ বলে প্রচার পায়। হয় কেউ গ্রেপ্তার হবেনা, বা, পার্টি ঘনিষ্ঠ অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার আগে পুলিশ পার্টি অফিসের দিকে চেয়ে থাকে কখন সবুজ আলো জ্বলবে। তখন এসব ব্যাপারগুলি বুদ্ধিজীবিদের কাছে খুব স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু ঘটনা যখন বিজেপি শাসিত রাজ্যে ঘটে তখন সেটাকে পোগ্রম বলে চালাতে হবে। কারণ, বিজেপি মানে হিন্দুত্ব। বড় ঘৃণ্য এই হিন্দুত্ব।

আমরা একথা বলছিনা যে গুজরাটের পুলিস ও প্রশাসন সর্বদা নিরপেক্ষভাবে কাজ করেছে। এ সব ক্ষেত্রে কখনই তা হয়না। কারণ, পুলিস কোনও যন্ত্রের নাম নয়। পুলিসও মানুষ। সেও সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা গ্রস্ত হতে পারে। সেও সরকারী দলের সমর্থক ও সদস্যদের প্রতি গুলি চালাতে দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারে। একজন লেখক লিখেছেন, ...জীবনে মুসলমানকে যে চেনেই না এমন লোকও বলে ''ওরা বড্ড বাড় বেড়েছে, একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। এমনকি বামপন্থী রাজনীতি করেন এমন লোকও, আমার পাড়াতে একথা বলেছেন....'' (প্রদীপ বসু)। সুতরাং ''সাম্প্রদায়িকতাহীন'' পশ্চিমবঙ্গের একজন বামপন্থী যদি মনে করতে পারেন যে মুসলমানদের বাড় বেড়েছে, তাহলে সে কথা গুজরাটের বেশ কিছু পুলিশও মনে করতে পারে। সে সাম্প্রদায়িক হয়ে যেতে পারে। আবার প্রদীপ বসু যেভাবে মুসলমানদের চেনেন, সবাই সে ভাবে নাও চিনতে পারে। চেনাচেনি নিতান্তই ব্যক্তিগত অনুভূতির ব্যাপার।

এখন সেনা মোতায়েন নিয়ে একজন বিশেষজ্ঞের মত জানা যাক। ''গোধরায় ট্রেনে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে ২৭ শে ফেব্রুয়ারী। ২৮ শে ফেব্রুয়ারী আমেদাবাদ সহ গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। সেই রাত্রেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী ক্যাবিনেটের সুরক্ষা কমিটি ও সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং ১লা মার্চ ভোর হওয়ার আগেই সামরিক বাহিনীর একটা বিগ্রেড আহমেদাবাদে পৌঁছে যায়। সেদিনই একটা বিগ্রেড বিমানযোগে রাজ্যে পৌঁছতে থাকে। বিলম্বে যদি হয়েই থাকে তবে বোধহয় দাঙ্গা শুরু হওয়ার প্রথম চব্বিশ ঘন্টায় সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারেনি, সেটাই ঘটনা।

''সেনাবাহিনীকে ডাক দেওয়ার আগে কতকগুলি শর্ত পালন করার জন্য রাজ্য সরকারকে বলা হয়েছে। যেমন রাজ্য সরকার জানাবে তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সমস্ত পুলিশবাহিনীকে নিয়োজিত হয়ে গেছে। অবস্থা সামাল দিতে সেনাবাহিনী ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

''যেসব বিগ্রেড সাধারণভাবে গুজরাতে সহায়তা দেওয়ার দায়িত্বে ছিল তারা দীর্ঘ সীমান্তের কোনও গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে নিয়োজিত থাকলে তাদের পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে গুজরাতে ফিরে আসা সম্ভব হয় না। আবার যেসব বিগ্রেড তুলে আনলে সীমান্ত প্রহরা বিঘ্নিত হবেনা তারা হয়তো গুজরাতের বিভিন্ন সহর ও গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে পরিচিত নয়।

"এত প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাত্র ছ ঘন্টার মধ্যে আমেদাবাদে পৌঁছে সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে পেরেছে এবং চব্বিশ ঘন্টায় অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্বে আনার ব্যবস্থা করেছে এটা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়।" (মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায়, বর্তমান)

দুই

মহাশ্বেতা দেবীর পরের প্রবন্ধ 'না' বলুন।এর প্রথমেই তিনি পশ্চিম বঙ্গের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির গুণকীর্তন করেছেন।তিনি অন্য রাজ্য থেকে আসা টেলিফোনে শুনেছেন 'আমাদের সরকারের' গুণকীর্তন। এই তথাকথিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কীসের মূল্যে সেটা আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আমরা বিভিন্ন নিরপেক্ষ সংবাদপত্র থেকে কিছু সংবাদ পরিবেশন করছি।

সাম্প্রদায়িকতাহীন পশ্চিমবঙ্গের কথা

✻ জয়ন্ত ঘোষাল, নিউ দিল্লী, ১১ই মার্চ ১৯৯৯, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আর.ডি.এক্সের গুদাম বানিয়ে ফেলেছে পাক গোয়েন্দা বাহিনী আই.এস.আই। আর.ডি.এক্স ছাড়াও জিলেটিন স্টীক ও অন্যান্য ধরনের বিস্ফোরক পদার্থও রাজ্যের জেলাগুলিতে ভরে গিয়েছে। ..... কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্টে আরও জানা যাচ্ছে জামায়েত ইসলামীর মত কিছু মৌলবাদী সংগঠন মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ও নদীয়ায় তাদের কাজকর্ম ছড়িয়ে দিয়েছে। রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গে বহু মাদ্রাসায় সরাসরি ইসলামিক মৌলবাদীরা তাদের ভাবাদর্শ প্রচার করছে। কোটি কোটি টাকা ঢালা হচ্ছে এসব মাদ্রাসায়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বক্তব্য, গোটা দেশেই পাক গোয়েন্দা বাহিনী সক্রিয়। পশ্চিমবঙ্গে আজ হটাৎ নয়, বহুদিন থেকেই এরা সক্রিয়। ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত যখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন তখনও এইসব রিপোর্ট এসেছে। তখনও তিনি প্রকাশ্যে না বললেও গোপনে বার বার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সতর্ক করেন। কিন্তু তাতে রাজ্য সরকার কর্ণপাত করেন নি। এখন রাজ্যে অনুপ্রবেশকারী ভরে যাওয়াতে রাজ্য সরকার আশঙ্কা করছে হটাৎ কোনও ঘটনা আই.এস.আই কলকাতায় না করে বসে। এজন্য হটাৎই জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কলকাতায় আই এস.আই এর কার্যকলাপ স্বীকার করতে শুরু করেছেন।

✻ *বর্তমান*, নিজস্ব প্রতিনিধি, ১১.৩.৯৯, বেশ কিছু মৌলবাদী দল এবং তাদের সহযোগী সংস্থা এ রাজ্যে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে বামফ্রন্টের শরিক সি.পি.আই-এর মুখপত্র *কালান্তর* এ অভিযোগ করা হয়েছে। বুধবারের *কালান্তর*-এ "রাজ্য মুসলিম মৌলবাদী *সংগঠনের তৎপরতা বাড়ছে*" শীর্ষক এক প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, বিভিন্ন মৌলবাদী দলের সহযোগী ছাত্র সংগঠনও সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে প্রচার চালাচ্ছে। বস্তুতঃ সি.পি.আই-এর এই দৈনিক মুখপত্রে রাজ্যে মুসলিম মৌলবাদী সংগঠন এবং আই.এস.আই-এর তৎপরতা নিয়ে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বামফ্রন্টের একটি শরিক দলের মুখপত্রে এই খবরে রাজনৈতিক মহলে রীতিমত চাঞ্চল্য পড়ে গেছে। *কালান্তর* এর এই

প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, মুসলিম মৌলবাদী দলগুলি তাদের কর্মতৎপরতার জন্য রাজ্যের বিশেষ কয়েকটি জেলাকে বেছে নিয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং নদীয়া। এইসব জেলায় সীমান্তের ওপার থেকে বাংলাদেশী মৌলবাদীদের মাধ্যমে আই.এস.আই তাদের নেটওয়ার্ক পরিচালনা করছে। এই নেটওয়ার্ক পরিচালিত করতে মুসলিমদের বিভিন্ন মেলা, উৎসব, সমাবেশ প্রভৃতিতে নিজেদের এজেন্টদের যেমন সক্রিয় রাখছে, তেমনই একেবারে শুরু থেকে মুসলিম শিশুমনকে সাম্প্রদায়িক করে গড়ে তুলতে বেসরকারী মাদ্রাসা, মক্তবের সংখ্যাও বাড়াচ্ছে। এ ব্যাপারে বেশ কিছু এন.জি.ও রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় সক্রিয়। সি.পি.আই-এর মুখপত্রে আরও লেখা হয়েছে, বীরভূমের সদর সিউড়ির কাছে মৌলবাদী মুসলিম সংগঠন *জামাত-ই-ইসলাম* সংখ্যালঘুদের জন্য দুটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় তৈরী করেছে। আফগানিস্তানের মৌলবাদী সংগঠন তালিবানের এক নেতা এই বিদ্যালয় দুটির দ্বারোদ্ঘাটন করেছে। এমনকি জেলার আহমদবাজারে তারা ৩-৪ টি মিটিংও করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। *কালান্তর* লিখছে, "দিন কয়েক আগে হুগলী জেলার ফুরফুরা শরীফে তিনদিনের উরস উৎসব হয়ে গেল। এই উৎসবে মুসলিম মৌলবাদী দলের এজেন্টরা বহু আপত্তিকর ও উদ্দেশ্যমূলক পুস্তক, লিফলেট বিলি করেছে। বাংলা, হিন্দী ও উর্দূভাষায় এগুলি ছাপা হয়েছিল।"

সি.পি.আই এর মুখপত্র লিখছে, "মুসলিম মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলি ইদানীং তাদের প্রচারের ধরন-ধারণ বেশ কিছু পরিবর্তন করেছে। এখন তারা নীচের তলায় বসবাসকারী দরিদ্র মুসলিমদের মনোজগতকে পরিবর্তন করার কাজে লিপ্ত। এ কাজে তারা মুসলিমদের সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয় অর্থাৎ কোরানকে হাতিয়ার করেছে। এ রাজ্যে তারা কোরানের উদ্দেশ্য প্রণোদিত বাংলা ব্যাখ্যা প্রকাশ করে নিজেদের স্বার্থে ইসলাম কে ব্যবহার করছে বলে বহু মুসলিম ও হিন্দু শিক্ষিত বিদ্বৎজনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।" *কালান্তর* এর ভাষায়, সদ্য সমাপ্ত কলকাতা বই মেলায় এমন অনেক স্টলের সন্ধান পাওয়া গেছে, যেখানে এই ধরনের কোরান ছিল। এ কাজে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তা আই.এস.আই যোগাচ্ছে বলে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক বাংলাদেশের এক প্রকাশন সংস্থা অভিযোগ করেছে।"

"*কালান্তর* এ লেখা হয়েছে, সম্প্রতি *জামাত-ই-হিন্দ* নামে এক মৌলবাদী সংস্থার অসম ও বাংলার রাজ্য সম্মেলন হয়ে গেল বহরমপুরে। সেখানে আগামী পরিকল্পনার ছক কষা হয়েছে বলে গোপন সুত্রে খবর পাওয়া গেছে। বহু মৌলবাদী সংগঠন ওই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করে। সেখানে বহু উত্তেজক কথাবার্তা হয়েছে। এইসব মৌলবাদী সংগঠন বাংলাদেশের শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে এ দেশের সংখ্যালঘুদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাচ্ছে। এখন কথা হচ্ছে, এই মৌলবাদীদের কারা অর্থ সাহায্য করছে। এই বিষয়ে আই. এস. আই-র নাম যেমন চলে আসে, পাশাপাশি বিভিন্ন এন.জি.ও-র মাধ্যমে আরবি অর্থের অনুপ্রবেশ এ রাজ্যে ঘটছে।

* বর্তমান, ১১.৩.৯৯, নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যে যে মৌলবাদী তৎপরতা ক্রমশঃ বাড়ছে,

রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তা স্বীকার করে নিলেন। বুধবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বুদ্ধবাবু বলেন, অনুপ্রবেশকারীদের মাধ্যমে বিভিন্ন বিদেশী মৌলবাদী শক্তি রাজ্যে সক্রিয় হচ্ছে। ওইসব অনুপ্রবেশকারীর মাধ্যমে মৌলবাদী সংগঠনগুলি সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে তো বটেই, এমনকি কলকাতাতেও আসছে। পুলিশমন্ত্রী বলেন, আমরা অনেক অনুপ্রবেশকারীকেই চিহ্নিত করেছি। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি। তবে এ ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নিচ্ছি তা এখন বলবো না।

পুলিশমন্ত্রী বলেন অনুপ্রবেশকারীরা বিদেশী মৌলবাদী শক্তির এজেন্ট হিসাবে কাজ করলে নিশ্চয়ই তা উদ্বেগের বিষয়।

*** সীমান্তপারের দূর্বৃত্তরা নদীয়ার সর্বেসর্বা**, সন্তোষ বিশ্বাস, স্টেটস্‌ম্যান নিউজ সার্ভিস, করিমপুর (নদীয়া) ২৪শে আগস্ট, ১৯৯৯, নদীয়ার করিমপুর থানার অধীন বাঙলাদেশ সীমান্তের গ্রামগুলির বহু বাসিন্দা আন্তঃসীমান্ত দুর্বৃত্তদের সন্ত্রাসের ফলে গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছেন। সেই সব জায়গায় বাঙলাদেশী নাগরিকেরা বাস করছে এবং তাদের ছেড়ে যাওয়া জমি চাষ করছে। এমন অভিযোগ করেছেন কিছু লোক যাঁরা ঐসব গ্রাম ছেড়ে এসেছেন। স্থানীয় প্রশাসন ঐ সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য কিছুই করছেন না এবং ঐ অঞ্চলে জঙ্গলের রাজত্ব চলছে, এমনই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এক সমাজসেবী আরতি সাহা শুধালেন, মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য এখানে সত্যকারের কোনও প্রশাসন আছে কি? শ্রীমতি সাহা সীমান্ত গ্রাম ভারেল ছেড়ে করিমপুরে বাস করছেন। আন্তঃসীমান্ত দুর্বৃত্তরা দাঙ্গা, খুন, ডাকাতি, ধর্ষণ সবই চালায় এবং গরু চুরি হচ্ছে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, তিনি জানালেন। প্রাথমিক শিক্ষক মনোরঞ্জন সরকার নিজের চেচেনিয়া গ্রামের বাস ছেড়ে এখন কুমারী গ্রামে বাস করছেন। তিনি বললেন, পরিস্থিতি খুবই খারাপ। করিমপুরের সি.পি.এম বিধায়ক কয়েক বছর আগে ব্যাপারটি বিধানসভায় তুলেছিলেন, কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি। সম্প্রতি সপ্তম শ্রেণীর একটি ছেলে ডাকাতদের দ্বারা প্রহৃত হওয়ার পরে বাঙলাদেশ সীমান্তের রসিকপুর কলোনী থেকে ৩০ টির মত পরিবার অন্যত্র চলে গেছে। কিছুদিন আগে গন্ধরাজপুরের ১১ টি পরিবার গ্রামত্যাগ করেছে। একইভাবে নিজেদের বাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে বিক্রমপুরের ১৫ টি পরিবার, কৈলাশনগরের ১০ টি পরিবার, হোটপাড়ার ২৭ টি পরিবার। আগেই রসিকপুরের সমস্ত অধিবাসী পৈতৃক ভিটে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। রসিকপুরের বর্তমান অধিবাসীরা বাঙলাদেশ থেকে আগত অনুপ্রবেশকারী। কাছারীপাড়া গ্রামের পূর্ব অংশের অধিবাসীদের গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে এবং তাদের ধানজমি চাষ করছে বাঙলাদেশের চাষীরা। শিকারপুরের অধিবাসী রমেন মিত্র জানালেন নিউ শিকারপুরে বাঙলাদেশের চাষীরা ভাগচাষ করছে।

*** ফরোয়ার্ড ব্লক মুসলিমদের জন্য কোটা চায়**, স্টেটস্‌ম্যান নিউজ সার্ভিস, ৫ ই মার্চ, ১৯৯৯ ফরোয়ার্ড ব্লক মুসলমানদের জন্য কোটা দাবী করে বামফ্রন্টের দলগুলিতে অস্বস্তি সৃষ্টি করেছে। ফরোয়ার্ড ব্লকের কলিমুদ্দিন স্যামসের এই দাবীতে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু অসন্তোষ

প্রকাশ করেছেন।

* আগুন নিয়ে খেলা, *সি.পি.এমের সংকীর্ণ দৃষ্টি এবং অনুপ্রবেশ*, সম্পাদকীয়, *দি স্টেটসম্যান*, ২১.৫.৯৯: যদি গত সপ্তাহে শিয়ালদহমুখী বনগাঁ লোকালের যাত্রীরা সতর্ক দৃষ্টি না রাখতেন তাহলে পুলিস কর্তৃক ধৃত ৫৮ বাঙলাদেশী পৌঁছে যেত তাদের গন্তব্যস্থলে। বারাসত পুলিশ নিজে থেকে এইসব বাঙলাদেশীদের কখনই ধরতো না। তারা জানে এইসব অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রভৃতি বাম ফ্রন্টের বিশাল নেতাদের সহানুভূতির কথা। কারণ, তারা বাম ভোটব্যাঙ্কের ওজন বাড়ায়। বারবার জ্যোতি বসু অনুপ্রবেশ সমস্যাকে অস্তিত্বহীন বলেছেন। একদা তিনি এই পত্রিকার অনুপ্রবেশের আকার ও প্রকারের গুরুত্ব সংক্রান্ত ধারাবাহিক রচনাকে "ভিত্তিহীন, অত্যন্ত দায়িত্বহীন" এবং পত্রিকার উর্বর মস্তিষ্কের উৎপাদন" বলেছিলেন।

গতবছরে দমদম লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর কাছে বামপ্রার্থীর পরাজয়ের পরে অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি সহানুভূতি যখন ব্যুমেরাং বলে প্রমাণিত হলো, তখন বামফ্রন্ট সরকার সমস্যাটি সম্বন্ধে সচেতন হলেন। তারা দেখলেন হিন্দু অনুপ্রবেশকারীরা বিজেপিকে ভোট দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সীমান্ত জেলার ৫০ হাজার অনুপ্রবেশকারীর নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ গেল। বুদ্ধদেব অনুপ্রবেশের জন্য কেন্দ্রকেই দায়ী করলেন; কেন্দ্র সীমান্ত সুরক্ষিত করেনা। অভিযোগের কিছুটা যৌক্তিকতা থাকলেও তাঁর দলের পঞ্চায়েৎ সদস্যরা অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার লিস্টে নাম ঢুকিয়ে কীভাবে টাকা কামায় তা কি তিনি জানেন না? এমনকি ঢাকা থেকে পলাতক এরশাদের মন্ত্রীকে টাকা পয়সা সমেত এ দেশে ব্যবস্যা করতে দেওয়া হচ্ছে। সংকীর্ণদৃষ্টির মার্ক্সবাদীরা সর্বদা দেশকে অপরাধী ও অবাঞ্ছিত লোকদের নিরাপদ স্বর্গ বানিয়ে রেখেছে।

* **বৃহত্তর বাঙলাদেশ তৈরীর ষড়যন্ত্র**, *বর্তমান*, সম্পাদকীয়,২৫.১.৯৯, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সূত্র থেকে আসা তথ্য ও আসামের রাজ্যপালের সাম্প্রতিক রিপোর্ট থেকে এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত মিলেছে। 'বৃহত্তর বাঙলাদেশ' তৈরীর জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। অসম ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী বহু এলাকা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা রীতিমত দখল করে নিয়েছে। নিম্ন অসমের কয়েকটি জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এলাকার কয়েকটি দ্বীপ এখন বাংলাদেশী মৌলবাদীদের কব্জায়। অসমের উদ্বিগ্ন রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস. কে. সিনহা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন গত ১৬ই ডিসেম্বর। বলা বাহুল্য পশ্চিমবঙ্গের বাম ফ্রন্ট সরকার এ ব্যাপারে আগাগোড়াই চুপ।

দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নাকের ডগায় এই অনুপ্রবেশ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্র ফলাও ভাবে চলছে। জম্বুদ্বীপ সংরক্ষিত বনাঞ্চল। পাশাপাশি অন্যান্য দ্বীপগুলিতেও বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়না। অথচ বাংলাদেশীরা সেসব দ্বীপ দখল করে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। সবটাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জ্ঞাতসারে। কারণ, রাজ্যের

বনমন্ত্রী যোগেশ বর্মন নাকি স্বীকার করেছেন যে এইসব দ্বীপে বেআইনী ক্রিয়াকলাপ চলে।

* অসমের রাজ্যপালের রিপোর্ট: *অনুপ্রবেশ রুখতে সীমান্ত সীল করে দেওয়া হোক:* নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লী, ৭ই ফেব্রুয়ারী, *বর্তমান,* অসমের রাজ্যপাল অনুপ্রবেশের ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকা ও দলীয় রাজনীতির কড়া নিন্দা করেছেন। আবার কেন্দ্রের রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গেই অনুপ্রবেশ সবচেয়ে বেশী। অসমের রাজ্যপাল লিখেছেন, সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে বাংলাদেশী বিতাড়ন নিয়ে কলকাতায় অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। লোকসভা অচল করা হয়েছে, বাংলাদেশের সংবাদ পত্রে লেখা হয়েছে যে এসব কাজ করেছে 'হিন্দু মৌলবাদী সরকার'। রাজ্যপাল বলেছেন, বাংলাদেশের একটি সংবাদপত্র এ ঘটনার জন্য মার্কিন সাহায্য চাইতেও পরামর্শ দেয়। রাজ্যপালের রিপোর্টে কিন্তু বলা হয়েছে মহারাষ্ট্রে বাংলাদেশী বিতাড়ন নতুন কিছু নয়। ৯৩ সালে ৪৮৯৫, ৯৪ সালে ৫৭৮২, ৯৫ সালে ৩৬১২, ৯৬ সালে ২৭৯১, ৯৭ সালে ৪২২২ এবং ৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ১৫৯৭ জন বাংলাদেশীকে বিতাড়ন করা হয়েছে। এতদিন ধরে এই কাজ হলেও রাজ্যসরকার আজ হটাৎ এটা নিয়ে হইচই বাধাল কেন সে প্রশ্ন রাজ্যপালের।

'৯৭ সালের ৬ই মে লোকসভায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্তও বলেছিলেন, যে এদেশে এক কোটি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী আছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও অসমের রাজ্যপালের রিপোর্ট থেকে এটাও জানা যাচ্ছে এদেশে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে মুসলিম জনসংখ্যার হার অস্বাভাবিক। অসমের রাজ্যপালের রিপোর্টে বলা হয়েছে ৭১ থেকে ৯১ সনে মুসলিম জনসংখ্যার সর্বভারতীয় বৃদ্ধির হার ছিল ৫৫.০৪ শতাংশ। সেখানে অসমেই ওই সময়ে বৃদ্ধির হার শতকরা ৭৭.৪২। অথচ ৬১ থেকে ৭১ সালে অসমে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৩০.৯৯। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও ওই সময় মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল ৩০.৮৫। এভাবে অসমের চারটি জেলাতে মুসলিমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেছে। এই চারটি জেলা হলো ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া, বরপেটা, হাইলাকান্দি।

উল্লিখিত সব কটি সংবাদই শুধুমাত্র ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দের। অর্থাৎ, ভাসমান হিমশৈলের চূড়া মাত্র। এই সংবাদগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, সরকার ও শাসক দলগুলির মদতে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বহু মানুষ এ দেশে অনুপ্রবেশ করেছে। এদের বেশী ভাগই মুসলমান। এরা ভারতের ধর্ম-সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। যেহেতু এরা ভারতের নাগরিক নয়, সেহেতু দেশের প্রতি এদের কোনও আনুগত্য নেই। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের সীমানার প্রসারণ। দেশভাগের ইতিহাসটা আমাদের জানা আছে। শ্রীহট্ট কীভাবে পাকিস্তানে গেল তাও সবাই ভোলেনি। এই অনুপ্রবেশকারীরা পশ্চিমবঙ্গের সীমানা বরাবর একটা বিস্তৃত অঞ্চলে নিজেদের সংহত করছে। করিমপুরের মত বহু অঞ্চলেই সেখানকার সাবেক অধিবাসীরা ব্যাপক সন্ত্রাসের সম্মুখীন হয়ে পৈতৃক ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে এবং যাচ্ছে। সে যায়গার দখল নিচ্ছে বাংলাদেশীরা। সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে জম্বুদ্বীপ

অধিকার করে রেখেছে বাংলাদেশীরা। সেখানে বন কেটে তারা মাছের চাষ করছে। সীমান্ত বরাবর গড়ে উঠেছে নানা মাদ্রাসা ও মসজিদ। সেই সব মাদ্রাসা মসজিদে আশ্রয় পায় দুনিয়ার ইসলামী মৌলবাদীরা। তারা হিন্দুবিরোধী জেহাদের তত্ত্ব শেখায় নতুন প্রজন্মের মুসলমানদের। সন্ত্রাসবাদীরা প্রয়োজনমত আশ্রয় পায় এইসব মসজিদ মাদ্রাসায়। তারা বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায় গ্রাম বাংলায়। তারা হিন্দুবিরোধী ও দেশবিরোধী নানা উত্তেজক সাহিত্য পরিবেশন করে গ্রাম বাংলায়, ফলে গ্রাম বাংলার সাম্প্রদায়িক পরিমন্ডল ক্রমাগত বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। মুসলিম উগ্রপন্থীদের সংগঠনে ছেয়ে গেছে গ্রাম বাঙলা।

৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের বিজেপি শিবসেনা সরকার কিছু বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত দিয়ে পুশব্যাক করতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের সরকার, রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবির দল বাঙালীত্বের আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে বলেন, যাদের অনুপ্রবেশকারী বলা হচ্ছে তারা আসলে বাঙালী, মারাঠী সরকার তাদের বিদেশী বলে মহারাষ্ট্র থেকে বিতাড়ন করছে। এক বামপন্থী এম.এল.এ উলুবেড়িয়ায় মহারাষ্ট্র পুলিশের হাত থেকে অনুপ্রবেশকারীদের ছিনিয়েও নেয়। পরে ঐ অনুপ্রবেশকারীদের এক জনকেও তাদের ঠিকানায় পাওয়া যায়নি। পশ্চিমবঙ্গের যাদের 'শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক' বলা হয় তারা সবাই ঐ অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষ নিয়েছিল। এমনকি *দেশ* পত্রিকাও ঐ অনুপ্রবেশকারীদের সপক্ষে লিখেছিল। কিন্তু উপরোক্ত সংবাদ থেকে স্পষ্ট মহারাষ্ট্র সরকারের ঐ পদক্ষেপ ছিল ন্যায়সঙ্গত। দোষ ছিল একটাই, সরকারটা শিবসেনা-বিজেপির।

সুতরাং মহাশ্বেতা দেবী, পশ্চিমবঙ্গের যে সাম্প্রদায়িকতাহীন পরিমন্ডলের জন্য আপনি গর্ববোধ করছেন, তার ভিত্তি দেশদ্রোহিতা, বে-আইনী অনুপ্রবেশকে সাহায্যদান, হিন্দুদের দেশের মধ্যেই উদ্বাস্তু করা, সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের সীমান্তকে প্রসারণ করায় মদতদান, সরকারী অর্থে মাদ্রাসার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক শিক্ষার প্রসার, ইত্যাদি কুকর্ম। এইসব কুকর্মের বিষময় ফল এখনই ফলতে আরম্ভ করেছে। ভবিষ্যতে এই সীমান্ত রাজ্য অগ্নিগর্ভ হয়ে আর এক কাশ্মীরের সৃষ্টি হবে। সেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃজনে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে আপনাদের গৌরবজনক অবদান। কারণ, আপনারা সংখ্যালঘুদের এসব ক্রিয়াকর্মের কোনও প্রতিবাদ করেন না, কিন্তু সর্বদাই দুর্বৃত্তরূপে অভিক্ষেপ করেন হিন্দুদের।

এবার মহাশ্বেতা দেবী, গোধরা কান্ডের ঠিক আগে ঘটা মাদ্রাসা বিতর্কের কথা স্মরণ করা যাক। ব্যাপারটা এই সাম্প্রদায়িকতাহীন পশ্চিমবঙ্গের। আগেই ৯৯ অব্দের *কালান্তর* থেকে আমরা জেনেছি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অননুমোদিত মক্তব-মাদ্রাসর সংখ্যা বেড়ে গেছে। এ ব্যাপারে কিছু এন.জি.ও সীমান্তবর্তী এলাকায় সক্রিয়। এইসব মক্তব মাদ্রাসার মাধ্যমে ইসলামী মৌলবাদ ছড়ানো হচ্ছে।

২৫.১২.২০০১ তারিখের *স্টেটসম্যানে* প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের শিরোনাম : **ইনটেলিজেন্স বিভাগের কড়া নিরীক্ষায় সীমান্তের মসজিদগুলি**, *রাজ্যের ইনটেলিজেন্স বিভাগ জানাচ্ছে যে বাঙলাদেশ সীমান্তের বহু মাদ্রাসা মসজিদ গোপন সভা ও ভারতবিরোধী মানসিকতা*

প্রচারের পীঠ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, ২৪ শে ডিসেম্বর, রাজ্যের ইনটেলিজেন্স বিভাগ সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে দাবী করেছে যে দুই চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া ও বর্ধমানের মাদ্রাসা ও মসজিদগুলি ভারতবিরোধী প্রচারের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বিদেশীরা এই দেশের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে বাঙলাদেশ সীমান্তের এইসব মসজিদ মাদ্রাসায় গোপন মিটিং করে এবং ভারতবিরোধী প্রচার করে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে বিগত কয়েকমাস ধরে এই ধরনের কাজকর্ম বেড়েছে।

গত বছরে ইনটেলিজেন্স বিভাগ মুখ্যমন্ত্রীকে জানান বাঙলাদেশের কিছু ধর্মীয় শিক্ষক ও মসজিদের ইমাম এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ভারতবিরোধী ধর্ম-উপদেশ দিচ্ছে। এইসমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি দক্ষিণবঙ্গের সীমান্ত বরাবর অবস্থিত। ইনটেলিজেন্স অফিসারদের মত এই ধরনের ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণ জেহাদী মানসিকতার সৃষ্টি করবে।

সাহাবুদ্দিনের *মুসলিম ইন্ডিয়ার* মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত এক সংবাদে (*দি হিন্দুস্থান টাইমস* ভিত্তিক) লেখা হয়েছেঃ ইন্টালিজেন্স ব্যুরোর এক প্রতিবেদনে, যে প্রতিবেদনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও অংশ আছে, ভারত বাংলাদেশ ও ভারত নেপাল সীমান্ত বরাবর ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা মাদ্রাসাগুলির উপর কিছু আলোকপাত করেছে। ঐ আই.বি প্রতিবেদন পশ্চিমবঙ্গের দশটি জেলায় ২০৮ টি মাদ্রাসা ও ৪৫৮ টি মসজিদ শনাক্ত করেছে।

জেলা	মসজিদ	মাদ্রাসা
দার্জিলিং	১৫	১১
জলপাইগুড়ি	৩৫	২৩
উত্তর দিনাজপুর	৩৩	৩৪
মালদা	১৭২	৫৫
মুর্শিদাবাদ	৪০	২০
নদীয়া	২৯	১৫
উত্তর ২৪ পরগণা	২৪	১৮
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	১০	৪

আই.বি র তথ্য অনুযায়ী প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মাদ্রাসা-মসজিদগুলি জেড্ডার ইসলামিক ব্যাঙ্কের সহায়তায় নির্মিত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যেহেতু আগে পুলিশ-মন্ত্রী ছিলেন, গোটা ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। ১৯শে জানুয়ারী অত্যন্ত সততার সঙ্গে তিনি উচ্চারণ করলেন অনুমোদনহীন মাদ্রাসাগুলি সম্পর্কে কিছু জ্বলন্ত সত্য: বাঙলাদেশের মাধ্যমে উপসাগরের পেট্রো ডলার আসছে এইসব প্রতিষ্ঠানে। পরের দিন *গণশক্তি* সমেত সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি। পরের দিন মুখ্যমন্ত্রী বললেন তাঁর কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে যে মাদ্রাসাগুলি থেকে জাতীয়তাবিরোধী প্রচার চলে। ২৮ শে জানুয়ারী অনিল বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করলেন। তিনি বললেন, পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসার সংখ্যা বাঙলাদেশের থেকে বেশী।

কিছু অনুমোদনহীন মাদ্রাসা প্রায়ই জাতীয়তাবিরোধী প্রচার করে।

বুদ্ধদেবের এ হেন উচ্চারণ ঘা দিল ভীমরুলের চাকে। নানা প্রকারের মুসলিম মৌলবাদীরা রে রে করে উঠলো। মসজিদের ইমামরা এক শুক্রবারে জুম্মার নামাজের শেষে উত্তেজক বক্তৃতা দিলেন বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে। সুযোগ বুঝে ময়দানে নামলো মুসলিম মৌলবাদের চিরকালের উসকানী দাতা, দেশভাগের হোতা ও কাশ্মীর সমস্যার সৃষ্টিকর্তা কংগ্রেস। ছিন্নমূল , বাহুমূল ইত্যাদি নানা রঙের কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি দাবী করলো, জাতীয়তাবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত মাদ্রাসাগুলি সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে। এবং এ সম্পর্কে সর্বদলীয় কমিটির কাছে সরকারের অবস্থান জানাতে হবে। লোকসভায় কংগ্রেসের চীফ হুইপ প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী বললেন, অননুমদিত মাদ্রাসা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের ফলে গ্রামাঞ্চলের মুসলমানরা মনে নিরাপত্তাহীন বোধ করছেন। দাসমুন্সী আরও বললেন, হিন্দু মৌলবাদী গ্রুপ এবং আই.এস.আই মুসলমানদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। দেশের একতা এবং অখন্ডতা রক্ষা করা যাবেনা যদি কোটি কোটি মুসলমানদের অবিশ্বাস করা হয়।

প্রশ্নটা কোটি কোটি মুসলমানদের অবিশ্বাস করা নয়, কিছু কিছু মুসলিম মৌলবাদীদের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে, যা ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দেই লিখেছে *কালান্তর*। কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ সীমান্তের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা হয়েছে ২০৮ টি আর মসজিদ তৈরী হয়েছে ৪৫৮ টি। এর মধ্যে ১২৫ টি মাদ্রাসাকে বেআইনী ও সন্দেহজনক বলে চিহ্নিত করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। বিগত লোকসভার নির্বাচনে দেখা যায় কংগ্রেস সাফল্যলাভ করেছে শুধুমাত্র মধ্য ও উত্তর বঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে। সেই মুসলিম ভোট অক্ষুন্ন ও বর্ধমান রাখার জন্য প্রিয়রঞ্জনদের এ হেন উচ্চারণ।

এখন কংগ্রেস কীভাবে মুসলমানদের আস্থা অর্জন করেছে সেটা দেখা যাক, তাহলেই প্রিয়রঞ্জনদের অবস্থান পরিষ্কার হবে। কংগ্রেস সরকার অসমে একটা আইন চালু করেছে। সেই আজব আইনে বলা হয়েছে কারও নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে সরকারকে, নাগরিককে নয়। এই আইনের বলে অসম বাঙলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুপ্রবেশকারীদের দায়িত্ব নেই নিজেদের নাগরিকত্বের প্রমাণ দেওয়ার। সরকারকেই প্রমাণ করতে হবে যে সে অনুপ্রবেশকারী। আপনার বাড়ীতে ঢুকে একজন দাবী করলো সে আপনার আত্মীয়, আপনারই বাড়ীর লোক। এখন আপনাকে তার বাপ-ঠাকুরদার নাম খুঁজে বের করে প্রমাণ করতে হবে সে আপনার আত্মীয় নয়। বুঝুন ব্যাপারটা! বস্তুতঃ অসমে একজন অনুপ্রবেশকারীকে অনুপ্রবেশকারী বলে প্রমাণ করার জন্য লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়। কারণ, অনুপ্রবেশকারীর বাপ-পিতামহর নাম-ধাম প্রমাণ করতে হয় সরকারকেই। পৃথিবীর কোনও দেশেই এই ধরনের আজব আইন চালু নেই। বিদেশী অনুপ্রবেশকারীর দেশের প্রতি আনুগত্য থাকেনা। তারা বিদেশী সরকারের হয়ে দেশের নিরাপত্তার হানি করতে পারে এবং করেও। বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করা দেশদ্রোহের নামান্তর। প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীদের কংগ্রেস আইন করে তাই করেছে। আগেই আমরা জেনেছি কীরকম অস্বাভাবিকভাবে অসমের মুসলিম

সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধি অনুপ্রবেশ দ্বারাই ঘটেছে। আইনের সাহায্যে প্রতিবেশী শরিয়তী রাষ্ট্র থেকে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দেশের গণমানচিত্র পাল্টে দেবার কাজে লিপ্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। সুতরাং কংগ্রেস যে ইমাম-মৌলভী আর মৌলবাদীদের সমস্বরে বুদ্ধদেবকে গালি দেবে এতে আর আশ্চর্য কী! নিখাদ কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা ব্যানার্জীও দাবী করলেন সরকারের শ্বেতপত্র। তাদের সঙ্গে গলা মেলালেন অশীতিপর সিদ্ধার্থ রায়। প্রণব মুখার্জী বললেন, বুদ্ধদেবের অভিযোগের প্রমাণ চাই। ফুরফুরা শরীফের পীরের আশীর্বাদ নিয়ে যিনি রাজনীতি করেন, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবী করলেন শ্বেতপত্র। অতীতে এই ফুরপুরা শরীফের পীররা ছিলেন পাকিস্তান দাবীর কট্টোর সমর্থক। *কালান্তরের* প্রতিবেদনে আমরা দেখেছি এই ফুরফুরা শরীফের উরস উৎসবে যাবতীয় মৌলবাদী প্রচার হয়।

অপরাধ প্রমাণিত কখন হয়? অপরাধ সংঘটিত হবার পর অপরাধী বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে বা নিছক সন্দেহক্রমে পুলিশ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে। এরপর জিজ্ঞাসাবাদ হয়, সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করার চেষ্টা করে পুলিশ। তারপর যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে পুলিশ আদালতে মামলা দায়ের করে। বিচারক অপরাধীর অপরাধ সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হলেই তবে দন্ড বিধান করেন। সুতরাং পুলিশ কখনই সমস্ত প্রমাণ হাতে নিয়ে কাউকে গ্রেপ্তার করেনা। প্রমাণ হাতে নিয়ে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারটা ঘোড়ার আগে গাড়ী জোতার মত। ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি করার জন্যই আগে ভাগে প্রমাণ চেয়েছিল নানা রঙের কংগ্রেস।

আমাদের বুদ্ধিজীবিরা কিন্তু কংগ্রেসের এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবের পাশে এসে দাঁড়ালেন না। তাঁরা কেউই বললেন না যে এটা রাজনীতির বিষয় নয়। বুদ্ধদেব সামগ্রিকভাবে মুসলিম বিরোধী নন, বস্তুতঃপক্ষে আমরা কেউই সামগ্রিকভাবে মুসলিম বিরোধী নই। কারণ, কেউ মুসলমানের ঘরে জন্মে কোনও অপরাধ করেন না। অনেকেই কোরান হাদিস পড়েন না। নমাজ পড়েন কোরানের বাক্যাবলীর অর্থ না জেনেই। পিতৃপুরুষের রীতি অনুযায়ী রোজা পালন করেন। ঈদ-উল-ফিতরের সময় নতুন জামা কাপড় পড়েন, সাধ্যমত জাকাত দেন। ঈদ-উদ-জ্জোহার সময় কুরবানী করেন। মৌলবাদীরাই কোরান-হাদিস পড়ে কপিবুক স্টাইলে ইসলামকে কাজে লাগায়। মসজিদ থেকে প্ররোচনা দিয়ে সবরমতী এক্সপ্রেসের বগীতে আগুন লাগায়। সুরু হয়ে যায় প্রতি-হননক্রিয়া। মারা যান এহসান জাফরীরা।

যাই হোক, একদিকে মুসলিম মৌলবাদীদের চাপে, অন্যদিকে রাজনৈতিক চাপে বুদ্ধদেবকে পিছু হটতে হলো। কারণ, সংখ্যালঘু ভোট তাঁদেরও দরকার। ৬ ই ফেব্রুয়ারী বুদ্ধদেব নিজের বাক্য অস্বীকার করলেন। যদিও ১৯শে জানুয়ারী থেকে ৬ ই ফেব্রুয়ারী সময়টা অত্যন্ত দীর্ঘ। ঐতিহাসিক বিচারে বুদ্ধদেবের ৬ ই ফেব্রুয়ারীর বক্তব্য গ্রাহ্য নয়। কারণ, তা চাপে পড়ে দেওয়া। সুতরাং, ১৯শে জানুয়ারীর বক্তব্যই সঠিক। আমরা ১৯৯৯ অব্দের *কালান্তর* পত্রিকার অভিযোগ আগেই জেনেছি। জেনেছি বুদ্ধদেবের তখনকার বক্তব্যও। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি বুদ্ধদেবের অভিযোগের সম্পূর্ণ যৌক্তিকতা আছে। যদি বুদ্ধদেবকে খোলাহাতে এ ব্যাপারে সমর্থন করা হতো, তাহলে তিনি অবশ্যই অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হতেন।

তিনি যখন নিজের বক্তব্য থেকে রাজনৈতিক কারণে, সরে আসতে বাধ্য হলেন তখন উর্দূ সংবাদ পত্রগুলিতে লেখা হলো:

"সি.পি.এম এর প্রতি মুসলমানদের প্রচন্ড ভরসা। গত ২৫ বছরে এই ভরসা তৈরী করেছেন জ্যোতি বসু ও পার্টির অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ নেতারা। ১৫ দিনেই এই ভরসায় জল ঢেলে দেওয়া হলো। এখন তালি-তাপ্পি দেওয়া হচ্ছে। বুদ্ধদেবতো প্রথম দিনেই নিজের বয়ান অস্বীকার করতে পারতেন। কিন্তু তা হয়নি। বোধহয় আলিমুদ্দিনের কর্তারা দেখতে চাইছিলেন, মাদ্রাসা নিছে বিতর্ক উসকে দিয়ে এবং মুসলমানদের মাথায় আই. এস. আই এজেন্টের তকমা এঁটে দিলে মুসলিমরা কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখায়। ওঁরা হয়তো ভাবতেই পারেননি মুসলিমরা এতো জোরদার প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।....

"মুসলিমরা দেখিয়ে দিল দেশদ্রোহীতার অপবাদ তারা চুপচাপ সহ্য করবে না। নিজের ধর্মের ব্যাপারে কারও নাক গলানোও তারা বরদাস্ত করবে না।" (আজাদ হিন্দ)

" সত্যি বলতে, বুদ্ধদেব তাঁর পূর্বসুরী জ্যোতি বসুর তুলনায় একেবারে বাচ্ছা। জ্যোতি বসুর মধ্যে যে দূরদৃষ্টি ছিল, তার ছিটে ফোঁটাও বুদ্ধদেবের মধ্যে নেই। তাঁর একথা ভোলা উচিত নয় যে রাজ্যের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মুসলিম ধর্মাবলম্বী। সাধারণতঃ সব মুসলমানই ধর্মপ্রাণ হয়। ইসলামের শুরু থেকেই মাদ্রাসার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ধর্ম পালনের নানা খুঁটিনাটি বিষয়ও পড়ানো হয়।... এইরকম পরিস্থিতিতে মাদ্রাসাকে সন্ত্রাসবাদ আর দেশ-বিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়ানো খুবই দুঃখজনক। ......রাজ্যের অধিকাংশ ইংরাজী ও বাংলা সংবাদপত্র মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের শুধু প্রশংসা করেই থামেনি, তারা জ্যোতিবাবুরও তীব্র সমালোচনা করে বলেছে, উনি খামোকা মুসলমানদের নানারকম ছুট দিয়েছিলেন। ওঁর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, তিনি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশে মদত দিয়েছেন। তাঁর আমলে আই.এস.আই রাজ্য জুড়ে জাল বিস্তার করেছে। ......রাজ্যের গোয়েন্দা বাহিনীও পুরোপুরি মুসলিম বিরোধিতায় নেমে গেছে। তারা নিজেদের মত রিপোর্ট তৈরী করে বলেছে, উত্তর চব্বিশ পরগণা এবং মুর্শিদাবাদে কিছু মাদ্রাসায় হাওলার টাকা পাঠানো হচ্ছে। .....বুদ্ধদেবের বয়ান থেকে যে কাজিয়া খাড়া হয়েছিল তার মোকাবিলা করেছে মুসলিম সমাজ। এর জন্য মুসলিম পন্ডিত ও গুণীজনদের ধন্যবাদ।" (আখবার-এ-মশরিক)

আর একজন সম্পাদকের বক্তব্য শোনা যাক: "যা সহজে এড়ানো যেত তা ঘটে গেল গত রবিবার দক্ষিশ চব্বিশ পরগণা জেলা প্রশাসনের অযোগ্যতার জন্য। বড় ধরণের গন্ডোগোল ও পুলিশের বেপরোয়া গুলিবর্ষণের ফলে প্রাণ গেল আঠারো বছরের এক নিরীহ যুবকের। বিগত এক পক্ষকাল ধরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছিল ঐ এলাকায় যেখানে অন্য স্থানের মত হিন্দু ও মুসলমান মৌলবাদীরা সংহত হচ্ছিল ধর্মীয় মানসিকতাকে সম্বল করে। রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সেখানে মৌলবাদীরা তাদের ধর্মীয় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের বাধা দেবার জন্য কি রাজনৈতিক দল কিজেলা প্রশাসন কেউই চেষ্টা করেনি।

তাদের একদেশদর্শীতাই আসলে সাম্প্রদায়িক অগ্নি প্রজ্বালনে সহায়তা করেছে। গুজরাট দাঙ্গার আগেই ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। বাইরে থেকে আনা মুসলিম মৌলভীরা মাইকের দ্বারা উত্তেজক ও প্ররোচনামূলকবক্তৃতা করেনি। তাদের একদেশদর্শীতাই আসলে সাম্প্রদায়িক অগ্নি প্রজ্বালনে সহায়তা করেছে। গুজরাট দাঙ্গার আগেই ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। বাইরে থেকে আনা মুসলিম মৌলভীরা মাইকের দ্বারা উত্তেজক ও প্ররোচনামূলক বক্তৃতা দিয়ে সাম্প্রদায়িক পরিবেশ উত্তপ্ত করে দিয়েছে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে পুলিশ চুপচাপ বসে থেকেছে। হিন্দু মৌলবাদীরা ব্যাপারটার সুযোগ নিয়েছে। তারা যজ্ঞ করে নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা করতে চেয়েছে।"

সুতরাং মহাশ্বেতা দেবী, আপনি যে 'সাম্প্রদায়িকতাহীন' রাজপথের কথা বলছেন সেটা আসলে ইসলামী সাম্প্রদায়িকতায় পরিপূর্ণ এবং তার তলায় বহু বিস্ফোরক পাতা। বিস্ফোরণ ইতিমধ্যেই কিছু ঘটে গেছে। নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে বিস্ফোরণ, খাদিম কান্ড, আমেরিকান সেন্টার--রশিদ কান্ডকে যদি বাদও দিই। ৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২৭ শে ফেব্রুয়ারী, ব্যবধানটা স্বল্পদিনের। সুতরাং যদি কোনও বামপন্থী মনে করেন, 'ব্যাটারা খুব বেড়ে গেছে', তাহলে তাঁকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায়না। কোনও কোনও মানুষ বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করতে পারে, পকেটে হাত দিয়ে চিন্তা না করে।

মহাশ্বেতা দেবী দাবী করেছেন, "অবিলম্বে উগ্র আক্রমণাত্মক, রক্তপিপাসু ও হিংস্র সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করা হোক।"

সংঘপরিবারকে নিষিদ্ধ করা খুবই সোজা। কিন্তু বাকীগুলিকে নিষিদ্ধ করা হলো কি না হলো তাতে কিছু যায় আসে না। কাশ্মীরে এখন জেহাদ চলছে। কেন্দ্রে যে দলই রাজত্ব করুক না কেন, যে সংগঠনকেই নিষিদ্ধ করা হোক না কেন, সেখানে হিন্দুদের কোতল করা চলবেই। বিস্ফোরণ ঘটেছে কোয়াম্বাটুরে, বিস্ফোরণ ঘটেছে মুম্বাইতে, বিস্ফোরণ ঘটেছে নিউ জলপাইগুড়িতে, আক্রান্ত হয়েছে কলকাতার আমেরিকান সেন্টার, এগুলি চলবেই। কারণ, জেহাদ ইসলামের ষষ্ঠ স্তম্ভ। অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। সে কর্তব্য ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পালন করতে দিতেই হবে।

মহাশ্বেতা দেবী, কিছু প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করলেই মানুষের মন থেকে সাম্প্রদায়িকতা দূর হয়ে যায়না। সাম্প্রদায়িকতার জড়টিকে আবিষ্কার করা চাই। সেই জড়টাকে উপড়ে ফেললেই সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ সম্ভব। কিন্তু আপনারা কী করেছেন? হিন্দুদের গায়ে ফ্যাসীবাদী তকমা এঁটে সব কিছুর সমাধান খুঁজছেন। অথচ ফ্যাসিবাদ-নাৎসীবাদ জেহাদ-তত্ত্বের কাছে নিতান্তই দুগ্ধপোষ্য শিশু। কোরানে বলা হয়েছে, "নিষিদ্ধ মাসগুলি অতিবাহিত হলে পৌত্তলিকদের যেখানে পাবে হত্যা করবে।......" তৈমুরলঙ্গ দু-তিন দিনেই বহুলক্ষঅযোদ্ধা হিন্দুকে হত্যা করেছিলেন। হিটলার এ কৃতিত্ব দাবী করতে পারেনি। এ কৃতিত্ব দাবী করতে পারেনি স্টালিন, পল পট বা মাও-সে-তুং।

আজ কাশ্মিরী মুসলমানরা জেহাদ চালাচ্ছে। বিভিন্ন জেহাদী সংগঠনগুলির নাম দেখলেই

তা বোঝা যায়। হরকত-উল-আনসার, হিজব-উল-মুজাহিদীন, জয়িস-ই-মুহাম্মদ ইত্যাদি সংগঠনগুলি ধর্মীয়। তারা ইসলামের ষষ্ঠ স্তম্ভ জেহাদ পালন করে। তারা কাশ্মীরকে *দার-উল-ইসলামে* পরিণত করতে চায়।১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সময় কাশ্মীর উপত্যকায় পন্ডিত ব্রাহ্মণদের সংখ্যা ছিল ৭ শতাংশ। বিগত নব্বই এর দশকে উর্দু পত্রিকা ও মসজিদের মাইকের মাধ্যমে তাদের জানান হলো বুলেট ও বিতাড়নের মধ্যে যে কোনও একটি যেন তারা বেছে নেয়। আজ কাশ্মীর উপত্যকার পন্ডিতরা জম্মুতে কতকগুলি উদ্বাস্তু শিবিরে বাস করে। এ ধরনের ঘটনা শুধুমাত্র ভারতেই সম্ভব। বিগত নব্বই এর দশকে কাশ্মীরে যখন এইসব ঘটনা ঘটছিল তখন কি মহাশ্বেতা দেবীরা 'উগ্র আক্রমণাত্মক হিংস্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে' নিষিদ্ধ করার কথা লিখেছিলেন?

লেখেননি। কারণ, আগেই বলেছি, এ দেশের সংবিধান ধর্মেতরবাদী হলেও একজন রাগী বাবা আছেন। রাগী বাবা পন্ডিতদের কাশ্মীরে থাকা পছন্দ করেন না। সেই রাগীবাবা চটে যাবেন যদি ধর্মেতরবাদীরা কাশ্মীরের পন্ডিতদের নিয়ে মাথা ঘামায়। বিজেপি শাসিত গুজরাটে শাহ্ আলম ক্যাম্প দেখতে হুড় হুড়করে গেছেন পশ্চিমবঙ্গের তাবৎ বুদ্ধিজীবি। কে কে গেছেন জম্মুর উদ্বাস্তু ক্যাম্পে?

শাহ্ আলম ক্যাম্প দেখে এইসব ধর্মেতরবাদীদের জিভ আর কলম থেকে ঝরে পড়েছে অজস্র করুণা এবং বিজেপি সরকার ও হিন্দুদের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা। সেইটাই আসল কথা। ধর্মেতরবাদী রাষ্ট্রে হিন্দু ও মুসলিম এক কথা নয়। গুজরাটী মুসলিম ও কাশ্মিরী পন্ডিত এক কথা নয়। কাশ্মিরী পন্ডিতরা আজ বারো বছর বাড়ী ফিরতে পারেনি তাতে কাশ্মীরে ভোট আটকায়নি। কাশ্মিরী পন্ডিতরা ছারপোকা তেলাপোকা। কিন্তু মুসলিমরা পবিত্র। সুতরাং কিছু গুজরাটী মুসলিম এখনও বাড়ী ফেরেনি বলে ধর্মেতরবাদী রাষ্ট্রের নির্বাচন কমিশন গুজরাটের ভোটের দিনক্ষণ স্থির করতে পারেন নি।

ধর্মের প্রতিষ্ঠান কেন, সেমীয় ধর্মগুলি বিধর্মীদের প্রতি আক্রমণাত্মক। তাদের ধর্মগ্রন্থগুলি হিংসা প্রচার করে। এগুলি রোধ করা যায়না। কারণ, ধর্মগ্রন্থগুলি আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে। এগুলির প্রতি ভারতের কোনও আইনই প্রয়োগ করা যায়না। বাঙ্গালী বিদ্বান অক্ষয় কুমার মৈত্র তাঁর *ফিরিঙ্গি বণিক* পুস্তকে উল্লেখ করেছেন এক সামের (Psalm) কথা, তাতে পৌত্তলিকদের লোহার ডান্ডা দিয়ে মারার কথা লেখা হয়েছে। যাতে তারা খোলামকুচির মত ভেঙ্গে যায় (Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritence, and the uttermost parts of the earth thy possession. Thou shalt break them with a rod of iron: thou shalt dash in pieces like a potters's vessel.--Psalms, ii, 8,9.)

ভারতের আম জনতার কাছে মিশনারীরা যে বাইবেল পরিবেশন করে তাতে এই হিংসাত্মক সাম থাকে। কোনও ধর্মেতরবাদীর ক্ষমতা আছে এই হিংসাত্মক সামের প্রচার বন্ধ করার? এই একই কথা কৌশলে লেখা আছে মূল নিউ টেস্টামেন্টেও।

সুতরাং মহাশ্বেতা দেবী হিংসার সৃষ্টি সেমীয় ধর্ম থেকে, আগে ধর্ম তার পরে প্রতিষ্ঠান। মনে রাখবেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ উগ্র মৌলবাদী খেলাফৎ আন্দোলনের বিকিরণফল। বিধ্বংসী মোপলা জেহাদ যদি না ঘটতো তবে একদা বঙ্গের অনুশীলন সমিতির সভ্য ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগাওয়ার কখনও হয়তো স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার চিন্তাও করতেন না। সেই জেহাদকে চুনকাম করতেইসলাম-মার্ক্সীয় অক্ষ মোপলা জেহাদকে শ্রেণী সংগ্রাম বানায়।

তিন

মহাশ্বেতা দেবীর পরবর্তী প্রবন্ধের নাম 'কেন ধর্মের নামে এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস?' এখানে তিনি আরম্ভ করেছেন 'গোধরা বিষয়ক সত্য বা কল্প কাহিনী এরকম-' দিয়ে। সাদা বাঙলা করলে বোঝায় তিনি গুজবের উপর ভিত্তি করে তাঁর কলম লিখছেন। তিনি লিখছেন, 'ঘটনার বিবরণ টেলিফোনেই শুনছি বেশী, তা অস্বীকার করবো না।'

চিন্তা করুন, বঙ্গের এক প্রমুখ বুদ্ধিজীবি, তিনি স্রেফ গুজবের উপর ভিত্তি করে একটি সংবাদপত্রে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার মত স্পর্শকাতর বিষয়ে লিখে যাচ্ছেন! কারণ, তিনি জানেন এই ধরনের গুজব ছড়ালে তিনি সাধুবাদই পাবেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানোর অভিযোগ করবে না। তিনি হিন্দুদের গাল দিচ্ছেন যে!

তিনি লিখেছেন, 'দাহোদ স্টেশনে চায়ের পয়সা দেব কি দেবনা থেকেই হল্লা শুরু হয় বলে ইতিশ্রুতি।'

অর্থাৎ, তাজুদিনের গল্পটা তিনি খেয়েছেন। যাদের এই ধরনের নোংরা গল্প খাওয়ার ক্ষুধা প্রচুর তারাই এই গল্প খেতে পারেন। এখানে মহাশ্বেতা দেবীর রুচিটা বোঝা যাচ্ছে।

তিনি লিখেছেন 'গোধরাতেও প্রচুর ঘরবাড়ী ধূলিস্যাৎ হয়েছে'—এগুলি শোনা খবর। সময় ও প্রয়োজন মত যাচাই করা যেতে পারে।'

শোনা খবর নিয়ে ফিচার তৈরী করে হলুদ সাংবাদিকরা। কোনও সৎ বুদ্ধিজীবি অসমর্থিত সংবাদ নিয়ে কিছু লেখেন না। মহাশ্বেতা দেবী গুজব শুনেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করে চিৎকার করেছেন—যাচাই না করেই।

মহাশ্বেতা দেবীর তারপরের প্রবন্ধের নাম: *রাম মন্দির নির্মাণার্থে নির্বাচিত বলি*

এখানে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছে গুজরাট রাম মন্দির নির্মাণার্থে নির্বাচিত বলি। কারও বিশ্বাস নিয়ে তর্ক করা যায়না। সুতরাং আমরা সে বিতর্কে যাচ্ছি না। কিন্তু এই প্রবন্ধে তিনি তামাক খেয়েছেন এক আই এ এস অফিসারের হুঁকোতে। 'গুজরাটের ঘটনাবলীর দশ দিন বাদে এক কর্মরত আই এ এস অফিসার গুজরাট দেখে এসে যা লিখেছেন তার অর্থ কী দাঁড়ায়?'

পরে জানা যাচ্ছে আই এ এস অফিসারটির নাম হর্ষ মান্দার। একটা বড় দাঙ্গার (বা দুর্ঘটনার) পরে ত্রাণ শিবিরে শরণার্থীদের অবস্থা করুণই থাকে। এই ধরনের শিবিরের চিত্র সর্বত্রই এক। জম্মুতে কাশ্মীর উপত্যকা থেকে বিতাড়িত পন্ডিতদের শিবির দেখলে মোটামুটি

৮৭

গঠনটা এখানে স্বচ্ছ।

মহাশ্বেতা দেবী হর্ষ মান্দারের হুঁকোতে তামাক খেয়ে লিখেছেন, 'সশস্ত্র তরুণদের অতি সংগঠিত বাহিনী নারী ও শিশুদের ওপর যে হিংস্র অত্যাচার করেছে, তা বিংশ শতকের সকল দাঙ্গার চেয়ে বেশী।'

হর্ষ মান্দার জন্মেছেন বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে। নোয়াখালীর গোলাম সারোয়ারের দাঙ্গা তাঁর দেখার কথা নয়, পড়ার কথা। তিনি কি সে দাঙ্গার ব্যাপারে অবহিত? কিংবা মোপলা জেহাদ সম্বন্ধে?

মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন, আট মাসের গর্ভবতী রমণীর পেট চিরে সন্তান বের করে তাকে মেরে ফেলার কথা। কিন্তু জননী বেঁচে রয়েছে। কাহিনীটি হর্ষ মান্দারেরই। তবে, হর্ষ নিজে লিখেছেন, "যা দেখেছি আর যা শুনেছি তার এক ক্ষুদ্র অংশ আমি লিখছি।" অর্থাৎ হর্ষ মান্দারও গুজবে বিশ্বাস করেছেন। পেট চিরে শিশু বের করে ধারালো ত্রিশুল দিয়ে তাকে মারার ঘটনা কি হর্ষ মান্দার নিজে দেখেছেন? দেখেননি, দেখা সম্ভব নয়। ওরকম কোনও ঘটনা আদৌ ঘটেনি।

কিন্তু তিনি ব্যাপারটা বীভৎস করার জন্য লিখেছেন, "শল্যবিদের অস্ত্রের অহমিকা এড়িয়ে সেই শিশুর দেহে প্রাণ ছিল......অপরিমেয় রক্তক্ষরণে পান্ডুর জননী তখনও জীবিত ছিল....ক্রমশঃ বুজে আসা অক্ষিপল্লবের ঝরোখা দিয়ে শিশুর মুখ দেখেছিল।.....সব পাশব চিৎকারের মধ্যে শুনেছিল শিশুর ক্রন্দন...."

হর্ষ মান্দার অবলীলাক্রমে বর্ণনা করে গেছেন নানা বীভৎস যৌন সন্ত্রাসের কথা। কিন্তু উপরের লেখা থেকে স্পষ্ট, তিনি ভাল গল্প লিখতে পারেন। *ক্রাই, দি বিলাভেড কান্ট্রি নামে* তিনি গুজরাট দাঙ্গার যে ছবি এঁকেছেন তা এখন গরম পিঠের মত বিক্রি হচ্ছে। এরপর নাকি ঘৃণায় চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। ভাল গল্প লিখতে পারলে ৪৭ বছর বয়সে চাকরী ছাড়া যায়। ভাল গল্প লিখতে না জেনেও আমার কয়েকজন বন্ধু চাকরী ছেড়েছে। হিন্দুদের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে সঙ্ঘ পরিবারের বিরুদ্ধে লিখলে প্রচুর অর্থ ও সম্মান পাওয়া যায়। উনি কলকাতায় এসেছিলেন, সংবাদ মাধ্যমের লোকেরা ওনার সাক্ষাৎকার নিয়েছে। ওনাকে হিরো বানিয়েছে। ধন্য ধন্য হর্ষ মান্দার!

পরের পর প্রবন্ধে হর্ষ মান্দারের কথাই লিখে গেছেন মহাশ্বেতা দেবী। সেখানে আবার সেই নিউটনের ফিজিক্সের কথা—নরেন্দ্র মোদী যা উচ্চারণ করেন নি এবং একান্তই টাইমস অফ ইন্ডিয়ার উর্বর মস্তিষ্ক প্রসুত।

হর্ষ মান্দার

সুতরাং হর্ষ মান্দারের কথাতেই আসি। তাঁর লেখাতে আত্মদৈবীকরণের একটা উৎকট প্রয়াসও আছে। আজকের ভারতে আত্মদৈবীকরণের সহজ পথ হচ্ছে গাঁধীবাদ। গাঁধীবাদী হয়ে যাওয়া। তাই দাঙ্গা বিধ্বস্ত ক্যাম্পগুলিতে ঘুরতে ঘুরতে হর্ষ চিন্তা করছেন, এমন একটা অন্ধকার মুহূর্তে গাঁধী বেঁচে থাকলে কী করতেন?

সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা রায়টের কথা স্মরণ করেছেন হর্ষ। এক হিন্দু পিতা গাঁধিজীর কাছে অভিযোগ জানালো, তাঁর কিশোর পুত্র উন্মত্ত মুসলিম জনতার দ্বারা নিহত হয়েছে। ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ পিতা তার প্রতিশোধ নিতে চায়। গাঁধিজী পুত্রশোকে অন্ধ সেই পিতাকে বললেন, তুমি যদি সত্য সত্যই যন্ত্রণা ভুলতে চাও তবে হিন্দুদের দ্বারা যার পিতামাতা নিহত হয়েছে এমন একটি ছেলে সংগ্রহ করো। তাকে নিজের সন্তানের মত লালন করো, কিন্তু তাকে মুসলিম বিশ্বাস নিয়েই বড় হতে দাও। তাহলেই তুমি পুত্রশোক থেকে, প্রতিশোধের তীব্র দাহ থেকে মুক্তি পাবে।

একটি ছেলেকে লালন করা ঠিক আছে। কিন্তু মুসলিম বিশ্বাস নিয়ে? সেই পালক কীভাবে মুক্তি পাবে দেখা যাক। বড় হয়ে লালিত মুসলমান পুত্রটি যখন জানবে তার পালক পিতা মুশরিক পৌত্তলিক কাফের, তখন সে কোরান থেকে নির্দেশ পাবে: অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে পৌত্তলিকদের যেখানে পাবে বধ করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে, এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে....৯/৫

হে বিশ্বাসীগণ! বিশ্বাসীদের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। বিশ্বাসীগণ যেন বিশ্বাসীদের ছাড়া অবিশ্বাসীদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকবে না।

হে বিশ্বাসীগণ অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক। ৯/১২৩

এরকম অজস্র কোরান বাক্য উৎকলিত করা যায়। পালিত পুত্র যদি সেই সব কোরান ব্যাক্যের কিছুটা অন্ততঃ পালন করে? তাহলে কী হবে? মুসলমান ছাত্রদের হাতে হিন্দু শিক্ষকদের কী অবস্থা হয়েছে বাঙলাদেশে তা সালাম আজাদের *এথনিকক্লিন্সিং* বইটি পড়লেই জানা যায়। পালক পিতা সেই ভয়ানক পরিণতির দিকেই যাবেন।

স্বয়ং গাঁধিজীর জীবনেই বা কী হয়েছিল? মৌলানা মুহাম্মদ আলি একটি সভায় বলছিলেন, গাঁধিজী যিশুর মত। এতে সব মুসলমানরা যখন মুহাম্মদ আলিকে দুয়ো দিয়ে বললো, তুমি একজন মুশরিক কাফেরকে হজরত ঈশার সমান করলে! তখন মুহাম্মদ আলি পাল্টি খেয়ে বললেন, *গাঁধিজী যতই মহাত্মা হোন না কেন, যে কোনও একজন চরিত্রহীন মুসলমানের চেয়ে তিনি নিম্নস্তরের। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার* সংবাদদাতা যখন তাঁকে এই বক্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করলো, তখন তিনি রেগে গিয়ে নিজের বক্তব্য পুনরায় শুনিয়ে বললেন, আমাদের ধর্ম তাই বলে।

আর বাবাসাহেব লিখেছেন, দিল্লীর টিব্বিয়া কলেজে যখন একজন হিন্দু ছাত্র এই কথা বলেছিল তখন তার সহপাঠীরা তো বটেই, শিক্ষকরাও তাকে বেধড়ক প্রহার করেছিল।

সত্য সত্যই কোরান বলে, *একজন পৌত্তলিক পুরুষ তোমাদের চমৎকৃত করলেও ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাস তা অপেক্ষা উত্তম।* সুতরাং কিছু না হোক, পালিত পুত্রটি বড় হয়ে পালক পিতাকে তার চাকরের অধম বলেই মনে করবে।

গুজরাটে মহাশ্বেতা দেবী

মহাশ্বেতা দেবী স্বয়ং চলে গিয়েছিলেন গুজরাটে। সেখানে শরণার্থীদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরেছেন। আহ্মদাবাদে গিয়ে দেখেছেন :

'হিন্দু রাষ্ট্র নুঁ কর্ণাবতী শহের
আপনুঁ হার্দিক স্বাগত করেছে
ভি.এইচ.পি-গুজরাট

কর্ণাবতী অর্থাৎ আমেদাবাদ। মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন, 'আম্‌দাবাদীরা নাকি কর্ণাবতী নামটা পছন্দ করছেন না।' এখানেই 'নাকি'! তিনি নিশ্চিত নন। যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

(কলকাতার জায়গায় কোলকাতা সবাই কি খুব পছন্দ করেছে?)

হিন্দু রাষ্ট্র নুঁ দেখে চমকে উঠেছেন তিনি। দেশ ভাগ হয়ে ইসলামী রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে আপত্তি করার নেই। তারপরেও মুসলমানদের বিশেষ সুবিধা দেবার জন্য সংবিধান সংশোধন হলে আপত্তি নেই। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে একবার দেশ ভাগ হবার পর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ হিন্দু রাষ্ট্র চাইলে খুব আপত্তি! দুনিয়া রসাতলে চলে যাবে। হিন্দুরাষ্ট্র নেপালে কি মুসলমানদের খুব অসুবিধা হচ্ছে?

এখানে আবার এক 'প্রত্যক্ষদর্শী'র হাতে তামাক খেয়ে মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন, শহরে সরকারী গাড়ীতে দিব্যি উড়ছে গৈরিক পতাকা। তারপর লিখেছেন, ''আমি দেখেছি যত, শুনেছি তার চেয়ে বেশী।''

তাতো বটেই, কানটা প্রচুর ভারী হয়েছে অন্যের কথা শুনে। আর এই ধরনের কান ভারী করা কথা শোনার জন্য তাঁর আকাঙ্খা প্রচুর। দেখেছেন দাঙ্গার পরে শরণার্থী ক্যাম্প। সেখানকার দৃশ্য ভাল না হওয়াই স্বাভাবিক। সেখানে হাহাকার থাকে, হতাশা থাকে। যার ছেলে মরে গেছে, বাড়ী পুড়ে গেছে তার চোখে তো অন্ধকার থাকবেই। আর সেখানে নানারকম অব্যবস্থা থাকতেই পারে। থাকতে পারে নানা অপ্রতুলতা। দেশটা তো ভারতই। অন্য যে কোনও শরণাথী ক্যাম্প দেখলেও একই দৃশ্য দেখা যেত।

২৭ শে মে'র পরে মহাশ্বেতা লিখছেন, ''গোটা গুজরাট যেন একটা বাড়ী। তার প্রতি দরজা-জানলা বন্ধ। ভিতরে চলছে একতরফা নৃশংস হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি।''

কিন্তু সেই বন্ধ বাড়ীতে তিনি ঢুকলেন কী করে? তারপর বেশতো নানা শোনা কথা বিনা দ্বিধায় পরিবেশন করে যাচ্ছেন কলকাতার কাগজের খাদ্য হিসাবে !

আগেই আমরা বিভিন্ন সংবাদ পত্রের সংবাদ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি প্রথমে হিন্দুরা প্রায় একচেটিয়া গুন্ডামী করলেও এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে মুসলমানরাও। এই দাঙ্গায় যত হিন্দু মারা গেছে তারা সবাই পুলিশের গুলিতে মারা যায়নি। মুসলমানদের হাতেও বেশ কিছু হিন্দু মারা গেছে। মুসলমানরা একজন পুলিস অফিসারকেও মসজিদে টেনে নিয়ে হত্যা করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নানারকম গুজব

রটিয়ে একতরফা হিন্দু বিদ্বেষ প্রচার করে চলছেন তিনি। *কোথায় শেষ* নিবন্ধে তিনি লিখছেন, "গুজরাট সরকার হয়ত এ মুহূর্তেই এঁদের ঘরে আবার আগুন না দিতেও পারে। কিন্তু আমেদাবাদ সহ সব শহর থেকে এদের উপড়ে ফেলে দেবে। জমি-ভূমির দখল নেবে। নেবেই।"

কী ভবিষ্যৎদৃষ্টি! কী তীব্র রাজনৈতিক বিদ্বেষ আমরা দেখছি বাঙালী বুদ্ধিজীবির কলমে! এরপর গাঁধিজীর কথায় চলে গেছেন এই বুদ্ধিজীবি।

গাঁধিজীর কথা দু এক টুকরো শোনানো যাক বাবা সাহেবের কলমে। মোপলা জেহাদের কথা লিখেছেন বাবাসাহেব সরকারী সূত্র অবলম্বন করে: ১৯২১ র প্রথমে সুরু হয় মোপলা বিদ্রোহ। দুটি সংস্থা—খুদ্দম-ই-কাবা (কাবার সেবকগণ) ও কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটির আন্দোলনের ফলে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। আন্দোলনকারীরা জনগণকে শেখায় যে ভারত *দার-উল-হরব* (ইসলামের শত্রুর দেশ) এবং জেহাদ করে দেশকে মুক্ত করতে হবে, নতুবা দেশত্যাগ করতে হবে হিজরত করে। এতে মোপলারা হটাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তারা বিদ্রোহ করে ব্রিটীশের বিরুদ্ধে। উদ্দেশ্য ইংরেজদের বিতাড়িত করে ইসলামী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। নানা ধরনের ছুরি, বর্শা, তলোয়ার ইত্যাদি গোপনে তৈরী করা হয়। ব্রিটীশ কর্তৃপক্ষকে আঘাত করার সংগ্রহ করা হয় কিছু গোঁয়ার গোবিন্দও। পিরুনাংগডিতে ২০ শে আগস্ট ব্রিটীশের সঙ্গে গুরুতর সংঘর্ষ হয়। রাস্তা অবরোধ করা হয়, লাইন কেটে ফেলা হয় টেলিগ্রাফের, ট্রেনলাইনও উপড়ে ফেলা হয় কয়েক জায়গায়। প্রশাসন অচল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোপলারা স্বরাজ ঘোষণা করে দেয়। রাজা হয় জনৈক আলি মুদালিয়র, চতুর্দিকে খিলাফৎ পতাকা উড়তে থাকে। এরনাদ ও ওয়ালুরানায় খিলাফৎ রাজত্ব ঘোষণা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে মালাবারের হিন্দুদের উপর আক্রমণ সুরু হয়ে যায়। ব্যাপক অগ্নিসংযোগ, লুট, খুন, মন্দির অপবিত্রকরণ, নারী ধর্ষণ ও ধর্মান্তরকরণ চলতে থাকে। এমনকি গর্ভবতী নারীর পেট কাটাও হয় (পার্লামেন্টের নিকট,দাখিল করা সরকারী প্রতিবেদন অনুসারে, হর্ষ মান্দারের মত কুচক্রী গুজব সংগ্রহকারীর লেখা নয়)। এক কথায় সৈন্যদল এসে দুর্গম অঞ্চলে ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত সর্বরকম বর্বরতা প্রদর্শন করা হয় মালাবারের হিন্দুদের উপর। এবং ব্যাপারটা একতরফা। হিন্দুরা মার খাওয়া ছাড়া কিছুই করতে পারেনি। ঠিক কত জন হিন্দু খুন হয়েছে, ধর্ষিত হয়েছে বা ধর্মান্তরিত হয়েছে তা সঠিকভাবে জানা যায়না। কেন্দ্রীয় পরিষদে বিতর্কে স্যার উইলিয়াম ভিনসেন্ট জানিয়েছিলেন মাদ্রাজ সরকারের রিপোর্ট অনুসারে হাজার হাজার হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু সঠিক সংখ্যা প্রকাশ করা যাবেনা। এই বর্বরতার ফলে গোটা দক্ষিণভারত জুড়ে হিন্দুদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়।

বাবাসাহেব লিখেছেন, এই ত্রাস আরও বৃদ্ধি পেল যখন কয়েকজন খেলাফৎ নেতা এতই বিপথগামী হয়েছিল যে তারা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, "ধর্মের জন্য মোপলারা যে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করেছে তার জন্য তাদের অভিনন্দন।"

যে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ স্বীকার করবেন হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির জন্য এই মূল্য

যথেষ্ট চড়া। কিন্তু শ্রীযুক্ত গাঁধী হিন্দু-মুসলিম সংহতির জন্য এতই বদ্ধধারণা সম্বলিত যে তিনি মোপলা ও খেলাফতিদের কুকর্মকে হাল্কা করে দেখলেন। তিনি মোপলাদের সম্পর্কে বললেন, সাহসী ধর্মভীরু মোপলারা ধর্মের জন্য এবং ধার্মিকভাবে লড়াই করছিল। মোপলাদের অত্যাচারের ব্যাপারে মুসলমানদের মনোভাব সম্পর্কেতিনি হিন্দুদের বললেন:

" এইসব ধর্মান্ধ কার্যকলাপ সত্ত্বেও হিন্দুরা যে নিজেদের ধর্ম রক্ষা করতে পারে এমন বোধ করার সাহস ও বিশ্বাস হিন্দুদের থাকা উচিত। মোপলাদের উন্মত্ততার নিন্দা মুসলমানরা করলো কি করলো না তা দিয়ে মুসলমানদের বন্ধুত্ব বিচার করা ঠিক নয়। মোপলাদের কাজ কর্মের জন্য মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবেই লজ্জিত ও গ্লানিযুক্ত বোধ করবে। তারা নিঃশব্দে এবং কার্যকরীভাবে চেষ্টা করবে যাতে তাদের মধ্যে উগ্র ধর্মান্ধদের পক্ষেও এই ধরনের কাজ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। আমার বিশ্বাস মোপলা উন্মত্ততাকে হিন্দুরা প্রশান্ত মনে গ্রহণ করেছে এবং সংস্কৃতিবান মুসলমানরা মোপলাদের দ্বারা পয়গম্বরের শিক্ষার বিকৃতি সাধনের জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত।"

*মোপলারা মোটেই পয়গম্বরের শিক্ষার বিকৃতিসাধন করেনি। তারা আল্লাহ্‌র পথেই যুদ্ধ করেছিল। তারা সার্থক করে তুলেছিল **পয়গম্বরের শিক্ষাকেই**।*

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাঁর *লিবারেটর* পত্রিকার ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই সংখ্যায় লিখেছেন: "আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমি মহাত্মার নজরে এনেছিলাম, যখন আমরা দুজনেই নাগপুরে খেলাফৎ কনফারেন্সে গিয়েছিলাম। ঐ উপলক্ষে মৌলানারা কোরানের যেসব বাক্য ব্যবহার করছিল তার মধ্যে জেহাদ ও কাফেরদের হত্যা করার কথা ছিল বারবার। আমি যখন ব্যাপারটা মহাত্মার নজরে আনলাম তিনি হেসে বললেন, ওগুলি তারা ব্রিটীশ আমলাদের উদ্দেশ্যেই উল্লেখ করছে। উত্তরে আমি বললাম, এগুলি অহিংস আন্দোলনের ধারণার বিপরীত এবং যখন অনুভূতির বিপরীতচারণ ঘটবে তখন মুসলমান মৌলানারা এগুলি হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে বিরত হবেনা।"

মোপলা জেহাদ সম্পর্কে ঐ বছরেরই ২৬শে আগস্ট সংখ্যায় শ্রদ্ধানন্দ লেখেন: " প্রথম সতর্কবার্তা উচ্চারিত হয়েছিল যখন বিষয় সমিতির সভায় হিন্দুদের বিরুদ্ধে মোপলাদের অত্যাচারের কথা উল্লিখিত হয়। আদি প্রস্তাবে হিন্দুদের হত্যা করা ও তাদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার জন্য মোপলাদের ধিক্কৃত করা হয়েছিল। হিন্দু সদস্যরা নিজেরাই নানা সংশোধন আনলেন যাতে কুকর্মের জন্য শুধুমাত্র কিছু ব্যক্তিকে দায়ী করা হলো। কিন্তু কোনও কোনও মুসলিম নেতা এটাও সহ্য করতে রাজী হলেন না। মৌলানা ফকির ও অন্যান্য মৌলানারা প্রস্তাবের বিপক্ষে গেলেন এবং এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু আমি বিস্মিত হলাম যখন পুরোপুরি জাতীয়তাবাদী মুসলমান হসরৎ মোহনী প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচারণ করলেন এই বলে যে মোপলাদের দেশ এখন *দার-উল-হরব*। তারা সন্দেহ করেছিল হিন্দুরা মোপলাদের ব্রিটীশ শত্রুদের সাহায্য করছে। সুতরাং মোপলারা হিন্দুদের বলপূর্বক ধর্মান্তর করে কোনও অন্যায় করেনি। এবং হিন্দুরা যদি প্রাণ বাঁচাতে মুসলমান হয়ে

থাকে সেটাকে স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর বলেই ধরে নিতে হবে, বলপূর্বক ধর্মান্তর বলা যাবেনা। সামান্য কয়েকজন মোপলাদের বিরুদ্ধে আনা প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা গেলনা, ভোট নিতে হলো।"

এখানে উল্লেখ্য যে কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলপূর্বক ধর্মান্তরের মাত্র তিনটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল :

"যে সমস্ত পরিবার বলপূর্বক ইসলামায়িত হয়েছিল তারা মঞ্জেরীর আশপাশে বাস করতো। একথা এখন পরিষ্কার যারা খেলাফৎ অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করতো সেইসব ধর্মান্ধরাই এই ইসলামায়ন করেছে। আমাদের কাছে যা খবর তাতে মোট তিনটি এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।"

অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন প্রায় আড়াই হাজার জন হিন্দুকে বলপূর্বক ধর্মত্যাগে বাধ্য করা হয়।

সুতরাং গুজরাটের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম-ধর্মেতরবাদী অক্ষ কেন গাঁধিজীর নাম নিচ্ছে তা অতি স্পষ্ট। তাঁরা গাঁধিজীর মত ধর্মেতরবাদের যুপকাষ্ঠে বলি দিতে চান হিন্দুদের। গাঁধিজীর পন্থা! অনশন! সেই সঙ্গে কংগ্রেসের প্রিয়রঞ্জন-মমতা-প্রণবদেরও চেনা যাচ্ছে।

গাঁধিজীর শেষ অনশনের কথা ধরা যাক। পাকিস্তানী ফৌজের মেজর জেনারেল আকবর খাঁর নেতৃত্বে ২১ শে অক্টোবর ১৯৪৭ তারিখে হানাদার বাহিনী কাশ্মীরে জেহাদ শুরু করলো। কিছু দিন বাদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল। দেশ বিভাজনের সময় সম্পদের বাঁটোয়ারার সূত্রে পাকিস্তানের পঞ্চান্ন কোটি টাকা পাওনা ছিল ভারতের কাছে। মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিল, ঐ টাকা দেওয়া স্থগিত থাকবে। কারণ, ঐ টাকায় সমরাস্ত্র কিনে পাকিস্তান যুদ্ধ তীব্রতর করে তুলবে। সর্দার প্যাটেল এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, একটি পাই পয়সাও দেবনা।

গাঁধিজী বললেন, ব্যাপারটা রাজনীতিকুশলতার পরিচয় নয়, এবং ভুল সিদ্ধান্ত। স্বাধীন সরকারের প্রথম অসম্মানজনক কাজ। ১৩ই জানুয়ারী থেকে তিনি অনশনে বসলেন: *ভারতের জনগণের বিবেক জাগ্রত করার জন্য এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উন্নতির জন্য।*

ব্যাপারটা গোটা জাতিকে ব্ল্যাকমেল করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। তিনি ভালভাবেই জানতেন এই পদ্ধতিতে মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত বদলানো যাবে। মুসলিম জগতের কাছে তিনি প্রিয় হবেন।

গাঁধিজীর প্রাণ বাঁচাতে হবে। সুতরাং মন্ত্রীসভার বৈঠক বসলো আবার। পাকিস্তানের পাওনা টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। পাঁচদিন পরে অনশন প্রত্যাহার করলেন 'জাতির জনক।' পাকিস্তান টাকা পেয়ে নব উদ্যমে নেমে পড়লো সমরাঙ্গনে। পাকিস্তানের নিয়মিত সৈন্যের দুটি ডিভিসন লড়তে লাগলো কাশ্মীরে। ভারতীয় জওয়ানদের রক্তে লাল হতে লাগলো কাশ্মীর রণাঙ্গন।

অন্য কেউ যদি এই কাজ করতো সে হতো দেশদ্রোহী, গদ্দার! কিন্তু মানুষটা যখন গাঁধিজী......। যাই হোক যুদ্ধের সময় একজন জাতীয় নেতার এই ধরনের শত্রুপক্ষকে সাহায্য

করার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নেই।

অম্লান দত্তের অনশনের কথা উল্লেখ করেছেন মহাশ্বেতা দেবী। গুজরাট নিয়ে অম্লান দত্ত নিজের বাড়ীতে অনশনে বসেছিলেন। খবর পেয়ে গিয়েছিল *স্টেটসম্যানের* সংবাদদাতা। রঙীন ছবি সমেত অম্লান দত্তকে নিয়ে 'স্টোরী' বানিয়েছে স্টেটসম্যান। তাতে অম্লান দত্ত প্রশ্ন করেছেন, সমস্ত ধর্মের লোককে হিন্দু মন্দিরে প্রবেশের জন্য কোনও রাজনৈতিক দল, বামপন্থী সমেত, কোনও আন্দোলন করেছে?

অন্য ধর্মের লোকেদের হিন্দু মন্দিরে প্রবেশের জন্য এই গাঁধীবাদীর এতো মাথাব্যথা কেন? এর সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতারই বা কী সম্বন্ধ? তিনি একটা কাজ করতে পারেন। পাসপোর্ট ভিসা করে ঢুকতে পারেন একবার মক্কা শহরটাতে। কিম্বা পকেটে একটা গণেশের ছবি সেঁটে শারজায় ক্রিকেট খেলা দেখতে যেতে পারেন। উনি দেখবেন কাফেরদের জন্য ভিসার রঙই আলাদা। সে ভিসা নিয়ে মক্কা-মদিনার ধারে কাছে ঘেঁসতে দেওয়া হয়না। আর শারজার ক্রিকেট মাঠে গণেশের ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গে তা কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে পদদলিত করা হবে। বস্তুতঃ তাই হয়েছে। তা ওনাকে অতো কিছু করতে হবেনা। কোলকাতার একটি পার্ককে মুসলিম শিক্ষাব্রতী প্রাতঃস্মরণীয়া বেগম রোকেয়ার নামাঙ্কিত করা হয়েছে। কোলকাতা কর্পোরেশনের সেই পার্কে কিছু লোক দেশনেতাদের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করতে দিচ্ছে না। তিনি যদি এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়ে ঐ পার্কে একজন দেশনেতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন! অনশন-টনশন করার পরে যদি তাঁর সময় থাকে তবে দিলীপ পালের ব্যাপারটা একটু দেখুন। পারেন যদি একটু অনশন টনশন করে দিলীপ পালকে ইলিয়ট হস্টেলের ভারীর চাকরীতে বহাল করতে, তবে বেচারার খুব উপকার হবে। বেচারা চাকরী পেয়েছিল ইলিয়ট হস্টেলের ভারীর। কিন্তু মুসলিম ছেলেরা তাকে কাজ করতে দেয়নি। অগত্যা মৌলানা আজাদ কলেজের অধ্যক্ষ তাঁকে কলেজে কাজ করতে দিয়েছিলেন। সে গিয়েছিল জুলজী বিভাগে কাজ করতে। কিন্তু সেখান থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

আবার আসা যাক মহাশ্বেতা দেবীর কথায়। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তাঁর মনে হচ্ছে অনশন আর পিকেটিং প্রতিরোধের এক শ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু, তিনি লিখেছেন, "আমি ডায়াবিটিসের কারণে পারিনা, পারলে আমেদাবাদের রাস্তায় আমৃত্যু অনশন করতাম।"

বুঝুন কান্ডটা! যিনি অনশন করে মরতে যাচ্ছেন, তিনি ভয় করছেন ডায়াবিটিসের!

সেই গল্প আছে, এক ভদ্রলোক জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন অন্ধকার রাস্তা ধরে টর্চ জ্বেলে। রাস্তায় এক পরিচিত জনের সঙ্গে দেখা। তিনি শুধালেন, ও মশায় হন হন করে চলেছেন কোথায়?

—নদীতে, এ জীবন রেখে আর লাভ নেই। জলে ডুবে আত্মহত্যা করবো।

—তা, হাতে টর্চ কেন?

—রাস্তায় বড় সাপের উপদ্রব!

মহাশ্বেতা দেবীর পরের প্রবন্ধ *মুষল পর্ব চলছেই।* এখানে তিনি অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেছেন, " এই পৈশাচিকতা, কীভাবে এই হত্যাকান্ড এত সহজে ঘটানো গেল, কেন পুলিশ সহ রাজ্য প্রশাসন মদত দিল ঘাতকদের" এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। এর জন্য তিনি পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের ইতিহাসের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং উত্তর পেয়ে গেছেন। উনি নিজেকে গোলা লোক বলেই মানেন এবং গোদা কথাই বোঝেন। দেখে দেখে যা শিখেছেন তাই মানেন, এবং তাই পাঠকদের কাছে পরিবেশন করেছেন বিভিন্ন শিরোনামে। যেমন, *বর্ণাধিপত্য, বুটলেগিং, প্রতিবাদ নেই, জল ঘোলা হচ্ছে ৫০ বছর* এবং *এফ. আই আর বদলাও।*

তিনি লিখেছেন হাবিব তনবীরের কথা। বরোদায় ভদ্রলোককে কেউ বাড়ী ভাড়া দিতে রাজী হননি। শুধু বরোদা কেন, পশ্চিম বঙ্গেও বহু লোক মুসলমানকে বাড়ী ভাড়া দিতে রাজী হন না। জৈন ধর্মাবলম্বীরা বাঙালীদের বাড়ী ভাড়া দিতে চাননা। কারণটা প্রাথমিকভাবে খাদ্যজনিত। মাছ মাংসে ডিমের গন্ধ জৈনরা সহ্য করতে পারেন না। ভাড়াটে গোমাংস খাবে সেটা কোনও হিন্দু না চাইতে পারেন। গুজরাটীরা তো আবার নিরামিশভোজী। মুসলমানদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কারণ আছে। বাবাসাহেব লিখে গেছেন, "হিন্দুর সঙ্গে খ্রীষ্টানের বিয়ে তেমন কিছু জটিলতার সৃষ্টি করেনা, কিন্তু হিন্দু মুসলমানের বিয়ে দাঙ্গার সৃষ্টি করে।" বেশীদিন আগের কথা নয়। পশ্চিমবঙ্গের দুই আই.এ.এস অফিসারের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। একজন বৈদ্যবংশজাত অন্যজন মুসলিম। মেলামেশার সূত্রে বৈদ্যনন্দন মুসলিম অফিসারের ভগ্নীর প্রেমে পড়লেন। কিন্তু বিয়ে করার জন্য তাঁকে ধর্মান্তরিত হতে হলো। খ্রীষ্টান মেয়ে বিয়ে করে হিন্দু হলে তাদের বাড়ী থেকে তেমন আপত্তি আসে না। দেয়া নেয়া চলে। ধর্মত্যাগের জন্য খ্রীষ্টধর্মে অভিশাপের বেশী কিছু বর্ষণ করা হয়নি। কিন্তু ইসলাম ধর্মে ইসলাম ত্যাগের শাস্তি মৃত্যু। সহী মুসলিমের ৪১৫২ নং হাদিশে বলা হয়েছে, তিনটি ক্ষেত্রে কোনও মুসলমানকে হত্যা করা যেতে পারে: বিবাহিত ব্যভিচারী, 'জীবনের বদলে জীবন' ও ইসলাম-ত্যাগের ক্ষেত্রে। এবং যারা ইসলাম ত্যাগকে প্ররোচনা দেয় তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। কারণ, ব্যাপারটাকে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বলেই ধরা হবে। কোরানে আছে: *যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। ৫/৩*

সুতরাং কোথা থেকে কী হবে এই শঙ্কায় সাধারণতঃ কোনও হিন্দু মুসলমানকে বাড়ী ভাড়া দিতে চায়না।

মহাশ্বেতা দেবী বর্ণাধিপত্যের কথা তুলেছেন। এখানে ফুলন দেবীর কথায় আসতে হয়। ফুলন দেবী আধুনিক ভারতের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য চরিত্র। ফুলন দেবীর জীবন নিয়ে শেখর কাপুর *ব্যান্ডিট কুইন* ছবিটি করতে চাইলে তিনি প্রথমে রাজী হননি। কারণ, শেখর কাপুর ব্যাপারটা বর্ণ-সংঘর্ষ বলে চালিয়েছিলেন। ফুলন দেবী বলেছিলেন তিনি যে শুধু

উচ্চবর্ণের মানুষদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছিলেন তাই নয়, স্ববর্ণের ক্ষমতাশালী লোকদের দ্বারাও অত্যাচারিত হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর উপর অত্যাচারের জন্য বর্ণভেদকে দায়ী করা সঙ্গত নয়, দায়ী মানুষের ক্ষমতার পার্থক্য। তিনি দুর্বল ও দরিদ্র বলেই অত্যাচারিত হয়েছিলেন।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ফুলন দেবী মামলা তুলে নিয়ে শেখর কাপুরকে *ব্যান্ডিট কুইন* করতে দিয়েছিলেন। কারণ, কড়ি দিয়ে সব কেনা যায়। কিন্তু বর্ণসংঘাত বলে যে একটা বহুল প্রচারিত মিথ্যা ধারণা বাজারে বহুদিন ধরে চলছে, সেটা খুব স্পষ্ট করে দিয়েছেন নিরক্ষর ফুলন দেবী। পয়সা থাকলে যে কেউ বাঁ হাত দিয়ে ব্রাহ্মণকে কিনে ডান হাত দিয়ে বিক্রী করে দিতে পারেন। বেশীভাগ ব্রাহ্মণই দরিদ্র। বর্ণের নিজস্ব কোনও ক্ষমতা নেই। বুদ্ধি আর বিত্তই আসল ক্ষমতা। হিন্দুসমাজের শত্রুরা 'ব্রাহ্মণ্যবাদ' নামক একটি কাল্পনিক তত্ত্বের আমদানি করেছে। নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভারতের সমাজ কখনই সমসত্ত্ব নয়। অসংখ্য নৃবৈজ্ঞানিক স্তরভেদ বিশিষ্ট নানা জাতির সমবায়ে ভারত গঠিত। সেই সব জাতির মধ্যে নানা রকম পার্থক্য থাকবেই। সেই পার্থক্যকে স্বীকার করে নিয়ে ধীরে ধীরে সেই পার্থক্য মুছে ফেলা দরকার। মনে রাখা দরকার 'সব মানুষ সমান' এটা নিতান্তই আধুনিক ধারণা। প্রাক-আধুনিক মানুষ রুশো বা টমাস জেফারসনের কথা জানতো না। সব দেশেরই প্রাচীন সমাজে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। দাস-প্রভুর সমাজ কখনই সামাজিক সাম্যের সমাজ নয়। আগেই দেখিয়েছি ইসলামী সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। দাসপ্রথার বাইরের মানুষরাও সামাজিক সাম্যের বলে বলীয়ান ছিলনা কোনও দেশেই। তবুও মহাশ্বেতা দেবীরা হিন্দু সমাজেই বর্ণবিদ্বেষ খোঁজেন!

চতুর্থ পর্ব

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়কে আমাদের আলোচনায় রেখেছি। উনি একদা কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র নেতা ছিলেন। বিদ্যাসাগর কলেজের ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়ন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমিও বিদ্যাসাগর কলেজে ছাত্র ফেডারেশন করতাম। সেই সূত্রে আমারও নেতা ছিলেন। পরে উনি অধ্যাপনা ও শিক্ষা রাজনীতি করতে থাকেন এবং কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হলে সি.পি.আই এর মধ্যেই থেকে যান। ওঁনার সঙ্গে মাঝে সাঝে দেখা হতো। লেখালেখি করে বুদ্ধিজীবি বলে উনি এখন পরিচিত। পোলান্ড ঘুরে এসে আউসউইজের বন্দীশিবিরের কথা উনি লিখেছিলেন *দেশ* পত্রিকায়। তখন থেকেই উনি বুদ্ধিজীবি। ইদানীং উনি গল্পও লিখছেন। *গুজরাট : নরমেধ যজ্ঞ* ও *গুজরাট দিচ্ছে ডাক*, দুটি পুস্তকেই তাঁর লেখা আছে। *গুজরাট দিচ্ছে ডাক* পুস্তকের একটি প্রবন্ধের নাম, *হিন্দু রাষ্ট্রের দিকে পঞ্চম পদক্ষেপ*। প্রবন্ধটি আরম্ভ হয়েছে, আর. এস. এস এর গুরু গোলওয়ালকরের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে:

অহিন্দুদের হিন্দী ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করতে হবে। ....তাদের অবশ্যই হিন্দু ধর্মকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির দৃষ্টিতে দেখতে হবে, হিন্দু জাতি ও সংস্কৃতিকে মহিমান্বিত করা ছাড়া অন্য কোনও ভাবনা কিছুতেই তারা পোষণ করতে পারবে না এবং তারা হিন্দু জাতির কাছে সম্পূণ অবনত হয়েই এ দেশে থাকতে পারে।

এখন গোলওয়ালকরের বক্তব্য বিচার করা যাক:

অহিন্দুদের হিন্দী ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করতে হবে।.......

এর বিপরীত বক্তব্য, হিন্দুদের উর্দ্ ভাষা ও ইসলামী সংস্কৃতি গ্রহণ করতে হবে। এটাই ছিল স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর বক্তব্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আলিগড় সায়েন্টিফিক সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন রাজা জয়কিষণদাস। জয়কিষণদাস একদা প্রস্তাব করলেন, সায়েন্টিফিক সোসাইটির কাজকর্ম হিন্দী ভাষাতেই চলুক। ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের খাতায় নাম লেখালেন সৈয়দ আহমদ। কারণ, তিনি মনে করলেন উর্দূ ভাষার ক্ষতি মুসলমানদের ক্ষতি। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন উত্তর প্রদেশের উর্দূভাষী হিন্দুরা সাস্কৃতিক দিক দিয়ে মুসলমানদের অনুগামী হবে।

সৈয়দ আহমদ খাঁর জবানীতে আলতাফ হোসেন হালি তাঁর আহমদ জীবনী *হায়াৎ-ই-জাভেদ*এ লিখেছেন, বারাণসীতে যখন এসব ব্যাপার চলছে তখন একদিন মিঃ সেক্সপিয়ারের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। তিনি আমার মতামত শুনে বললেন, এই প্রথম আপনার মুখ থেকে সমস্ত ভারতের উন্নতির পরিবর্তে শুধুমাত্র মুসলমানদের উন্নতির কথা বলতে শুনলাম। আমি উত্তর দিলাম, দুজনের সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই এমন কোনও উদ্যোগে দুটি জাতি নিজেদের মন ও আত্মাকে এক করতে পারেনা। যদিও উর্দূ ভাষার বিরোধিতা এখনও

খুব গুরুতর আকার ধারণ করেনি, আমার ধারণা বিরোধিতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে। কারণ শিক্ষিত মানুষরাই এই বিরোধী মানসিকতা পোষণ করছে। যারা অনেকদিন বাঁচবেন তারা আমার এই ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা দেখে যেতে পারবেন। ব্যাপারটা খুব গুরুতর—আমি তাঁর এই মন্তব্য স্বীকার করলাম। তবুও আমি জোর দিয়ে বললাম যে যা ভবিষ্যৎবাণী করছি তা ঘটবেই।

সৈয়দ আহ্মদ প্রত্যাশা করেছিলেন দীর্ঘকালের ঐতিহ্যযুক্ত একটি প্রাচীন জাতি তাঁদের আদ্য সংস্কৃত ভাষা ও তদ্ভব ভাষা সমূহ এবং তাদের লিপি ভুলে গিয়ে মাত্র কয়েক শতাব্দীব্যাপী ইসলামী শাসনের জের উর্দূ নামক একটি মিশ্রভাষা অবলম্বন করে তাঁদের সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ করবে।

মনে রাখতে হবে ঐ সময় উর্দূ সাহিত্যের পরিমন্ডল ছিল একান্তই ইসলামী। ইসলামী সংস্কৃতিতে ভরপুর এই সাহিত্য নান্দনিক দিক দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়েছিল হিন্দুদের কাছে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, প্রথম পর্যায়ের উর্দূ সাহিত্যের পরিমন্ডল বিরক্তিকর ভাবে অভারতীয়—পরিমন্ডল সম্পূর্ণভাবে পারসিক। এই পর্য্যায়ের উর্দূ কবিরা ভারতের ভৌগলিক বিষয়াবলী—হিমালয় পর্বত, গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-নর্মদা-গোদাবরী ইত্যাদি নদীরাজি কখনও উল্লেখ করেননি তাঁদের কাব্যের মধ্যে। উল্লেখ করেছেন তাঁদের অদেখা পারস্যের নদীর কথা, মধ্য এশিয়ার নদীর কথা। ভারতীয় পুষ্প-বৃক্ষরাজি এইসব কবিতায় উল্লিখিত নয়, উল্লিখিত পারস্যের পুষ্পবৃক্ষরাজি—যেগুলি শুধুমাত্র ভারতের দু একটি বাগানেই লভ্য। যাবতীয় ভারতীয় বিষয়াবলী, যা পারসিক সাহিত্যে নেই, সেগুলি থেকে জোর করে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে দৃষ্টিকে।

উর্দূ গদ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় পরিমন্ডল থেকে বিচ্যুতি দেখা গেল আরও শোচনীয়রূপে। ধর্মীয় বিষয় সমূহ রচিত হতে লাগলো আরবী বাক্যরীতি অনুসরণ করে। রোমান্টিক গদ্য কথা সাহিত্য নিমজ্জিত হলো *দস্তানের* কল্পনার মধ্যে। বিশেষতঃ আমীর হামজার কাহিনী যা থেকে জাভা পর্যন্ত প্রসারিত, তা-ই প্রাধান্য লাভ করলো উর্দূ গদ্য সাহিত্যে। আমীর হামজার সেনাদলেরা আয়ারদের সাহায্যে অবিশ্বাসীদের দুর্গ ও সেনাদলের উপর জয়লাভ করে। এই অবিশ্বাসীরা যাদু জানে, মন্ত্রপূত শহরে বাস করে। যাদুকররা সাহায্য করে তাদের। আয়ারদের সাহায্যে অবিশ্বাসীদের দুর্গ ও সেনাদলের উপর জয়লাভ করে।

উর্দূ কথা সাহিত্যের এই অবিশ্বাসী দুর্বৃত্তরা হিন্দু বলে আধা সনাক্ত হলো। মনে করা হলো দুই পক্ষের যুদ্ধের মধ্যে প্রতিফলিত অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষ।

মনে রাখতে হবে সৈয়দ আহমদ খাঁ ছিলেন **সংখ্যালঘিষ্ঠ** মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা। অথচ তিনি চেয়েছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় ভারতবিরোধী উর্দূ সাহিত্যের সেবক হোক। অথচ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের গোলওয়ালকর যখন হিন্দী ভাষা ও সংস্কৃতির কথা বলেছিলেন তখন সেটা অত্যন্ত দোষাবহ হয়েছে বলে জানাচ্ছেন আমাদের বুদ্ধিজীবি। মুসলমানরা তাদের ভারতবিরোধী সংস্কৃতি নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদের তত্ত্ব বহাল রেখে চলবে, এইটাই আমাদের বুদ্ধিজীবি আকাঙ্খা করেন।

তাদের অবশ্যই হিন্দু ধর্মকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে দেখতে হবে।

বিপরীত প্রতিজ্ঞা, হিন্দুধর্মকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখাটাই কি মুসলমানদের নীতি হবে? যা তাদের ধর্মগ্রন্থ শেখায়?

সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মকে যদি সংখ্যালঘিষ্ঠরা ঘৃণা করতে থাকে তবে ভারতে দাঙ্গার কোনও দিন শেষ হবেনা। ইতিহাস চর্চা করলে দেখা যায় ভারতে মারাত্মক সাম্প্রদায়িকতার শুরু হয় ইসলামের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। কারণ, সেই ভারতীয় ধর্মাবলীর প্রতি অশ্রদ্ধা। ভারতের প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় গুজরাটের কাম্বেতে, মধ্য একাদশ শতাব্দীতে। সেই দাঙ্গায় আশিজন নিহত হয় (মুহাম্মদ উফি, *জামি-উল-হিকায়াৎ*, এলিয়ট ও ডাউসন, দ্বিতীয় ভাগ)।

হিন্দু জাতি ও সংস্কৃতিকে মহিমান্বিত করা ছাড়া অন্য কোনও ভাবনা কিছুতেই তারা পোষণ করতে পারবে না এবং তারা হিন্দু জাতির কাছে সম্পূর্ণ অবনত হয়েই এ দেশে থাকতে পারে।

হিন্দু জাতির কথা বলেছিলেন গোলওয়ালকর। হিন্দু কারা? সৈয়দ আহমদ খাঁ বলেছিলেন, *আমি হিন্দু ও মুসলমানদের একই মনে করি, তাঁরা একই চক্ষু। আমার যদি একটাই চোখ থাকতো, তাহলে আমি তাদের সেই চোখটির সঙ্গেই উপমা দিতাম।....কওম শব্দটি দিয়ে আমি হিন্দু ও মুসলমান দুই ই বোঝাচ্ছি। আমি কওম শব্দ ব্যবহার করছি ইংরেজী নেশন অর্থে।*

ওই বক্তৃতাতে তিনি আরও বললেন, *কার কী ধর্ম সেটা আমার কাছে ন্যূনতম গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ব্যাপারটা সহজে চোখে ধরা পড়েনা। বাস্তব সত্য হলো হিন্দু-মুসলমান একই দেশে বাস করে এবং একই রাজার প্রজা।*

তিনি আবার বললেন, *ভারতে বসবাসকারী দুটি জাতই হিন্দু, অর্থাৎ হিন্দুস্থানে বসবাসকারী মাত্রই হিন্দু।*

তাহলে গোলওয়ালকর কি খুব অন্যায় কথা বলেছিলেন?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মপরিচয় প্রবন্ধে লিখেছেন, *হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয় বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনো একটি বিশেষ ধর্ম নয়। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম।* ঐ প্রবন্ধেই তিনি লিখেছেন, বাঙলার হাজার হাজার মুসলমান আসলে হিন্দুমুসলমান।

সুতরাং গোলওয়ালকারের বক্তব্যে কারা অসন্তুষ্ট হবে? যারা হিন্দুস্তানের মধ্যে বাস করে নিজেদের একটি পৃথক জাতি বলে মনে করে। জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় নিজেকে কি মনে করেন তা জানিনা, তবে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হওয়ার পরেও হিন্দুস্থানে এখনও অনেক পাকিস্তান প্রেমী রয়ে গেছে। বাঙালী বিদ্বান ধুর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পঞ্চাশের দশকে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। তিনি সঙ্ঘপরিবারের লোক ছিলেন, এমন দাবী আজ পর্যন্ত কেউ করেনি। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শেষে তিনি লিখেছেন, *এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশীর ভাগ ছাত্র ভারত সম্বন্ধে নিরাগ্রহ এবং অল্পসংখ্যক পাকিস্তানী।*

যারা নিরাগ্রহ তাদের মধ্যে কয়েকজন ছাত্র (এবং শিক্ষক) হালকা রকমের পাকিস্তানী। নানা রকমে পাকিস্তানের প্রতি এদের একটা টান রয়েছে।

একোবিংশ শতাব্দীতে অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। ভারতের মুসলমানরা নিজেদের এখন *মিল্লী* বলে পরিচয় দিচ্ছেন। তাঁরা অল ইন্ডিয়া মিল্লী কাউন্সিল গঠন করেছেন। *মিল্লী* শব্দের অর্থ জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় জানেন কিনা জানিনা। *মিল্লী* শব্দের অর্থ ইসলামী জাতি। দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ একটি পৃথক জাতিত্বে বিশ্বাসী। যে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়েছিল, তা এখনও সক্রিয় দেশের মাটিতে। ভারত আবার ভাগ হবে কিনা তা ভবিষ্যতই বলতে পারবে। তবে, ঘরপোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরানো খুবই স্বাভাবিক। আগেই লিখেছি, এ দেশে ভারত-পাক ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা লেগেছে।

মিল্লী এখন দাবী করছে ধর্মের ভিত্তিতে চাকরী সংরক্ষণ, প্রতিটি মন্ত্রিসভায় আবশ্যিকভাবে মুসলিম মন্ত্রী নিতে হবে। ধর্মের ভিত্তিতে ধর্মেতরবাদী রাষ্ট্রে চাকরী সংরক্ষণ সমর্থন করে দুটি ধর্মেতরবাদী রাজনৈতিক দল, তৃণমূল কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লক।

আর, বাঙলার ক্ষেত্রে ১৭৫৭ অব্দের আগে, গোটা উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে ১৮০৪ অব্দের আগে যে ইসলামী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে সাম্রাজ্যে বলা হতো, ইসলাম ধর্মকে অবশ্যই শ্রদ্ধা ও ভক্তির দৃষ্টিতে দেখতে হবে, ইসলামী জাতি ও সংস্কৃতিকে মহিমান্বিত করা ছাড়া অন্য কোনও ভাবনা কিছুতেই তারা পোষণ করতে পারবে না। এবং তারা ইসলামী জাতির কাছে সম্পূর্ণ অবনত হয়েই এ দেশে থাকতে পারে।

বিভেদমূলক ইসলামী আইনের বেড়াজালে কীভাবে হিন্দুরা বাস করতো তা ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত *ক্যালিইডোস্কোপ* পত্রিকা থেকে তথ্য উল্লেখ করে আগেই দেখিয়েছি। গোটা উত্তর-ভারতে হিন্দুদের বিয়ে রাত্রে হয়। অথচ রাত্রে যজ্ঞ করা বিধেয় নয়। দক্ষিণ ভারতে বিয়ে হয় দিনে। হিন্দু যুগে বিয়ে সর্বত্রই দিনে হতো। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য খুঁজলে কোথাও রাত্রিকালীন বিবাহের বর্ণনা পাওয়া যাবেনা। রাত্রিকালীন বিবাহের কারণ দিবালোকে বিবাহের আসর থেকে মুসলমানদের কনে তুলে নিয়ে যাওয়া। সে ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের বেড়াজালে আবদ্ধ হিন্দুদের কিছু করার থাকতো না।

কত সহজে হিন্দুদের আইনসঙ্গতভাবে বধ করা যেত তার একটা বর্ণনা আছে ইতিহাসে। প্রাক পলাশী বাঙলায় এক মুসলমান ফকির বৃন্দাবন নামক হিন্দুর বাড়ীতে আসে ভিক্ষার জন্য। যে কোনও কারণেই হোক বৃন্দাবন ফকিরকে বিমুখ করে। ফকির এতে ক্ষুব্ধ হয়ে বৃন্দাবনের বাড়ীর সামনে কটি ইঁট সাজিয়ে *কালান্দারী* মসজিদ তৈরী করে দিবারাত্র সেই মসজিদ থেকে চিৎকার করে *জিকর* দিতে থাকে। দিবারাত্র চিল চিৎকারে বিরক্ত হয়ে বৃন্দাবন একদা সেই সাজানো ইটগুলি ফেলে দেয়। ফকির কাজীর কাছে বৃন্দাবনের নামে ইসলাম অবমাননার অভিযোগ করে। কাজী বিচার করে বৃন্দাবনকে দোষী সাব্যস্ত করে নিজেই তীর মেরে বৃন্দাবনকে হত্যা করে।

যাকগে, শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের মূল বিষয়ে আসি। প্রবন্ধে তিনি ইতিহাস চর্চা

করেছেন। করতেই পারেন। কিন্তু সঠিক ইতিহাসের কথা উল্লেখ করা চাই। ঐতিহাসিক আজিজ আমেদের বহুপঠিত একটি পুস্তকের নাম, *স্টাডিজ ইন ইসলামিক কালচার ইন দি ইন্ডিয়ান এনভাইরনমেন্ট।*

আগেই বলেছি, সেই পুস্তকে তথ্য উল্লেখ করে লেখা হয়েছে, ১৫২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের আদেশে তাঁর সেনাপতি মীর বাঁকি রামজন্মভূমি মন্দির ভেঙ্গে তার স্থলে মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তকের কেউ প্রতিবাদ করেনি, বলেনি ভুল ইতিহাস লেখা হয়েছে। আজ ইসলাম-ধর্মেতরবাদী অন্ধ চোখে শুধু বাবরী মসজিদই দেখছে। ভেঙ্গে দেওয়া রামমন্দিরকে দেখছে না।

মন্দির-মসজিদ বিতর্ক ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের চেয়ে অনেক প্রাচীন। এর ইতিহাস আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। ১৮৫৭ অব্দে বরং হিন্দু-মুসলমান একটা সমঝোতায় আসে। অযোধ্যার বেগম হিন্দুদের রামজন্মভূমি ফেরত দিতে রাজী হন বিদ্রোহের স্বার্থে। এটাই ইতিহাস। সিপাহীরা পরাজিত না হলে আজকের মসজিদ-মন্দির বিতর্ক থাকতো না। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের গোলমালের দায়িত্ব আর.এস.এসের কাঁধে চাপিয়েছেন শ্রী চট্টোপাধ্যায়, তথ্যসূত্র উল্লেখ না করেই। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম নেওয়া সঙ্ঘ যদি ১৯৩৪ এ অত শক্তিশালী হয়ে যায় তা হলে প্রমাণ হয় তার পিছনে বিশাল জনসমর্থন রয়েছে। আবার ঐ ১৯৩৪ সালে বিহারের ভূমিকম্পের সময় তিনি সেবাকার্যের সময় আর.এস.এস কে খুঁজেছিলেন, পাননি। তবে ভুজের ভূমিকম্পের সময় সেখানে তিনি আর আর.এস.এসকে খোঁজেননি। খুঁজলে বোধহয় সেখানেও পেতেন না। কিন্তু তিনি বাংলার স্বেচ্ছাসেবীদের কথা লিখেছেন। এইসব বক্তব্য প্রমাণ করে শ্রী চট্টোপাধ্যায় আদ্যন্ত হিন্দুবিরোধী, ব্রিফ ধরেছেন ইসলামী মৌলবাদীদের হয়ে। তিনি বিশুদ্ধ হিন্দু-মুসলিম বিতর্কের মধ্যে সর্বদা আর.এস.এস কে খুঁজছেন। কেবল ১৮৫৭ অব্দে আর.এস.এসকে খুঁজে পাননি।

শ্রী চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালোরে আর.এস.এস অধিবেশনের কথা লিখেছেন, সেখানে বলা হয়েছে, সংখ্যালঘিষ্ঠদের নিরাপত্তা সংখ্যাগুরুদের শুভেচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি এই বক্তব্য অত্যন্ত অন্যায় বলেই মনে করছেন। কিন্তু এর বিপরীত প্রতিজ্ঞাটি কি ঠিক-- <u>সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সংখ্যাগুরুদের কু-ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল বা, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সংখ্যাগুরুদের শুভেচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়?</u>

সংখ্যাগুরুরা সামগ্রিকভাবে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির হয়ে গেলে যে কোনও দেশে সংখ্যালঘুদের বাস করাই অসম্ভব হয়ে উটবে। আর সংখ্যালঘুদের প্রতি শুভেচ্ছা না থাকলে তিনি কলম ধরেছেন কেন?

আর.এস.এস এর ঐ বক্তব্য দেশ-কাল নিরপেক্ষ সত্য। বাঙলাদেশের প্রতিটি মুসলমান যেদিন হিন্দু বিরোধী হয়ে উঠবে সেদিন বাঙলাদেশে একটি হিন্দুও বাস করতে পারবে না। পাকিস্তানের আইন কানুন হিন্দুবিরোধী। এমনিতেই সে দেশে হিন্দুর পরিমাণ ১ শতাংশের কম। শতবর্ষ পরে সে দেশে একটি হিন্দুও পাওয়া যাবেনা। একদা বহু খ্রীষ্টানের দেশ তুরস্কে

এখন খ্রীষ্টানদের সংখ্যা অতি অল্প। কেবলমাত্র কতকগুলি শহরেই তাদের দেখা যায় অল্প সংখ্যায়। অথচ খোদ ইস্তানবুল শহরে একদা তারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেই শহরেই এখন তাদের সংখ্যা নগন্য। কারণটা সেই সংখ্যাগুরুদের শুভেচ্ছার অভাব। রাষ্ট্র হিসাবে তুরস্ক ধর্মেতরবাদী। সেখানে সংখ্যালঘুদের প্রতি পাকিস্তানের মত আইনী পীড়ন নেই। তবুও খ্রীষ্টানরা তাড়িত। কারণ, কাফের খ্রীষ্টানদের প্রতি মুসলমানদের কোনও শুভেচ্ছা নেই।

লেখক ঐ প্রবন্ধের শেষে এক শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী দলের কথা উল্লেখ করেছেন। দল খালসা নামের ঐ দল নাকি বলেছে, ...আজ ওরা মুসলমানদের ধমকাচ্ছে, কাল ওদের লক্ষ্য হবে শিখরা।

এই থেকে লেখকের মানসিকতা উপলব্ধি করা যায়।

দুই

গুজরাট: নরমেধ যজ্ঞ পুস্তকেও ইতিহাস চর্চা করেছেন আমাদের বুদ্ধিজীবি।

এতে লেখক আপত্তি করেছেন মধ্যযুগকে অন্ধকার যুগরূপে চিহ্নিত করার ব্যাপারটিকে। তাতেই নাকি 'ব্রিটীশ শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু মনে' কালো মেঘ জমেছে। সেই কালো মেঘের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তিনি। বলেছেন কিরণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ভারতে যবন' (১৯৭৮) নাটকের কথা। সে নাটকে মুসলমানদের নানা অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে। ভারতলক্ষ্মীর মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে, "যতদিন আর্যসন্তানগণ পূণ্যভূমি হতে যবনগণকে দূরিভূত করতে পারবে, ততোদিন অবধি প্রিয় ভারতভূমির সুখে বঞ্চিত হলেম, আদরের আর্যসন্তানগণের নিকট হতে বিদায় হলেম।"

এই সমস্ত নাটকের প্রক্রিয়াতেই নাকি ব্রিটীশ আমলে দাঙ্গা বাঁধতো।

লেখকের সিদ্ধান্ত সেই *সাম্প্রদায়িক ত্রিকোণ*: ব্রিটীশ আসার আগে সব ঠিক ছিল। রিজভী দেখিয়েছেন প্রাক-ব্রিটীশ যুগেও ভারতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লাগতো। আমরা তা আগেই দেখিয়েছি, নীরোদ চন্দ্র চৌধুরী সমসাময়িক পত্রপত্রিকা থেকে দেখিয়েছেন ভারতে ব্রিটীশ শাসন যখন ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি তখনও বারানসী ও অন্যত্র হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লেগেছে। ওয়াহাবী ও ফরাজীরা দাঙ্গা করেছে। করেছে হিন্দুদের বাড়ী লুটপাঠ, হিন্দু নারী ধর্ষণ ও ধর্মান্তরকরণ। সৈয়দ আহমদ খাঁ সিপাহী বিদ্রোহের ময়না তদন্ত করতে গিয়ে হিন্দু-মুসলমান *দুটি বিবদমান জাতি* বলে রায় দিয়েছিলেন। তখনও মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন তাঁর ইতিহাস বিখ্যাত উক্তি, 'ভাগ করো ও শাসন করো' উচ্চারণ করেননি। সৈয়দ আহমদ খাঁ ব্রিটীশ সেনাদলকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন ইংরেজদের।

ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানদের স্মৃতিতে ইসলামী সাম্রাজ্যবাদের দিনগুলি কেমন ছিল তা আগেই দেখিয়েছি। বিদ্যাসাগর লিখেছেন সিরাজউদ্দৌলার আমলে "প্রায় কোনও ব্যক্তির সম্পত্তি বা কোনও স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা পায় নাই।" মনে রাখতে হবে সেই সময় সিরাজের আমলের স্মৃতি নিতান্তই ক্ষীণ হয়ে যায়নি। বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও বা ডিরোজিয়ানরা নিশ্চয় শ্রী চট্টোপাধ্যায় কথিত হিন্দুরাষ্ট্র পরিকল্পনার মধ্যে ছিলেন না। তারও আগেকার কথা শোনা

যাক: বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গল কাব্যে ইসলামী যুগে হিন্দুরা কীভাবে লাঞ্ছিত হতো তার বিবরণ আছে:

যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলেবান্ধি নেয় কাজির সাক্ষ্যাৎ ।।
বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্র কিল।
পাথরের সমান যেন ঝড়ে পড়ে শিল।।
ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে ।
কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুতু দেয় মুখে। ।

সুতরাং, কিরণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের নাটকে যথার্থ ইতিহাসই বর্ণিত হয়েছে। শ্রী চট্টোপাধ্যায় এই ইতিহাস গোপন করতে চান। কারণ, হিন্দুদেরই অত্যাচারী বলে অভিক্ষেপ করতে অভিলাষী তিনি।

'এখনও এখনও যদি ঘরে বসে নিজেকে বাঁচাই' বাকী অংশ জুড়ে তিনি গোধরা কান্ড নিয়ে গবেষণা করেছেন। একমাত্র উদ্দেশ্য কি করে হিন্দুদের ঘাড়েই অগ্নিসংযোগের দোষটা চাপানো যায়। এর জন্য তিনি পুর্বোক্ত তাজুদিনের গল্পটি খেয়েছেন। লিখেছেন ১৬ বছরের মেয়ে তুলে নেওয়ার ঘটনা। তবে, 'নাকি' শব্দটি ব্যবহার করে। কোনও শিক্ষিত লোক যে দাঙ্গার মত স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে 'নাকি' দিয়ে ছড়ানো গুজব অবলম্বন করে নিবন্ধ লিখতে পারেন, তা এইসব লেখা পড়ার আগে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। বস্তুতঃ যে কোনও অসম্ভব গল্প তিনি খেতে প্রস্তুত। একমাত্র উদ্দেশ্য হত্যার অভিযোগ থেকে ইসলামী মৌলবাদীদের রেহাই দেওয়া। এর জন্য তিনি যে কোনও কিছু শুনতেও প্রস্তুত। যেমন তিনি শুনেছেন, আর.এস.এস এর সংঘটিত দাঙ্গাবাজরা গোধরা কান্ড ঘটিয়েছে। এই বয়সেও তাঁর কান শোনে ভাল। হিটলার যেমন ইহুদী ও কমিউনিস্টদের কোতল করার জন্য জার্মানীর পার্লামেন্ট জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তেমনই গোধরায় আর.এস.এস ট্রেনের কামরা জ্বালিয়ে দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে সাহাবুদ্দিনের *মুসলিম ইন্ডিয়া* পত্রিকাতেও কিন্তু এ ধরনের অস্বাভাবিক উচ্চারণ নেই। সেখান দাঙ্গার জন্য গুজরাট সরকারকে দায়ী করা হয়েছে, যা স্বাভাবিক।

নরেন্দ্র মোদীর সেই অনুচ্চারিত নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রের কথাও আছে শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের রচনায়। শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের মতে হিন্দু বলে গর্বিত হওয়া উচিত নয়, হিন্দু হওয়ার জন্য লজ্জিত থাকা উচিত। হিন্দু বলে গর্বিত হলেই নাৎসী হয়ে যায়। কমিউনিজম নিয়ে গর্বিত হলে যে মানুষ স্টালিন হয়ে যায়, পলপট হয়ে যায়, মাও সে তুং হয়ে যায়, সেটা উহ্য রেখেছেন তিনি। গোটা ভারত জুড়ে যে সন্ত্রাসবাদ চলছে, পার্লামেন্ট আক্রান্ত হচ্ছে, আক্রান্ত হচ্ছে আমেরিকান সেন্টার, অপহৃত হচ্ছে বড় বড় ব্যবসায়ীরা, বিস্ফোরণ ঘটছে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে। অক্ষরধাম মন্দিরে আত্মঘাতী বাহিনী ঢুকে বৈষ্ণব ভক্তদের হত্যা করছে, যবদ্বীপের বালীতে ক্লাবে বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে, সেটা কে কি বলে গর্বিত হওয়ার জন্য সে কথা লেখেননি তিনি। কে কি বলে গর্বিত হওয়ার জন্য গড়িয়াহাটের ব্রিজের উপর ১৭ জন

হিন্দু সন্ন্যাসী পুড়েছিল, গভীর রাতে জয়নগরের খাকুড়দহ গ্রামে এক বৈষ্ণব মঠে নব্বই বছরের বৃদ্ধ মহান্ত মারা পড়েছিলেন রমজান মাসে মাইকে হরিনাম করার জন্য, সেসব কথা তাঁর লেখায় নেই। এই গুজরাট কান্ডেই এক পুলিশ অফিসারকে ধর্মস্থানের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছিল কারা কি বলে গর্বিত হওয়ার জন্য, তিনি উহ্য রেখেছেন সে কথা। নানুরের সূচপুরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু জনমজুরদের যারা নির্মমভাবে হত্যা করেছিল, তারা কে কি বলে গর্বিত হওয়ার জন্য এ কাজ করেছিল, তাও লেখেননি শ্রী চট্টোপাধ্যায়।

এবার মরিচঝাঁপির কথায় আসা যাক। কমিউনিস্টরা পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের বাঙলার বাইরে পূনর্বাসনের প্রচন্ড বিরোধী ছিলেন। কংগ্রেস আমলে তাঁরা দন্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের সুন্দরবনে পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিতেন। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে জানুয়ারী জ্যোতি বসু ভিলাইতে দন্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের ডেকে বললেন, সি.পি.এম ক্ষমতায় এলে তাঁদের পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসবেন। সুন্দরবনে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবী অবশ্যই পূরণ করা হবে।

তারপর ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা যখন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলেন তখন তাঁরা দন্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের সুন্দরবনে পুনর্বাসনের আশ্বাস তুলে নিয়ে বলতে লাগলেন, এখানে জায়গা নেই।

১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে দন্ডকারণ্যের মাল্কানগিরি এলাকার উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে আসতে আরম্ভ করেন। তখন সিপিএম নেতারা শুধু যে তাদের দন্ডকারণ্যে ফেরত পাঠাতে ব্যস্ত হলেন না, উদ্বাস্তুদের চক্রান্ত করে পশ্চিমবঙ্গে আনা হয়েছে বলে তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। উদ্বাস্তুরা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও জায়গায় পুনর্বাসন চায়নি। তারা পূর্ব প্রতিশ্রুত সুন্দরবনের সেই এলাকাতেই বসবাসের দাবী করেছিলেন যেখানে লোক বসতি হয়নি, আবার সেখানে সে রকম বনও নেই। মরিচঝাঁপি এমনই একটি দ্বীপ যেখানে লোকবসতি ছিলনা, আবার জোয়ারের জলে ভেসে যাওয়ার জন্য ছ ফিটের বড় গাছও নেই। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ ই এপ্রিল দশ হাজার উদ্বাস্তু পরিবার কুমীরমারী পার হয়ে মরিচঝাঁপিতে আশ্রয় নেয়। তারা কোনও রকম আর্থিক সাহায্য চায়নি। শুধুমাত্র ভারতের নাগরিক হিসাবে মরিচঝাঁপিতে থাকতে চেয়েছিল। সিপিএম এইসব উদ্বাস্তুদের প্রতি সদয় ছিলনা। কারণ, সিপিএম চেয়েছিল দন্ডকারণ্যের এইসব উদ্বাস্তুরা দন্ডকারণ্যেই থেকে সিপিএম করুক, ফলে উড়িষ্যা-মধ্যপ্রদেশের বিধানসভায় সিপিএমের স্থান হোক। কিন্তু উদ্বাস্তুরা রাজনীতি করতে চায়নি।

শেষ পর্যন্ত বহু টানা পড়েনের পর মুসোলিনীর কায়দায় মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুমুক্ত করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সিপিএমের রাজ্য কমিটি সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়, "প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করে দন্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে সরিয়ে দিন।" কীভাবে সরানো হলো তার বিবরণ প্রথমে শৈবাল গুপ্তের কলম থেকে নেওয়া যাক:

"তাঁরা যে নিজেরা কোনও সাহায্য করেননি শুধু তাই নয়, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি যে সব বেসরকারী সংস্থা সাহায্য বিতরণ করেছিল, তাদেরও চলে যেতে বাধ্য করলেন। সহায় সম্বলহীন উদ্বাস্তুরা মাছ ধরে বা কাঠের জিনিষ তৈরী করে এবং অন্যান্য

উপায়ে যে জীবিকার সংস্থান করছিলেন, তাও বন্ধ করলেন। ভেড়ি কেটে পুলিশ ও বনবিভাগের লঞ্চ লেলিয়ে মাছের নৌকা ভেঙ্গে দিয়ে। তাতে যে প্রাণহানির সম্ভবনা আছে সে সম্বন্ধে তারা নির্বিকার। ১৯৭৮ সালের ১৯ শে আগস্ট বহু পুলিশ ও কুড়িটি লঞ্চের সাহায্যে সামরিক কায়দায় নদীপথ অবরোধ করা হল এবং উদ্বাস্তুরা তাতেও দমে না দেখে ৬ ই সেপ্টেম্বর সেইসব লঞ্চ চালিয়ে উদ্বাস্তুদের রসদ জ্বালানি কাঠ ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ বোঝাই করা ২০০ টি নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া হল।"

শেষে বাম ফ্রন্ট সরকার ১৯৭৯ অব্দের ২৪ শে জানুয়ারী মরিচঝাঁপি দ্বীপ অবরোধ করেন। কুমীরমারি থেকে খাদ্য ও পাণীয় জল বন্ধ করে সরকার উদ্বাস্তুদের অনাহারে ও অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে ঠেলে দেন। একেবারে শেষে ৩১ শে জানুয়ারী চরম আঘাত। নানা দিক থেকে আক্রমণ করে পুলিশ ও সিপিএমের ক্যাডার বাহিনী ৩০০ রাউন্ড গুলি চালিয়ে ১৫০ জন উদ্বাস্তুকে গুলিবিদ্ধ করে। নিখোঁজ হয় বহু উদ্বাস্তু। তাতেও ব্যাপারটা শেষ হলোনা। ১২, ১৩, ১৪ মে তারিখে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের জোর করে ধরে লঞ্চবন্দী করে ফাঁকা করা হলো মরিচঝাঁপি।

মরিচঝাঁপির অত্যাচারের খতিয়ান :

২৪.১. ৭৯ তারিখের অবরোধের পর থেকে অনাহারে মৃত্যু ১৩৬ জন

২৪.১.৭৯ তারিখের পর থেকে অবরোধের জন্য অখ্যাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু ২৩৯ জন

৩১.১.৭৯ তারিখে পুলিশের গুলিতে নিহত ১৪ জন।

৩১.১.৭৯ তারিখে গুলিচালনার দিন ও তার পরে পুলিশের দ্বারা ধর্ষিতার সংখ্যা ২৪ জন।

৩১.১.৭৯ তারিখের পর থেকে নিখোঁজ ব্যক্তিদের সংখ্যা ১২৮

এই মানবিকতা বিরোধী নির্মম অত্যাচার কারা কি বলে গর্বিত হওয়ার জন্য করেছিল তা যদি একটু খোলসা করে বলেন শ্রী চট্টোপাধ্যায়!

তিন

শ্রী চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন বিজেপির শাসনে সারা দেশে মগজ ধোলাই চলছে ইতিহাস বদলে দিয়ে। আমরা দেখিয়েছি, ছেলেদের এখন যা ইতিহাস পড়ানো হয় তা বিকৃত ইতিহাস। শিশুকাল থেকে ছেলেদের মগজ ধোলাই করে শেখানো হয় যে এক ইসলামী মৌলবাদী ছিলেন আদতে দেশপ্রেমিক। বিজেপি ইতিহাস বিকৃত করছে, এ অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শ্রী চট্টোপাধ্যায় আরও লিখেছেন, গুজরাটে শেখানো হচ্ছে হিটলার বড় মাপের দেশপ্রেমিক ছিলেন।

এটা গোয়েবলসীয় মিথ্যা কথা! এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় নিত্যপ্রিয় ঘোষ লিখেছেন,"২৩ শে এপ্রিল লোকসভায় তুমুল আলোড়ন, গুজরাটে শিক্ষাব্যবস্থার গৈরিকীকরণ। উপলক্ষ গুজরাট

রাজ্য বোর্ডের পরীক্ষার ইংরেজী প্রশ্নপত্রে কয়েকটি বাক্য, যার উদ্দেশ্য নাৎসীদের জয়গান করা, নাৎসী আদর্শ প্রচার করা। পরের দিন যথারীতি সম্পাদকীয় লেখা হলো বড় বড় সংবাদপত্রে গৈরিক শিক্ষার বিরুদ্ধে। অথচ লোকসভাতেই জানানো হলো বাক্যগুলি নেওয়া হয়েছিল অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক থেকেই। বাক্যগুলির রচয়িতা হলেন ই এম ফস্টার, যার উদ্দেশ্য ছিল নাৎসীদের ব্যঙ্গ করা। যাঁরা irony বুঝতে পারেন না, তাঁদের আলোকিত করা কোন ব্যবস্থায় সম্ভব! সাংসদরা হয়তো না জেনেই সন্দেহ করেছিলেন, কিন্তু সেটা জানার পর ও সম্পাদকীয় লেখার কারণ ? রোজ তিনটে করে সম্পাদকীয় লিখতে হবে, সম্পাদকীয়ের বিষয় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা, আর গৈরিক বাহিনীকে কারণে অকারণে আক্রমণ করাটা politically correct ? আরও পরিহাসের বিষয়, প্রশ্নটা যিনি করেছিলেন তিনি করেছিলেন গুজরাটের দাঙ্গার এক বছর আগে এবং তিনি একজন মুসলিম শিক্ষয়িত্রী।"

শ্রী চট্টোপাধ্যায় জেনে শুনে মিথ্যা কথা প্রচার করছেন!

ইতিহাস বিকৃতিকরণ প্রসঙ্গে আরও কিছু তথ্য দেওয়া যাক। এগুলি অবশ্য পুরানো। কিন্তু এগুলির গুরুত্ব অসীম। কারণ, ভুল ইতিহাস শিখিয়েই বরাবর হিন্দুদের ভিলেন বানানো হচ্ছে। হিন্দুদের চোখে দেখানো হচ্ছে ক্রোধের আগুন। বিপরীতে প্রচার করা হচ্ছে ইসলাম মানে শান্তি। ইসলামে জাতিভেদ নেই। আজকের ধর্মেতরবাদীদের হিন্দুবিরোধী ভূমিকার জন্যই দেশের সবকিছু অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে। গুজরাট দাঙ্গার ব্যাপারে সবকিছু মিথ্যা রটনা করেছে ধর্মেতরবাদী সংবাদ মাধ্যম ও ধর্মেতরবাদী বুদ্ধিজীবীরা। আমরা দেখিয়েছি *মুসলিম ইন্ডিয়া* শুধুমাত্র প্রশাসনকে দোষ দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু করেনি। তারা অবশ্য এইসব ধর্মেতরবাদীদের বক্তব্য মুদ্রিত করেছে নিজস্ব কাগজে। না করার কারণ নেই।

রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুসারে ইতিহাসকে বিকৃত করার কাজ আজ শুধু রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, আজ এটা অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে তথাকথিত ঐতিহাসিকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে।....ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রভাবে যে সব ইতিহাস লেখা হচ্ছে তার মূল দিক নির্দেশই হল, মুসলমান শাসকেরা সবাই ধর্মের ব্যাপারে উদার ছিল দেখাতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে হিন্দু মন্দির ভাঙার অভিযোগকে নিন্দা করতে হবেনা।"

কেমন করে ইতিহাস বিকৃতির এই ধারা চরমতম অবস্থায় পৌঁছলো সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "যখন রাজনীতিক তথা ঐতিহাসিক লালা লাজপত রায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন, "মধ্যযুগে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণ সম্পূর্ণরূপে মিলেমিশে এক ভারতীয় জাতি হয়ে উঠেছিল। যেমন করে ইংলন্ডে অ্যাঙ্গলো স্যাক্সন, জুট, ডেন ও নর্মানরা মিলে এক ইংরেজ জাতি হয়ে উঠেছিল।" তাঁর আর একটি সিদ্ধান্ত "মুসলিম শাসনের যুগ বিদেশীদের শাসিত পরাধীনতার যুগ ছিলনা," এখন বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের স্লোগানে পরিণত হয়েছে।"

লালা লাজপত রায়ের সময় কংগ্রেসের নেতারা নতুন করে ইতিহাস রচনা করার প্রচেষ্টা

চালাননি। তাঁরা হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের কুৎসিত ইতিহাস অবজ্ঞা করেই ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু ১৯৩১ অব্দের কানপুর দাঙ্গার পর কংগ্রেসের এক রিপোর্টে প্রস্তাব করা হলো হিন্দু-মুসলিম শত্রুতার ঘটনাকে গোপন করে দিয়ে নতুন করে ইতিহাস রচনা করতে হবে।

কংগ্রেসী অপলাপবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক অবশ্যই পন্ডিত জওহরলাল নেহরু। ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি প্রায় অশিক্ষিতই ছিলেন বলা যায়। সুতরাং তাঁর স্তাবকেরা সন্দেহের অবকাশে তাঁর মুক্তির দাবী তুলবেন। যে কোনও বিচারই বলে তাঁর ইতিহাস-চর্চা হচ্ছে মুসলিম অত্যাচারীদের মহীয়ান করে তোলার এবং তাদের মানবিকতার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধগুলি অস্বীকার বা গোপন করার কতকগুলি কাঁচা বর্ণনা। গজনীর মাহমুদের সভা ইতিহাসকার উথবী লিখেছেন, মাহমুদ মন্দির নগরী মথুরার প্রশস্তি গাইলেন এবং পরক্ষণেই সেই মন্দির নগরী ধ্বংস করতে উদ্যত হলেন। নেহরু উথবীর রচনার নিষ্ঠুর ব্যঞ্জনা লক্ষ্য না করে ভাবলেন ধ্বংসকারী গজনীর মাহমুদ মন্দির নগরীর প্রশস্তিই গেয়েছেন। নেহরু লিখলেন: "সৌধসমূহ মাহমুদকে আকৃষ্ট করতো। মথুরা শহর দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। মথুরা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "বিশ্বাসীদের দৃঢ় বিশ্বাসের মত এখানে আছে সহস্র সুদৃঢ় অট্টালিকা। শহরের এই সুদৃশ্য অবস্থায় উপনীত হতে নিশ্চয় বহু কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। দুশো বছরের আগে এমন একটা শহর নির্মাণ করা সম্ভব হবেনা।"

জওহরলাল অস্বীকার করলেন যে মাহমুদের বিধ্বংসী আক্রমণের পিছনে কোনও ধর্মীয় মানসিকতা কাজ করেছে। তিনি লিখলেন, মাহমুদ কোনও ধার্মিক ব্যক্তি নন, ঘটনাক্রমে তিনি একজন মুসলমান। তিনি প্রথমতঃ একজন যোদ্ধা এবং একজন বীর যোদ্ধা।

কিন্তু মাহমুদ সচেতনভাবেই একজন ধার্মিক ব্যক্তি। সমকালে মাহমুদের ভারত আক্রমণের ধর্মীয় লক্ষ্য সম্বন্ধে উথবী লিখেছেন, নিজের আত্মার কল্যাণের জন্য প্রতিদিন রাতে কোরান কপি করতেন তিনি। পৌত্তলিকদের ত্রস্ত ও অপমানিত করার জন্য লুণ্ঠন করার মত কিছু নেই এমন মন্দিরও তিনি আক্রমণ করতে গিয়ে বহুবার নিজের জীবন বিপন্ন করেছিলেন। পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে প্রতিটি অভিযানের সময় তিনি কোরান থেকে যথাযথ উদ্ধৃতি দিতেন। ভারতের সাধারণ মুসলমানরা তাঁকে ইসলামের বীর যোদ্ধারূপে বর্ণনা করেন এবং তাতে ইতিহাসের প্রতি সুবিচারই হয়। সাধারণ মুসলমানরা জওহরলালের মত অপলাপবাদী নন।

কংগ্রেসী অপলাপবাদীদের মধ্যে সেরা হচ্ছেন ডঃ বিশ্বেম্ভরনাথ পান্ডে। তিনি *ইসলাম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান কালচার* নামক একটি পুস্তক লিখেছেন। তাতে ঔরঙ্গজেব কর্তৃক বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংসের এক অপূর্ব অজুহাত খাড়া করেছেন। সেই গল্পে দেখা যায় কচ্ছের রাণীকে মন্দির মহান্ত মন্দিরের গর্ভগৃহে ধর্ষণ করেছিল। মন্দির অপবিত্র করার অভিযোগে ঔরঙ্গজেব মন্দির ধ্বংসের আদেশ দেন।

বিশ্বম্ভরনাথ পান্ডের তথ্যসূত্র আবার ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়ার *দি ফেদারস অ্যান্ড দি স্টোনস*। মজার ব্যাপার হচ্ছে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য কোনও দায়িত্বশীল ঐতিহাসিক পেলেন না, পেলেন একজন কংগ্রেসীই। আবার পশ্চিমবঙ্গের আর এক গাঁধিবাদী এই গুল্প লিখেছেন

তাঁর দাঙ্গা সংক্রান্ত পুস্তকে! আর এটাই হয়ে গেছে বিভিন্ন হিন্দু বিদ্বেষীদের কাছে পরম প্রার্থিত সংবাদ। তাঁরা যত্র তত্র ব্যবহার করছেন এই অপলাপবাদ। কোনও কোনও বুদ্ধিজীবি আবার এমনই বেহেড মাতাল যে মদের ঝোঁকে বারাণসীর মন্দিরের জায়গায় লিখে বসেন পুরীর মন্দির। এবং গেঁজেল সম্পাদক সম্পাদনা করার সময় সেটা বহাল রাখেন।

সুতরাং শ্রী চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাস পূর্ব থেকেই বিকৃত হয়ে আছে তেরঙ্গা ও লাল অপলাপবাদীদের দ্বারা। সেই ইতিহাসের রঙকে সাদা করা প্রয়োজন। তা মার্ক্স দিয়েও হবেনা, গ্রামসী-ফুকো দিয়েও হবেনা। সাদা হবে শুধু ঐতিহাসিকদের সততার দ্বারা। সেই ইতিহাসই কেবলমাত্র ভারতের সাম্প্রদায়িকতা দূর করতে পারে।

পঞ্চম পর্ব

দেবেশ রায়

দেবেশ রায় মূলতঃ কথাসাহিত্যিক। এক সময় সত্যই ভাল গল্প লিখতেন। এখন ঢাউস সাইজের *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* লিখে ঔপন্যাসিকরূপে খ্যাত। একদা জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজে বাঙলা পড়াতেন। সেই সময় শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতিও করতেন। এখন উনি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি। *গুজরাট দিচ্ছে ডাক* এবং *গুজরাট: নরমেধ যজ্ঞ*, দুটি পুস্তকেই তাঁর লেখা আছে। আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, *গুজরাট : নরমেধ যজ্ঞ* পুস্তকে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ, *দাঙ্গা এখন রাজনীতির পদ্ধতি* নামক প্রবন্ধ। কারণ, আমরা আগেই বলেছি ইসলামী মৌলবাদীদের অপরাধ লঘু করার জন্য ধর্মেতরবাদীরা সর্বদা সক্রিয়। কংগ্রেসী ও লালপন্থীরা কীভাবে ইতিহাস বিকৃত করে বর্বর ইসলামী মৌলবাদীদের নানা দুষ্কর্ম থেকে রেহাই দিতে চেয়েছে, তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি। এই প্রবন্ধে দেবেশ রায়ের বক্তব্য, গোধরা অগ্নিসংযোগের ঘটনা নিতান্তই সামাজিক অপরাধ, অপরাধীদের 'মুসলমান' বলে চিহ্নিত করা অন্যায়। তাদের সাধারণ দুষ্কৃতকারী বলেই ধরে নিতে হবে।

আমরা আগেই *ফ্রন্টলাইন* পত্রিকার ডায়োন বুনশার বিশ্লেষণ জেনেছি। বুনশার ঐ রচনা ঘটনার অনেক পরে লেখা এবং যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের পর নানা বিবেচনা করেই বুনশা ঐ নিবন্ধ লিখেছেন। ঐ নিবন্ধে ট্রেনের পাঁচ মিনিট বিরতির মধ্যে একজন ভেন্ডারের সঙ্গে একজন চা ক্রেতার বিবাদের কথাই লেখা আছে। বিবাদের পরে পার্শেল অফিসের পিছন থেকে মুসলমানদের পাথর ছোঁড়ার কথাও আছে। বুনশা যদিও যাত্রীদের পাল্টা পাথর ছোঁড়ার কথা বলেছেন, কিন্তু পাথর ছোঁড়া যাত্রীদের পক্ষে সম্ভব নয় কেন, তা আগেই বিশ্লেষণ করেছি।

এখন একজন চা বিক্রেতাকে একজন ক্রেতা পয়সা না দেওয়ার জন্য যদি একটি সম্পূর্ণ ট্রেনের কামরা পেট্রল/ডিজেল ঢেলে জ্বালিয়ে দেয় কিছু লোক, তাহলে প্রশ্ন ওঠে আমরা কি নেকড়ের সমাজে বাস করি, না মানুষের সমাজে বাস করি? নেকড়েদের সঙ্গে কি মানুষের মত ব্যবহার করতে হবে?

ব্যাপারটা একজন চা বিক্রেতা সঙ্গে একজন ক্রেতার বিবাদের ফল কখনই নয়। ডায়োন বুনশার বিবরণই জানিয়ে দিচ্ছে ব্যাপারটার মধ্যে একাধিক ইসলামী মৌলবাদী প্রথম থেকেই জড়িত। প্লাটফর্ম থেকেই আরম্ভ হয়েছে পাথর ছোঁড়া। সঙ্গে সঙ্গে মসজিদ থেকে উত্তেজক প্রচার। আর 'ধর্মেতরবাদী' সংবাদ মাধ্যমগুলি যে প্রথম থেকেই ইসলামী মৌলবাদীদের অপরাধকে লঘু করে দেখাতে চাইছে তার প্রমাণ তাজুদিনের গল্প, ভিজু বি'র গল্প। এইসব আজগুবি গল্প সংবাদ মাধ্যমের পরম আকাঙ্খিত। এইসব গল্পের উপর ভিত্তি করে যে যা চিঠি লিখেছে, নিবন্ধ লিখেছে, তাও যত্ন করে ছেপেছে পত্রিকাগুলি।। এইসব আষাঢ়ে গল্পের প্রতিবাদে যুক্তি দিয়ে কেউ কিছু লিখলে তা আশ্রয় পেয়েছে পরিত্যক্ত কাগজের ঝুড়িতে।

গোধরা হত্যাকান্ড নিয়ে নানা প্রতিবেদক নানা গল্প তৈরী করেছেন। উদ্দেশ্য একটাই— ব্যাপারটা যে পূর্বপরিকল্পিত নয় সেটা পাঠককে বুঝিয়ে ছাড়বেন। আর এর জন্য দায়ী অবশ্যই করসেবকরা!

মহাশ্বেতা দেবী 'উসকে' দেওয়া কর্মপদ্ধতির কথা বলেছেন। কৈ, বাঙলাদেশের সংখ্যালঘুরা তো 'উসকে দেওয়া কর্মপদ্ধতির' জন্য দাঙ্গা করতে সাহস পায়না!

দেবেশ রায় *দি টেলিগ্রাফ* পত্রিকার সাংবাদিক সুজন দত্তর কথা লিখেছেন। তাঁর গোধরা কান্ডের প্রথম ঘন্টা তিরিশের ডায়রির সঙ্গে মিশেল করেছেন অন্য খবরের কাগজে পড়া কিছু খবর। তারপর লিখেছেন, করসেবকরা স্টেশনের এক একটি দোকানে চা খাচ্ছিল খাবার খাচ্ছিল, তারপর পয়সা না দিয়ে কামরায় ফিরে আসছিল। এই করতে করতে ট্রেনটা চার ঘন্টা লেট হয়ে যায়।

এইসব অভিযোগ করতে হলে গার্ডের লগবুক লাগে। তাতেই লেখা থাকে কি কারণে কোথায় কত মিনিট লেট হয়েছিল। কিন্তু খবরের কাগজে লিখতে এইসব কিছুই লাগেনা। যারা বিশ্বাস করতে চায় তাদের অনায়াসে বিশ্বাস করানো যায়। বিশেষ করে দামী কাগজে ছাপা বইতে যদি ছাপার অক্ষরে লেখা যায়। যারা অপলাপবাদী, তথ্য গোপন করে একের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চায়, তারা এ ধরনের অভিযোগ করে।

আচ্ছা, ধরে নেওয়া যাক, দেবেশ রায়ের অভিযোগ সত্য। ঐ দিন সবরমতী এক্সপ্রেসে করসেবকরা খেয়ে দেয়ে দাম দিচ্ছিল না। সে কথা কি গোধরার ভেন্ডারটির জানা ছিল? চলমান ট্রেনের খবর তার জানা থাকা সম্ভব নয়। শ্রী রায়ের বিবরণ অনুযায়ী, "গোধরা স্টেশনে নেমেও তারা ঐসব শুরু করে। স্টেশনের কাছে একটা চায়ের দোকানে" (পাঠক লক্ষ্য করুন, স্টেশনের কাছে, প্লাটফর্মে নয়, আর মাত্র পাঁচ মিনিট বিরতির মধ্যেই) খেয়ে দেয়ে তারা পয়সা না দিয়ে উঠে পড়ে। চায়ের দোকানের ছেলেটি ছুটতে ছুটতে সেই কামরার মধ্যে উঠে পড়ে চেন টেনে গাড়ী থামায়। তারপর ঘটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা। এটা শ্রী রায়ের ভাষায় "তাৎক্ষণিক সমবেত অপরাধ"।

কতিপয় যুবক যদি খেয়েদেয়ে দাম না দিয়েই থাকে, তার জন্য গোটা কামরা জ্বালাতে হবে পেট্রল ঢেলে? তাও অতি অল্প সময়ের মধ্যে? এটা কোন যুক্তি?

(ডায়োন বুনশার বিবরণ অনুযায়ী ৮.০৫ থেকে ৮.২৫ এর মধ্যে)

যে কোনও সাধারণ বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বলবেন, ভি.এইচ.পি'র করসেবকরা ছিল বলেই কামরাটায় আগুন লাগানো হয়েছিল। ব্যাপারটা আকস্মিক নয়, পূর্ব-পরিকল্পিত। এবং অবশ্যই ইসলামী মৌলবাদী চক্রান্ত।

শ্রী রায় লিখেছেন, ঐ অঞ্চলে "রাস্তায় সারি দেওয়া গ্যারাজ আর ঐ রকমের সব দোকান, যেখানে পেট্রল-ডিজেল মাখা ন্যাকড়ার ছড়াছড়ি।"

শ্রী রায়ের সিদ্ধান্ত—"সুতরাং অত সকালেও পেট্রল ও আগুন লাগাবার আয়োজন যোগাড় করা ছিলনা বা তৈরী করা ছিলনা।"

কি চমৎকার যুক্তিজাল! কী পর্যবেক্ষণ থেকে কী সিদ্ধান্ত! গ্যারাজে পেট্রল-ডিজেল মাখা ন্যাকড়া আছে, কিন্তু পেট্রল-ডিজেল নেই!

দেবেশ রায়ের বক্তব্য, গত পঁয়ত্রিশ বছরে যত দাঙ্গা হয়েছে তার সবগুলিই মুসলমানদের বিরুদ্ধে।

দাঙ্গাটা কারা শুরু করেছে তা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক হচ্ছে, "প্রতিটি দাঙ্গায় মুসলমানরা প্রাণে মরেছে বেশী।"

কোহাটের দাঙ্গার কথা আগেই আলোচনা করেছি। সেখানে দাঙ্গা আরম্ভ করেছিল হিন্দুরা। কিন্তু হিন্দুরা কোতল হয় বেশী। গোটা কোহাটের হিন্দুদের শহর থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হয়। কারণ, একটাই। হিন্দু সংখ্যার বিচারে ছিল খুবই কম। অন্য ব্যাপারগুলি এক থাকলে দাঙ্গার সময় সংখ্যালঘুরাই মরে বেশী। এইটাই সমরের নিয়ম। কিন্তু ভারতে কোনও দাঙ্গাতেই সংখ্যাগুরুরা মরে নি এমন ঘটনা নেই। এবারের গুজরাটের দাঙ্গাতেও বেশ কিছু হিন্দু মরেছে ইসলামী মৌলবাদীদের হাতে। যদিও তুলনামূলকভাবে তার সংখ্যা কম। কিন্তু প্রতিবেশী ইসলামী দেশ দুটিতে দাঙ্গাটা হয় একেবারে একপেশে। সেখানে একটি সংখ্যাগুরুরও এক ফোঁটা রক্তপাত হয়না। ১০০ জন মৃতের মধ্যে ১০০ জনই সংখ্যালঘু সেখানে। সেখানে দাঙ্গা কথাটি ব্যবহার করাই ভুল। কারণ, দাঙ্গা শব্দের অর্থ মারামারি। পোগ্রমই সেখানে যথার্থ শব্দ।

দেবেশ রায় কি প্রত্যাশা করেন ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দুরা বেশী মরবে? যেখানে মুসলমানদের শতাংশ গড়ে কুড়ির বেশী নয়?

নিবন্ধে দেবেশ রায় কতকগুলি দাঙ্গার কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে বাদ দিয়েছেন মোরাদাবাদের দাঙ্গা। বাদ দিয়েছেন কাটরা মসজিদের গণহত্যা। যে গণহত্যায় বহু মুসলমানের জীবনহানি ঘটেছিল পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে।

নিবন্ধে অবশ্যই কাশ্মীরের হিন্দুদের হত্যার ব্যাপারগুলি এড়িয়ে গেছেন শ্রী রায়। ওটা হিসাবের বাইরেই থাকে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশভাগের সময় কাশ্মীর উপত্যকায় শতকরা সাতজন বাসিন্দা ছিল পন্ডিত নামক হিন্দু ব্রাহ্মণ, আজ তাদের অনেককেই মেরে ফেলা হয়েছে, বাকীরা দেশ ছেড়ে জম্মুতে ও দিল্লীতে উদ্বাস্তু শিবিরে বাস করেছে, এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা কিছু নেই। নেই এর সঙ্গে জড়িত কোনও ইসলামী মৌলবাদ। এটাই ধর্মেতরবাদীরা মনে করেন সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে যা কিছু আলোচনা তার মধ্যে অবশ্যই এড়িয়ে যাওয়া হবে কাশ্মীরের প্রসঙ্গ।

প্রবন্ধে বেশ কিছু মজার কথা বলেছেন শ্রী রায়। বলেছেন, যাদের হিন্দু বলে ধরা হচ্ছে তাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা নিজেকে হিন্দু বলে মনে করেন না। মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে আছেন। মুসলমানদের কেউ নিজেকে মুসলমান বলে স্বীকার করেন না, এমন মুসলমান বিলাতী ইসলামতত্ত্ববিদ আনোয়ার শেখের মত দু-একজন ছাড়া আমার চোখে পড়েনি। কারণ, ধর্মত্যাগ করলে হত্যা করার বিধান আছে ইসলামে। তবে অনেক হিন্দুই হিন্দু

সমাজের সহনশীল পরিবেশের মধ্যে নিরাপদে বাস করে আমি হিন্দু নই বলে ঘোষণা করেন। তাঁরাই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের গ্রামে বাস করলে মালাউনের বাচ্চা বলে সম্ভাষিত হতেন। আমি হিন্দু নই বললে কানাকড়িও দাম পেতেন না সে উচ্চারণের।

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর কথা আগেই বলেছি। তিনি নিজেকে হিন্দু বলেছিলেন। কিন্তু শ্রী রায় তাঁর চেয়েও বড় বিপ্লবী।

ষষ্ঠ পর্ব

আবদুর রউফ

আবদুর রউফকে নিয়ে আলোচনা করতে হচ্ছে। গুজরাট :নরমেধ যজ্ঞে ওনার নিবন্ধের নাম, *ওরা কি মুমূর্ষু দ্বিজাতি তত্ত্বে ফের প্রাণ সঞ্চারে আগ্রহী?* দ্বিজাতিতত্ত্ব মুমূর্ষু কিনা তা বিচার করবার আগে দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্ম নিয়ে আলোচনা করতে হয়। কারণ, না জন্মালে তো কেউ মরতে পারেনা। দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্ম কোথায়? জিন্নার বাড়ীতে, না সৈয়দ আহমদের নার্সিং হোমে ?

এর উত্তর, দ্বিজাতিতত্ত্ব ইসলামের মতই প্রাচীন, এর জন্ম ইসলামের গর্ভে। এর উৎস হজরত মুহাম্মদের মদিনা ঘোষণা।

ইসলামের ইতিহাস নিয়ে যাঁদের সামান্য পড়াশুনা আছে তাঁরা জানেন,৬১১ খ্রীষ্টাব্দে হজরত মুহাম্মদ আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, সমস্ত পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে সর্বত্রব্যাপী বিশ্বমানবের প্রতিপালক, পরম করুণাময়, নিরাকার আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করো। এছাড়া তিনি নিজেকে আল্লাহ্‌র দূত বলেও দাবী করলেন।

যেহেতু মুহাম্মদ প্রচারিত একেশ্বরবাদের অবস্থান প্রচলিত পৌত্তলিকতা ও প্রকৃতিপূজার বিরুদ্ধে, এবং মক্কার বহু বণিকদের ব্যবসার উৎস ছিল কাবাভিত্তিক তীর্থক্ষেত্রের তীর্থযাত্রীদল, সেহেতু মক্কার বণিকসমাজ স্বাভাবিক ভাবেই বিরোধী হয়ে উঠলো মুহাম্মদের। মুহাম্মদের একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণের তত্ত্বও বেদুইন সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠিপতিদের স্বার্থে আঘাত হানলো। কারণ, গোষ্ঠীপতিরা নিজেদের গোষ্ঠীভূত মানুষের কাছে যে আনুগত্য দাবী করতো তা প্রায় দেবপূজার সমান। এছাড়া কোরানে পৌত্তলিকদের সম্বন্ধে বলা হলো,

যারা এ কোরানকে প্রত্যাখান করে তাদের ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি ওদের এমন ভাবে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবো যে ওরা জানতেও পারবে না।

কাজে কাজেই মক্কার পৌত্তলিক ও মুসলিমদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হলো। আবার ইসলাম ধর্মে শুধু একেশ্বরবাদী হলেই হলোনা, মুহাম্মদকে আল্লাহ্‌র দূত বলেও স্বীকার করতে হবে। সুতরাং মুহাম্মদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলো মক্কাবাসীরা। এই বিরুদ্ধাচারণ ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এমনই একটা পর্যায়ে পৌছলো যে তাঁর অনুগামীরা যত্রতত্র আক্রান্ত হতে লাগলো। মক্কা থেকে ৩৬০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ইয়াসরিব শহর মরুদ্যান আর কৃষিক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। অ্যারেমিয় ভাষায় এই মরুদ্যান সমন্বয়কে বলা হতো মেদিন্তা বা শহর। মেদিন্তাই পরিবর্তিত হয়ে মেদিনাৎ-উন-নবী বা মদিনা হয়েছে। মদিনাতে বাস করতো ধনী ইহুদীরা। ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ ইয়েমেন থেকে আউশ ও খাজরাজ উপজাতির মানুষরা এসে মদিনাতে বাস করতে থাকে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আরব উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম অংশ বেদুইনদেরই দখলে

ছিল। ৬২০ খ্রীষ্টাব্দে মদিনা থেকে খাজরাজ উপজাতির কয়েকজন আসে কাবাতে তীর্থ করতে। এই মানুষগুলি মুহাম্মদের সঙ্গে আলাপে প্রীত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। তারাই আবার মদিনা ফেরার পথে আরও কয়েকজনকে দীক্ষিত করে নূতন মতে।

পরের বছর খাজরাজ উপজাতির লোকগুলি আবার এলো মক্কায়। সঙ্গে নিয়ে এলো বেশ কিছু নবদীক্ষিতকে। তাদের মধ্যে দুজন আবার আউশ উপজাতির। এই আউশ উপজাতির সঙ্গে খাজরাজ উপজাতির বহুদিন ধরে বিবাদ চলছিল মদিনায়। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে পঁচাত্তর জন মদিনাবাসী মুসলমানের সঙ্গে হজরত মুহাম্মদের এক গোপন বৈঠক হলো। সেই বৈঠকে স্থির হলো, মক্কার মুসলমানরা যদি মদিনায় চলে যায় তবে মদিনাবাসীরা তাদের রক্ষা করবে। এরপর কয়েক সপ্তাহ ধরে মক্কার মুসলমানরা দফায় দফায় মদিনা চলে যেতে লাগলো। সর্বশেষে মদিনাতে উপস্থিত হলেন হজরত মুহাম্মদ ও তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী আবু বকর। মুহাম্মদের এই মক্কা ত্যাগকে *হিজরত* বলা হয়।

মদিনাতে হজরত মুহাম্মদ ইসলামী উম্মা ও দার-উল-ইসলামের (ইসলামী রাষ্ট্রের) ভিত্তি স্থাপন করলেন। তিনি আউশ ও খাজরাজ উপজাতিদের বিবাদের নিরসনের জন্য বললেন, মুসলমান মাত্রই একে অন্যের ভাই। সুতরাং এক মুসলমান অন্য মুসলমানের রক্তপাত করতে পারবে না। ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে এক লিখিত দলিলে হজরত মুহাম্মদ বললেন, প্রথমতঃ ইসলাম বিশ্বাসীরা (মুমিনরা) এবং তাঁদের পরিজনেরা একটি সঙ্ঘ বা উম্মার অন্তর্ভুক্ত হলো। দ্বিতীয়তঃ উম্মার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের সদস্যদের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব পালন করবে। তৃতীয়তঃ উম্মার সদস্যরা এককাট্টা থাকবে যাবতীয় অপরাধের বিরুদ্ধে। কোনও নিকট আত্মীয় যদি অভিযুক্ত হয় তাহলেও কোনও রকম নমনীয়তা দেখাবে না। চতুর্থতঃ, উম্মার সদস্যরা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ও শান্তিতে সর্বদা সঙ্ঘবদ্ধ থাকবে। শেষতঃ, উম্মার সদস্যদের মধ্যে যদি কোনও কারণে মতভেদ দেখা দেয়, তবে ব্যাপারটা নিষ্পত্তির জন্য দাখিল করতে হবে আল্লাহ্ ও তাঁর দূতের নিকট।

৬২৭ খ্রীষ্টাব্দের ঐ মদিনা ঘোষণাই ইসলামী জাতিতত্ত্বের ভিত্তি। ইসলামী জাতীয়তাবাদের নাম মিল্লত এবং ইসলামী জাতির নাম মিল্লী।

ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী মদিনা ঘোষণা চিরন্তন, চিরজীবি। সুতরাং ইসলামী জাতিতত্ত্বও চিরন্তন, চিরজীবি। এই ইসলামী জাতিতত্ত্বই তথাকথিত দ্বিজাতি তত্ত্ব। কোনও কোনও নির্বোধ হিন্দু মনে করেন বাঙলাদেশের সৃষ্টিতেই নাকি দ্বিজাতিতত্ত্ব মার খেয়ে গেছে। কিন্তু কারবালায় এজিদ-হোসেনের যুদ্ধের পরও যদি ইসলামী জাতিতত্ত্ব মার না খেয়ে থাকে, তবে তুচ্ছ বাঙলাদেশের সৃষ্টিতে কি এসে যায়! বাঙলাদেশের সৃষ্টির পর কি সেখানকার হিন্দু-মুসলমান একজাতি হয়ে গেছে, না হিন্দুদলন কিছু কমেছে?

আমরা আগেই দেখিয়েছি, এদেশের মুসলমানরা *অল ইন্ডিয়া মিল্লী কাউন্সিল* গঠন করেছে। মুসলমানদের পত্রিকার নাম *মিল্লত্, মিল্লী গেজেট* ইত্যাদি। এতে কি প্রমাণ হয় ভারতে দ্বিজাতিতত্ত্ব মুমূর্ষু? সুতরাং আবদুর রউফ কিছু সরলমনা পাঠককে বুদ্ধু বানাতে চাইছেন।

আবদুর রউফের বাকী নিবন্ধের অনেক কিছুই আলোচনার যোগ্য নয়, কারণ, তিনি তাজুদিনের গল্পে বিশ্বাসী। এ ঘটনা সত্য না অতিরঞ্জিত তা নিয়ে তদন্ত রিপোর্টের প্রত্যাশী তিনি! এক একজন খবরের কাগজে এক একটি গুল্প ছাড়বেন, তা নিয়ে তদন্ত করতে হবে সরকারকে। জনসাধারণের টাকা কি এতই শস্তা?

তবুও জনাবের কিছু কিছু বক্তব্য নিয়ে কথা বলতে হচ্ছেই। যেমন পূর্ব তিমোরের কথা উল্লেখ করেছেন জনাব। "মুসলিম প্রধান ইন্দোনেশিয়ার টিমোরী দ্বীপের খৃস্টানরা তো নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নতুন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের পত্তন করে বসেছেন।"

ইতিহাসটা কী? *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা* দেখা যাক: পূর্ব তিমোর ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল পর্তুগীজদের দখলে। ঐ বছর আঠাশে নভেম্বর সেখানকার জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল *ফ্রেটিলিন* স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু ন দিন পর ইন্দোনেশিয়ার বাহিনী পূর্ব তিমোর দখল করে সেটি ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই দখলদারী মানেনি।

সুতরাং এটা কোনও বিচ্ছিন্নতাবাদের ঘটনা নয়। ক্রমাগত আন্দোলনের ফলে ইন্দোনেশীয় বাহিনী অন্যায় দখলদারী ছেড়েছে মাত্র। এরই পাশাপাশি ফিলিপাইনের তুলনা করেছেন জনাব রউফ। ফিলিপাইনের জনসংখ্যার আশি শতাংশ রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান, মুসলমানদের জনসংখ্যা প্রায় পনেরো শতাশের মত এবং তা কোনও নির্দিষ্ট একটি স্থানে ঘনীভূতও নয়। সুতরাং সেখানে মুসলমানরা কোনও পৃথক রাজ্যের দাবী করার মত অবস্থায় নেই। অতএব সেখানে মুসলমানরা অবশ্যই বিচ্ছিন্নতাবাদী। ।

জনাব রউফ বলেছেন তিব্বতের কথা—"তিব্বতের বৌদ্ধরা চীনেদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে নারাজ।" ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিব্বত ছিল একটি স্বাধীন বৌদ্ধ রাজ্য, যা সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ভারতের নিকট আত্মীয়। মনে রাখতে হবে ভারতের দুটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র কৈলাস ও মানস সরোবর তিব্বতেই অবস্থিত। তিব্বতের এক হাজার বছরের ইতিহাসে কেবল চীন ও ব্রিটেনের মধ্যে এক চুক্তির ফলে ১৯০৬ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিব্বতের উপর চীনের অধিকার সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে চীন বলপূর্বক তিব্বত দখল করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ, নেহরু নেতৃত্বধীন ভারত বা ব্রিটেন তিব্বতীদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে এক তিব্বতী দলকে পিকিংয়ে ডেকে এনে তাদের উপর এক একতরফা চুক্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়। যদিও ঐ চুক্তি অনুযায়ী তিব্বতীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল, পরে ঐ স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয় এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে তিব্বতে নাস্তিকতা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এটাই *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা* পরিবেশিত তিব্বতের ইতিহাস। এটাকে কি বৌদ্ধ বিচ্ছিন্নতাবাদ বলতে হবে?

পশ্চিমবঙ্গের মার্ক্স-ইসলাম অক্ষ এখন ইহুদী বিদ্বেষও প্রচার করছে। প্রচার করা হচ্ছে প্যালেস্টাইন হচ্ছে আরবদের দেশ, ইহুদীরা সেখানে বহিরাগত। জনাব রউফ লিখেছেন, "প্যালেস্তাইনিদের মাতৃভূমির বুকের ওপর জোর করে ইহুদী রাষ্ট্র ইস্রায়েলকে বসিয়ে দিয়েছে

ইউরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিই।" পৃথিবীতে ইহুদীরা নিশ্চয় আকাশ থেকে খসে পড়েনি। তাদেরও একটা উৎসভূমি ছিল। সেটি কোন দেশ? আব্রাহাম (ইব্রাহিম), মোজেস (মুসা) কোন দেশের লোক? ঈশ্বর যিহোভা দশটি প্রত্যাদেশ কাকে দিয়েছিলেন? সেই দশটি প্রত্যাদেশ যেখানে খোদিত আছে সেই সিনাই কোথায় অবস্থিত?

এসব প্রশ্নের উত্তর একটি সত্যের দিকে আমাদের নিয়ে যায়। প্যালেস্টাইন হচ্ছে ইহুদীদের আদি দেশ। সেখান থেকে তারা বিতাড়িত হয়েছিল। যাদের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিল মুসলমানরাও। আগেই আমরা সহী মুসলিমের ৪৩৬৩ নং হাদিশ উল্লেখ করে দেখিয়েছি কীভাবে মদিনার ইহুদীদের উৎখাত করেছিল ইসলাম। ইসলামের ইতিহাসে আছে ইহুদী অধ্যুষিত খাইবার জয় করে প্রথম জিজিয়া করের প্রবর্তন করেন হজরত মুহাম্মদ। খাইবারের ইহুদীদের নিজের জমিতেই মনিষ খাটতে বাধ্য করা হয়।

এছাড়া মনে রাখতে হবে প্যালেস্টাইনে কিছু ইহুদী চিরকালই ছিল। অবশ্যই *জিম্মি* অবস্থায় এবং তাদের বাধ্যতামূলকভাবে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে পরিচয়জ্ঞাপক পোষাক পরতে হতো। সুতরাং ইহুদীরা প্যালেস্টাইনে মোটেই অবৈধ নয়। এই ইস্রায়েলকে উৎখাতের জন্য ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সবকটি ইসলামী রাষ্ট্র একসঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। যুদ্ধে ইসলামী শক্তি শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। এই যুদ্ধজয়ের ফলেই ইস্রায়েল গাজা ভূখন্ড জয় করেছিল—যা নিয়ে আজকের রাজনৈতিক সঙ্কট।

এবার চেচেনিয়া প্রসঙ্গে আসা যাক। চেচেনদের সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরোধটা ছিল দুটি বিষয়ে: চেচেনরা পরিবারগত ভূমি ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিল, তেমনই বিশ্বাসী ছিল ধর্মে। রাষ্ট্র ছিল সমষ্ঠি-কৃষিতে বিশ্বাসী এবং নাস্তিক। দুটি বিষয় নিয়েই চেচেনরা বিদ্রোহী হয়। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গোটা চেচেন ও ইংগুজ জাতিকে নির্বাসিত করা হয় মধ্য এসিয়ায়। তেরো বছর পরে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে চেচেনদের স্বদেশে ফিরে আসতে দেওয়া হয়। শোষণ বলতে যা কিছু ছিল তা রাষ্ট্রীয়। জনাব রউফের কথামত "রুশদের জাতিগত" শোষণ নয় (শিরিন আকিনের, *ইসলামিক পিপলস অফ সোভিয়েট ইউনিয়ন*)। চেচেনরা এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সাফল্যজনকভাবে লড়াই চালিয়ে গিয়েছে চিরদিন, আজও যাচ্ছে। তিব্বতীরা পারেনি, পারছে না। কারণ, বৌদ্ধ শাস্ত্রে জেহাদের কথা নেই। আর চেচেনরা হানাফী সুন্নি মুসলমান, তাদের জেহাদী চেতনা আছে।

ঝগড়া বিবাদ নিতান্তই মানবিক ব্যাপার। মানুষের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য ইতাদি রিপুর তাড়নে ঝগড়া বিবাদ লাগে, মানুষ খুন-জখম করে, নারী ধর্ষণ করে, নানাবিধ অপরাধ করে। এমনকি দুটি ক্লাবের সমর্থকদের মধ্যে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করেও ঝগড়া বেঁধে যেতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে মাথা ঠান্ডা হলে ভুল বুঝতে পারে এবং ঝগড়া অনেক সময় মিটে যায়। সাধারণভাবে এইসব অপরাধ করার পর অপরাধীদের বিবেক কখনও পরিষ্কার থাকেনা। কিন্তু যখন বলা হয় বিধর্মীমাত্রই ঘৃণ্য শত্রু এবং বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কর্তব্য, তখন বিধর্মীদের বিরুদ্ধে কুকর্ম করার জন্য অপরাধীর বিবেক পরিষ্কার হয়ে

যায়। বিধর্মীদের সম্পত্তি লুট করা, বিধর্মীদের নারী বাজেয়াপ্ত করে ধর্ষণ করা, অন্য কোনও ধর্মে বৈধতা প্রাপ্ত হয়নি।

জনাব রউফ লিখেছেন, "গুজরাটে তাদের উপর বর্বরতার চূড়ান্ত ঘটে যাবার সত্ত্বেও তাদের একজনও পাকিস্তানে পালিয়ে যাবার কথা ভাবতে পারেনা।"

গুজরাটে অতো বর্বরতার পরেও যারা পুলিস খুন করতে পারে মসজিদের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে, তারা পাকিস্তানে চলে যাবে কোন দুঃখে! তাদের জন্য বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ার আছেন, আই.কে. গুজরাল আছেন, খুশবন্ত সিং আছেন, মুলায়েম সিং আছেন, হর্ষ মান্দার আছেন, অরুন্ধতী রায় আছেন, মহাশ্বেতা দেবী আছেন, দেবেশ রায় আছেন, আছেন তাবৎ গাঁধিবাদীরা, আছে গোটা ধর্মেতরবাদী সম্প্রদায়!

বালাই সাট! গোধরা কান্ডের মাত্র কদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী কবুল করেছেন মাদ্রাসা নিয়ে তিনি যা বলেছিলেন তা বলেননি। এখানে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ঢালাও অর্থের ব্যবস্থা আছে, হজ করতে যাওয়ার জন্য টাকার বন্দোবস্ত করে সরকার। এরপরেও কোন বোকা পাকিস্তানে চলে যাবে! সেখানে মুহাজিরদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ।

এবার শেষে আসা যাক। জিন্নাকে 'নাস্তিক' বানিয়েছেন জনাব রউফ। কেন? জিন্না শূকরের মাংস খেতেন বলে? নমাজ পড়তে যেতেন না বলে? বহু মুসলমানই নমাজ পড়ে না। দলে পড়ে কুখাদ্যও কেউ খেতে পারে। তাতেই তার মুসলমানত্ব নষ্ট হয়ে যাবে? এমন বিধান আছে নাকি? তিনবার কলিমা উচ্চারণ করলেই একজন মুসলমান। কিন্তু ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করা?

অসম্ভব! তার জন্য বিধান মৃত্যুদন্ড। আর শিয়া মতে তাড়না থেকে বাঁচার জন্য প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগও ঘোষণা করা যেতে পারে।

ইসলাম ত্যাগ করতে হলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হয়। মুহাম্মদ আলি জিন্না কি তা করেছিলেন?

জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে জিন্না নিজেকে মুসলমান বলেই প্রতিপন্ন করেছিলেন। তাঁর প্রিয়তমা কন্যা যখন এক পার্শী যুবককে বিয়ে করতে যায় তখন তিনি কিছুতেই মত দেননি। কেন? বিধর্মীর সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া কোরান বিরোধী। জিন্নার জামাতা স্পষ্টই বলেছেন নেহাৎ ধর্মীয় কারণেই জিন্না কন্যার বিবাহ মেনে নেননি। জামাতা ছিলেন পার্সী খ্রীষ্টান। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, বিধর্মীর কন্যা বিবাহ করাও তো ইসলাম বিরোধী?

এর উত্তর, রেজিষ্ট্রী বিবাহের স্ত্রীকে গনিমতের মাল বলে বিবেচনা করা হয়। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে তার কোনও স্বীকৃতি নেই। তবে ইসলামী আইন রক্ষিতার পুত্র-কন্যাদের সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দেয়। এ ব্যাপারে ইসলাম উদার।

হিন্দু সমাজে নাস্তিকের স্থান আছে, আছে বস্তুবাদী চার্বাক দর্শন। ইসলামে তা নেই, থাকা সম্ভবও নয়। মুসলমান মানেই ইসলামে বিশ্বাসী। জিন্না যদি নাস্তিকই হবেন, তবে তিনি চোদ্দ দফা দাবী কাদের জন্য করেছিলেন? আর মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব কি দেশভাগের

কারণ নয়? সেই মুসলিম লীগের নেতা কি জিন্না ছিলেন না?

আর ভারতের মাটিতে দ্বিজাতি তত্ত্বের কথা কে প্রথম সোচ্চারে উচ্চারণ করেছিলেন? হিন্দুরা ? না স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ? আগেই লিখেছি, সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে *আসবাব ই বাগাওয়াত-ই হিন্দ* পুস্তিকায় সৈয়দ আহমদ খাঁ হিন্দু মুসলিম দুটি বিবদমান জাতি বলে উল্লেখ করেছিলেন। সেই ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ভারতে নবগোপাল মিত্র ছিলেন না, বঙ্কিম চন্দ্র ছিলেন না, অরবিন্দ ছিলেন না। ছিলেন না তিলক, সাভারকর, ভাই পরমানন্দ, মুঞ্জে, হেডগাওয়ার, গোলওয়ালকর, শ্যামাপ্রসাদ। তবুও সৈয়দ আহমদ খাঁ হিন্দু-মুসলমান *দুটি বিবদমান জাতি* বলছেন। এরপর লক্ষ্ণৌ ভাষণে নিজেকে মেলে ধরলেন সৈয়দ সাহেব:

"মুহুর্তের জন্য স্মরণ করুন আপনারা কারা? আমরাই ছ সাত শো বছর ধরে ভারত শাসন করেছি। আমাদের হাত থেকেই সরকার এ দেশের শাসনভার নিয়েছে। সত্তর বছরেই আমরা আমাদের শৌর্য-বীর্যের কথা ভুলে যাবো, এ রকম ভাবার মত বোকা সরকার নয়। সরকারের এ রকম ভাবা ঠিক নয়। কিন্তু এ রকম ভাবার সুযোগ আছে। আমরা মছলিখোর নই, হাত কেটে যাবার ভয়ে কাঁটা চামচ ধরতে ভয় পাইনা। যারা একদিন আরব, এসিয়া ও ইউরোপকে কম্পিত করেছিল, তাদের রক্ত আমাদের শরীরে প্রবাহিত। আমাদের জাতি-ই তরবারীর জোরে গোটা ভারত জয় করেছিল।"

তাহলে ভারতে দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাস করে কারা?

সপ্তম পর্ব

মইনুল হাসান

ভারতের ধর্মেতরবাদীরা শুধু হিন্দু বিদ্বেষী নয়, তারা আবার ইসলাম প্রচারেও উৎসুক। আগেই দেখিয়েছি তারা বিদ্যালয়ের শিশুদের কাছে মিথ্যা প্রচার করে যে ইসলাম সামাজিক সাম্যের ধর্ম। আমাদের আলোচ্য *গুজরাট : নরমেধ যজ্ঞে* ইসলাম প্রচার করা হয়েছে মইনুল হাসানের *গুজরাত থেকে গোয়া : এক কুৎসিত মুখের আত্মপ্রকাশ* নিবন্ধের মাধ্যমে। এই প্রবন্ধের মাধ্যম এক কুৎসিত তঞ্চককেই দেখতে পাবেন পাঠক।

জনাব হাসানের নিবন্ধে আছে : *কোরানে সব আছে, আবার কিছুই নেই—দুটো ধারণাই ভুল। কিন্তু একটি বিষয় বারবার বলা হয়েছে তা শান্তির কথা, ভ্রাতৃত্বের কথা, পারস্পরিক আদান প্রদানের কথা।*

ভ্রাতৃত্বের কথা অবশ্যই আছে কোরানে—এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। কিন্তু এক মুসলিম এক কাফেরের ভাই, এ কথা কি কোরানে আছে? খোলসা করে বলেননি জনাব হাসান। আর শান্তির কথা আছে—মুসলমানে মুসলমানে শান্তির কথা। মুসলমান-অমুসলমানে শান্তির কথা কি কোরানে আছে? কোরানে আছে মানুষের সঙ্গে মানুষের শত্রুতার কথা: *তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে চির শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে যদি না তোমরা এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন করো।*

এ রকম বহু বাক্য কোরান থেকে উৎকলিত করা যায়, যাতে প্রকাশ কাফেরদের প্রতি মুসলমানদের চির বিরূপতা। তার থেকে ইসলামের পরিচয়ের জন্য অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করা যাক—যে যে বাক্য ইসলামের সহনশীলতার উদাহরণ বলে বিজ্ঞাপিত হয় সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক। বাস্তবিকপক্ষে মুসলিম, ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়ে অনেক মিথ্যা প্রচারিত হয়। এইসব বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনার জন্য আমরা দ্বারস্থ হচ্ছি বিখ্যাত বেলজিয়ান ভারততত্ত্ববিদ কোনরাড এলস্টের। তাঁর কলম থেকেই প্রশ্ন ও উত্তরের ভঙ্গীতে লেখা নিম্নোক্ত কথোপকথনটি পড়া যাক:

ইসলাম বনাম মুসলিম

"কিন্তু আমি কয়েকজন মুসলমানকে জানি, যারা মোটেই ধর্মোন্মাদ নয়।" "আমি তুরস্কে ছিলাম, ওখানকার মানুষেরা খুব বন্ধুভাবাপন্ন এবং অতিথিপরায়ণ। তাদের সঙ্গে ধর্মীয় উন্নাদনার কোনও সম্বন্ধ নেই। আপনি মুসলিম জনসাধারণের সঙ্গে মুষ্টিমেয় ধর্মোন্মাদদের গুলিয়ে ফেলছেন।"

"ইন্দোনেসিয়াতে ইসলাম অন্য রকম। আপনি পশ্চিম এসিয়ার যুদ্ধং দেহি মানসিকতার সঙ্গে ইসলামের মূলতত্ত্বের সম্পর্ক গুলিয়ে ফেলছেন।"

উত্তর: আমিও কয়েকজন মুসলমানকে জানি, যাঁরা মোটেই ধর্মোন্মাদ নয়। এবং পাকিস্তান থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন মুসলিম দেশে অনেকদিন থেকেছি। কিন্তু তা থেকে আমি সিদ্ধান্ত

নিতে পারিনি যে ইসলাম একটি উপকারী এবং সহনশীল ধর্ম। আপাতদৃষ্টিতে ভদ্রলোক, যাঁরা সামাজিক মানুষ হিসাবে খুবই সুরুচির এবং পারতপক্ষে কারুর বিরুদ্ধাচারণ করেন না এরকম মুসলমান দেখার জন্য মুসলিম দেশে যেতে হয়না। কিন্তু এঁরাই হঠাৎ ধর্মোন্মাদ হয়ে যান ইসলাম সামান্য অসুবিধায় পড়লেই। যাঁরা রাস্তায় রুশদীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান, রুশদীর মৃত্যু দাবী করেন এবং সাক্ষাৎকারে বলেন, "ওর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, আমরা শয়তানটাকে খুন করবো," তাদের সঙ্গে কফি হাউসে বসে কথা বলে দেখবেন, মনে হবে খুউব ভাল লোক। রুশদীর জাপানী অনুবাদককে যখন ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে খুন করা হয় তখন জাপানের মুসলিম সম্প্রদায়ের মুখপাত্র বলেন, "মুসলমান বা অমুসলমান, যেই খুন করে থাকুক না কেন, এটা আল্লাহ্ দ্বারা নির্ধারিত শাস্তি।" কিন্তু, জাপানী মুসলমানরা অন্য জাপানীদের চেয়ে কম সভ্য, এমন কথা কেউ বলতে পারবে না।

এটা সত্য যে মুসলিম দেশের বহু মানুষের মধ্যে বহু সৎগুণ আছে। আধুনিক ভোগবাদের দ্বারা নষ্ট হয়নি এমন দেশের মানুষের পক্ষে অতিথিপরায়ণ এবং বন্ধুবৎসল হওয়াটা স্বাভাবিক–এর জন্য ইসলামের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক নয়। তুর্করা যেমন কয়েক শতাব্দী আগে যাযাবর ছিল, সেরকম যাযাবর জাতিদের পক্ষে অতিথিপরায়ণতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই পরম্পরা ইসলামায়নের পরেও থেকে গেছে। বস্তুতঃপক্ষে মুহাম্মদের নিজস্ব পরিমন্ডলে যাযাবরী পরম্পরা প্রভূত পরিমাণে উপস্থিত ছিল, অতিথিপরায়ণতাকে ইসলামে যথেষ্ট মূল্য দেওয়া হয়। তবে এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে নয়, মুহাম্মদ এছাড়া অন্য কিছু জানতেন না বলে। বন্ধু-বৎসলতা ও অতিথিপরায়ণতা ইসলামের কাছে ঋণী নয়, বরং বেশীভাগ প্রাচীন সংস্কৃতির লালিত মূল্যবোধের নিকট ঋণী।

এটা প্রমাণ করে এক চিরন্তন সত্য: মুসলমান হওয়ার পরেও মানুষ মানুষই থাকে। মানুষ তার ধর্মীয় মতবাদে দীক্ষিত হওয়ার পরেও কতকগুলি মূল্যবোধকে লালিত করতে থাকে। সর্বোপরি ইসলামী মতবাদ নিজেই কতকগুলি ইসলাম-পূর্ব মূল্যবোধ গ্রহণ করেছে, যেগুলি সে নতুন প্রজন্মের কাছে এখনও বিতরণ করে যাচ্ছে। এটা অন্য ধর্মের থেকে তুলনামূলকভাবে ভাল হওয়ার ব্যাপার নয়, কিন্তু এটা বড় শহরে নতুন প্রজন্মের মানুষদের বিকৃতমতি হওয়ার চেয়ে ভাল। বিশেষ করে আমেরিকার শহরগুলিতে কালো মানুষদের ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকার প্রশংসা করছে সে দেশের নীতি প্রণয়নকারীরা। আধুনিক পৃথিবীতে পৈত্রিক ধর্মের বিকল্প অন্য একটি ধর্ম নয়, বরং চরম নাস্তিকতা ও নৈতিক নৈরাজ্যবাদ। যে কোনও ধর্মই আত্মা হারানো মানুষকে নতুন দিশা দেখাতে পারে, যদি সেই ধর্মের বন্ধা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী তত্ত্বের উপর জোর না দিয়ে মৌলিক নৈতিকতাবোধের উপর জোর দেওয়া হয়।

নঞার্থকদিক দিয়েও ইসলাম মনুষ্য প্রকৃতির কোনও অজানা ব্যাপার নয়। স্বয়ংসত্যবোধ, সংকীর্ণমনস্কতা, লুটের মালের প্রতি লোভ, অন্যের শৈল্পিক ও ধর্মীয় বোধের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রভৃতি ইসলামের দোষগুলি যে কোনও মানুষের মধ্যেই দেখা যেতে পারে। ব্যাপারটা হচ্ছে, মানুষের এই ধরনের নঞার্থক প্রবণতাগুলিকে ইসলাম নিয়মতান্ত্রিকভাবে সমর্থন দেয়—

যখন ক্রিয়াটা অমুসলমানদের ক্ষেত্রে ঘটানো হয়। ইহুদী পুরাণ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করলেও ইসলাম এই ধরনের অন্যায় কাজগুলিকে মান্যতা দান করেছে। এটি ইসলাম-পূর্ব আরবী সমাজ থেকে গৃহিত নয়। অধিবিদ্যাগত ও আচার-আচরণগত পার্থক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে নৈতিক ভালমন্দ ব্যাপারে কিছু সাদৃশ্য থাকে। রিপুদমন, মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার, সত্যবাদিতা ইত্যাদিকে সব ধর্মেই মূল্য দেওয়া হয়। ইসলাম এই ধরনের কিছু মূল্যবোধ গ্রহণ করেছে। সাধারণ মুসলমানরা তাঁদের ধর্মকে সমর্থনের জন্য এই ধরনের কিছু ব্যাপারের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করবেন। কিন্তু ইসলাম বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত এই ধরনের মূল্যবোধের বিপরীত কিছু কর্মকেও ধর্মীয় কর্তব্য বলে নির্দেশ দিয়েছে।

ইসলামী তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, মুসলমানদের সম্পর্কে আমাদের মনোভাব অনুরূপ নয়। আমার অনুমান, কোনও মুসলমানকে যদি আপনি বলেন, আপনাদের সম্পর্কে আমার কোনও অভিযোগ নেই, আমি শুধু আপনাদের ধর্ম সম্পর্কে অভিযোগ করছি, তাহলে সে খুশী হবেনা। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এই ধরনের উচ্চারণ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু এটাই সঠিক উচ্চারণ। একজন মানুষ যে মুসলমান হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে, এতে তার কিছু করার নেই। শিশু বয়সে তার মনে ইসলামী প্রতীক, নাম, প্রার্থনা ইত্যাদি প্রবিষ্ট করা হয়েছে, এতেও তার কিছু করার নেই। তাদের ধর্মীয় পুস্তক ও ধর্মপ্রবর্তক সম্বন্ধে তার অনুরাগ জন্মেছে, এতেও তার কোনও হাত নেই। এতৎসত্ত্বেও অনেক মুসলমান বহু মানবিক ধ্যানধারণা পোষণ করেন এবং তাদের ধর্মীয় তত্ত্বাবলী থেকে শুধুমাত্র কতকগুলি সর্বজনীন ধ্যানধারণা ও কিছু সর্বজনীন জীবনবোধ আহরণ করেন, সন্তর্পণে সরিয়ে রেখে দেন স্ব-ধর্মের মানবতার পক্ষে ক্ষতিকর উপাদান সমূহ। তাঁদের কার্যকরী ধর্ম ঠিক ইসলাম নয়, বরং কতকগুলি মানবিক উপাদান যা, মুহাম্মদের অনুসরণকারীরা বিশ্বজনীন ধর্মবোধ থেকে আহরণ করেছিলেন।

কিন্তু তুরস্কের সাধারণ মুসলমানদের মানবিকতাবোধ যাই হোক না কেন, সেই সব মুসলমানদের এক বৃহৎ অংশ খ্রীষ্টান সংখ্যালঘুদের সন্ত্রস্ত করতো। এমনকি যখন মুস্তাফা কামাল সেখানে ধর্মেতরবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন এবং কতকগুলি পুরাতন গীর্জাকে নতুন জীবন দান করলেন তখনও সাধারণ মুসলমানরা খ্রীষ্টানদের নিগৃহিত করতে থাকলো।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে তুরস্কের জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল খ্রীষ্টান। শোনা যায়, খোদ ইস্তানবুল শহরে তারা ছিল সংখ্যাগুরু। ১৯১৫-১৮ খ্রীষ্টাব্দে আর্মেনীয়দের গণহত্যা করা হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের গ্রীক অধ্যুসিত পশ্চিম উপকূল অঞ্চলকে যখন স্বাধীন করতে যায় গ্রীস, তখন হয় হত্যা করা হয় বা তাড়িয়ে দেওয়া হয় ঐ অঞ্চলের সমস্ত গ্রীকদের। তখন থেকে অনবরত তাড়না চলছে শুধু যে আর্মেনীয় বা গ্রীক অর্থোডক্সদের তাই নয়, একইভাবে তাড়না করা হচ্ছে কলডীয় ও অ্যাসেরীয় খ্রীষ্টানদেরও। এখন তুরস্কে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা শতকরা এক ভাগেরও কম। হাজার হাজার খ্রীষ্টান বিদেশে পালিয়ে গেছে। যারা আছে তারা ইস্তানবুল শহরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চলে বাস করে। তারা কেমন আছে, একথা

জিগেস করলে উত্তর দিতে ভয় ও লজ্জা পায় তারা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্য কথা বেরিয়ে আসে তাদের কাছ থেকে, "আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।"

খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে ইসলামী সন্ত্রাসের আর একটা দিক হলো, এটি রাষ্ট্রের ধর্মেতরায়নের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়নি। খলিফার রাজত্বে ইসলাম নিরাপদে ক্ষমতায় ছিল এবং সেই অবস্থানে থেকে তা কিছু ঔদার্য দেখাতে পারতো। জিম্মি বা রক্ষিত হিসাবে খ্রীষ্টানদের নিরাপত্তা দিতে পারতো (অবশ্যই খলিফা ঘোষিত জেহাদের সময় ব্যতিরেকে)। কিন্তু এই ঔদার্য ও নিরাপত্তার ব্যাপারটা বলকান প্রদেশের ক্ষেত্রে ততোটা কার্যকরী ছিলনা। সেখানে খ্রীষ্টানরা অবিরত ভীতির মধ্যে থাকতো। তারা ছিল অবিরাম সন্ত্রাসের শিকার—কখনও তাদের মেয়েদের তুলে নিয়ে যেত মুসলমানরা। কখনও ধরে নিয়ে যেত ছেলেদের। আগে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষেরা দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে বাস করতো। তারপর নানারকম যানবাহন আবিষ্কারের ফলে দুর্গম স্থান বলতে যখন আর কিছু রইলো না, তখন মুসলিমদের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর অত্যাচারের জোয়ার নেমে এলো। ধর্মেতরবাদী সরকারের প্রদত্ত যাবতীয় রক্ষাকবচ ব্যর্থ করে দিল মুসলিম জনগণেরা।

এসবের জন্য রাষ্ট্রশক্তি ও পোষাকধারী শান্তিরক্ষকদের সহজেই দোষ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ইসলামী সন্ত্রাসের উৎস রাষ্ট্র বা পোষাক থেকে নয়, মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে। সেজন্য অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মত মানবাধিকার রক্ষা সংস্থার নথিতে এ ধরনের ঘটনা লিপিবদ্ধ থাকেনা। এক পাকিস্তানী বন্ধু অনুযোগ করলেন যে তাঁর মাতৃভূমিতে অ্যামনেস্টি কোনও ইসলামী সন্ত্রাসের মামলা নথিবদ্ধ করেনা, যদিও এই ব্যাপারে পাকিস্তানের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ব্যাপারটা হচ্ছে এই ধরনের সন্ত্রাসের ঘটনা রাষ্ট্র দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হয়না—সে কারণে ঘটনাগুলি অ্যামনেস্টির নজর এড়িয়ে যায়। ঘটনাগুলি ঘটে ইসলামী তত্ত্বপুষ্ট মুসলিম জনগণের একাংশের স্বতঃস্ফুর্ত মনোভাব দ্বারা।

ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম জনমানসের মধ্যে ততোটা ঘাঁটি গেড়ে বসতে পারেনি সত্য, তবে তা কট্টরদের আগমার্কা ইসলামী ব্যবহার দেখাতে বাধাও দেয়নি। পশ্চিম নিউগিনির পাপুয়া আদিবাসীরা জাভা থেকে আগত অভিবাসী মুসলমানদের দ্বারা বলপূর্বক ইসলামায়িত হচ্ছে। একদা পর্তুগীজ উপনিবেশ পরে ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক বলপূর্বক অধিকৃত পূর্ব তিমোরে মুসলিম অভিবাসী ও সৈনিকদের দ্বারা খ্রীষ্টান ও আদিম সর্বাস্তিবাদীদের ব্যাপকভাবে হত্যা করে চলেছিল। এতৎসত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়ার অমুসলিমদের অবস্থা বাংলাদেশের থেকে ভাল এবং সেখানে অমুসলমানরা মুসলমানদের সঙ্গে মোটামুটি শান্তিতে পাশাপাশি বাস করছে।

ইসলামী তত্ত্বের প্রভাব সব দেশের মুসলমানদের উপর সমভাবে পড়েনি। বহু মুসলমান অমুসলমানদের উপর কোরান অনুযায়ী জুলুম করেনা। কিছু মুসলমান অত্যাচার করার জন্য কোরানের দ্বারস্থ নয়। তার অর্থ এই নয় যে জুলুমের জন্য ইসলাম কোনও মতেই দায়ী নয়।

কিছু লোক মদ খেয়েও নিরাপদে গাড়ী চালাতে পারে। আবার কিছু লোক মদ না খেয়েও বিপজ্জনক ভাবে গাড়ী চালায়। এর অর্থ এই নয় যে মত্ত হয়ে গাড়ী চালানোর সঙ্গে পথ দুর্ঘটনার কোনও সম্পর্ক নেই।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা সম্পর্কে কোরানের নির্দেশ

"কিন্তু কোরান অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয় (২/২৫৬, ১০/৯৯, ১০৯/৬) এবং অন্য ধর্মকে স্বীকৃতি দেয় (১৩/৭, ১৬/৩৬)।"

উত্তর: এটা সত্য নয় যে কোরান অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়। কোরান বলে, সমস্ত মানুষকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে হবে। বলে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য দেবতার পূজা নিষিদ্ধ। এবং বলে মুহাম্মদই শেষ পয়গম্বর। কোরান শিক্ষা দেয় মুসলমানরা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে ঘৃণা এবং শত্রুতার মধ্যে বাস করবে, যতদিন না এইসব অবিশ্বাসীরা নিঃশেষ হয়—ধর্মান্তকরণ বা হত্যার দ্বারা। কোরানের প্রত্যাদেশগুলি নিষ্ঠভাবে পাঠ করলে জানা যায় যেসব বাক্যগুলির দ্বারা ইসলামী সহিষ্ণুতা দাবী করা হয় সেগুলি আসলে বহন করে অন্য ধর্মের প্রতি চরম অসহিষ্ণুতার বাণী।

'তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার কাছে (প্রিয়)' (কোরান—১০৯/৬), যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ করলে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানা যায় বাক্যটির অর্থ আমি তোমাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ কামনা করি, কারণ আমাদের মধ্যে কোনও বোঝাপড়া সম্ভব নয়। এই বাক্য পৌত্তলিকদের সঙ্গে বোঝাপড়ার যাবতীয় ব্যর্থতাই ঘোষণা করছে। অধ্যাপক হর্ষনারায়ণ তাঁর Myth of Composite Culture and Equality of Religion পুস্তকেবহু ইসলামী তত্ত্ববিদের বাক্য উৎকলিত করে দেখিয়েছেন, এই বাক্যটি ইসলাম ও পৌত্তলিকতাবাদের মধ্যকার মৌলিক অসামঞ্জস্য সূচিত করে। ইসলামী তত্ত্ববাদীরা এই বাক্যটিই উৎকলিত করেছিলেন আকবরের সর্বধর্মসমন্বয়ের ও সর্বধর্মের সঙ্গে সহাবস্থানের নীতিকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করার জন্য। এর থেকে একটা সাধারণ ধারণা করা যেতে পারে : যেসব বাক্যকে ইসলামের সহিষ্ণুতা প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যবহার করা হয়, হুবহু সেই বাক্যগুলিই ইসলামী তত্ত্ববিদরা ব্যবহার করেন ইসলামী অসহিষ্ণুতা প্রদর্শনের জন্য।

"ধর্মের জন্য কোনও জবরদস্তি নেই", কোরানের ২/২৫৬ প্রত্যাদেশ বাক্যের এই খণ্ডাংশটি অনেকে ব্যবহার করেন ইসলামী সহিষ্ণুতার উদাহরণ-বাক্য হিসাবে। আসলে এই বাক্যটি ইসলামী নিয়তিবাদের বাক্য: কে মুসলমান হয়ে পূণ্য অর্জন করবে আর কে বিধর্মী থেকে নরকস্থ হবে তা আল্লাহ্‌র দ্বারা পূর্বনির্ধারিত। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তুমি ইসলামায়িত হয়ে স্বর্গবাস করবে, নতুবা তুমি কাফের থেকে নরকবাস করবে। নরকের বীভৎস বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান যে আল্লাহ্ এক নিষ্ঠুর অস্তিত্ব। ঠিকভাবে বিচার করলে বোঝা যায় এই বাক্য জোর জবরদস্তি করে ইসলামায়নের প্রত্যাদেশ। তোমাকে যদি তরবারী দেখিয়ে ইসলামায়িত করা হয়, তবে আল্লাহ্ তা ইচ্ছা করেছেন বলে ধরে নিতে হবে। কারণ, তাতে তুমি নরক যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পাবে। এ সমস্তই আল্লাহ্‌র বিধান। তোমার ভাল করার জন্য

আল্লাহ্ জবরদস্তির আশ্রয় নিয়েছেন। ধর্মে কোনও জবরদস্তি নেই কথাটির অর্থ এই নয় যে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম সমান। কারণ, ঐ আয়াতের পরের আয়াতে বলা হয়েছে, *"আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক যারা বিশ্বাস করে। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যান। আর যারা সত্য প্রত্যাখান করে বিভ্রান্তকারীরা তাদের অভিভাবক। এরা তাদের আলোক থেকে অন্ধকারে নিয়ে যাবে।"* অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলিম নেতা শাহ্ ওয়ালিউল্লা এই প্রত্যাদেশটিকে বলপূর্বক ইসলামায়নের নির্দেশবাক্য বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

কোরানের ১০/৯৯ থেকে পরবর্তী প্রত্যাদেশগুলি হলো:*তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই বিশ্বাস করতো। তবে কি তুমি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে? ১০/১০০ আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত বিশ্বাস করা কারও সাধ্য নেই এবং যারা অনুধাবন করেনা আল্লাহ্ তাদের কলুষলিপ্ত করেন। ১০/১০১ বল, 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ্য কর।' নিদর্শনাবলী ও ভীতিপ্রদর্শন অবিশ্বাসী মানুষদের উপকারে আসেনা। ১০/১০২ ওরা ওদের পূর্বে যা ঘটেছে তার অনুরূপ ঘটনারই প্রতীক্ষা করে। বল, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমি তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।' ১০/১০৩ পরিশেষে আমি তোমাদের রসুলদের উদ্ধার করি এবং এভাবে বিশ্বাসীদের উদ্ধার করি। আমার দায়িত্ব বিশ্বাসীদের উদ্ধার করা। ১০/১০৪ বল, 'হে মানুষ! তোমরা যদি আমার ধর্মের প্রতি সংশয়যুক্ত হও তবে (জেনে রাখ), তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যার উপাসনা কর আমি তার উপাসনা করিনা, পরন্তু আমি উপাসনা করি আল্লাহ্‌র যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং আমি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।*

ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় অবতীর্ণ এই বাক্যগুলিতে ইসলামী নিয়তিবাদের এক রূপ দেখা যাচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে মুহাম্মদ যখন দেখছেন অল্প লোককেই তাঁর মতে আনতে পারছেন তখন এই বলে নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছেন যে ধর্মান্তর করার ব্যাপারটা আল্লাহ্ নিজেই দেখবেন। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ধর্মান্তরিত করবেন। পরে ইহুদী পয়গম্বর জোনার কথা বলা হয়েছে। জোনা নিজে একসময় নিজের কর্ম সম্পর্কে সন্দিহান হয়েছিলেন। তখন তিনি এই বলে নিজেকে প্রবোধ দিয়েছিলেন যে, তিনি ঈশ্বর যিহোভার দ্বারাই কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সুতরাং সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর করছে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরই। এরপর ১০৪ নং বাক্যতে ইসলামী নিয়তিবাদ সংযুক্ত হয়েছে বিধর্মীদের নরকস্থ করার সঙ্গে। এখানে মনে রাখতে হবে মক্কায় প্রথম যুগে মুহাম্মদের জোর করে ধর্মান্তরিত করার সামর্থ ছিলনা। জোর করে ধর্মান্তরকরণ আরম্ভ হয় মদিনা পর্যায় থেকে। সুতরাং এইসব বাক্যাবলী কখনও ইসলামী সহিষ্ণুতার পরিচয় নয়।

আল্লাহ্‌র উপাসনা করার ও অসৎ (বিশৃঙ্খলা) বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসুল পাঠিয়েছি। অতঃপর ওদের কিছুকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওদের কতকের সংগতভাবেই পথভ্রান্তি হয়েছিল (১৬/৩৬)।

এই প্রত্যাদেশবাক্য কখনই বলেনি যে শ্রীরামচন্দ্র, যাজ্ঞবল্ক, জরথুস্ত্র, নুমা পম্পিলিয়াস,

শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাবীর, লাওৎসে, মনি, শংকরাচার্য, নানক, দয়ানন্দ সরস্বতী এবং সমস্ত ধর্মসংস্কারকরা যথার্থ আল্লাহ্‌র দূত। বাক্যের দ্বিতীয় অংশ সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করছে এই বাক্যের বক্তব্য সে রকম কিছু নয়। এই দৈববাণী সমস্ত মানুষকে বলছে, *"আল্লাহ্‌র সেবা কর এবং তাগুৎ (পৌত্তলিকদের এক দেবতা) কে অস্বীকার কর।"* ইব্রাহিমের বংশধর ছাড়া অন্য কোনও ধর্মীয় নেতা এ ধরনের কথা বলেননি। এই বাক্য কখনও বলেনি, ধর্মীয় চরিত্র মাত্রই আল্লাহ্‌র দূত। এমনকি ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মীয় চরিত্রও নয়। কারণ, আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসই সব কথা নয়। মুহাম্মদের পয়গম্বরত্বও স্বীকার করা চাই।

বাক্যের দ্বিতীয় অংশে আবার সেই ইসলামী নিয়তিবাদের কথা বলা হয়েছে। কিছু জাতির ধর্ম মিথ্যা। কারণ, তাও আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। তিনিই কিছু জাতির ধর্মকে মিথ্যা তৈরী করেছেন, যাতে তারা পরিত্রাণ না পায়, নরকস্থ হয়।

এছাড়া অমুসলমান সম্প্রদায়সমূহ কখনও দাবী করতে পারবে না যে তারা কখনই আল্লাহ্‌র নাম শোনেনি। তাদের ঐতিহাসিক ধর্মীয় চরিত্র সমূহ একদিকে যেমন মিথ্যা পয়গম্বর, এই বাক্যটি বলছে তাদের প্রতি সত্য পয়গম্বর পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তারা তাদের প্রত্যাখান করেছে। আরবের পৌত্তলিকদের প্রতি যেমন ইব্রাহিমকে পয়গম্বর করে পাঠানো হয়েছিল, তেমনই পয়গম্বর পাঠানো হয়েছিল সবার জন্যই। এখনও যদি তারা পুতুল পূজা করে, তবে তার জন্য তারাই দায়ী। এই বাক্যের বক্তব্য সেই কাল্পনিক গল্পের বক্তব্যের মত—আরবরা ইসমাইলের মাধ্যমে ইব্রাহিমের বংশধর এবং তাদের কাবা বহুদিন আগে এক একেশ্বরবাদী উপাসক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে চুরি হয়ে গিয়েছিল। এই বাক্যের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য: পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী প্রেরণ করা হয়েছিল কিন্তু তারা তা অস্বীকার করেছে। মুহাম্মদের ধর্মই বিশ্বজনীন ধর্ম, বাকী সবই ঝুটা।

কিন্তু ইতিহাস বলেনা যে প্রত্যেকটি জাতির কাছে আল্লাহ্‌র দূত উপস্থিত হয়েছিলেন। আমরা নির্দ্বিধায় সিদ্ধান্ত নিতে পারি, সারা কোরানে একটাও বাক্য নেই যাতে অন্য ধর্মের মানুষদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য বা ধর্মীয় সহিষ্ণুতার জন্য কোনও বাণী আছে। সমস্ত পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে দেখা যাচ্ছে যে বাক্যগুলিকে সহিষ্ণুতার বাণী বলা হচ্ছে সেগুলি আসলে বলপূর্বক ইসলামায়নের বাণী।

তাছাড়া, আমরা যদি ধরেও নিই ঐ বাক্যগুলি সহিষ্ণুতার বাণী, তাহলেও সেগুলি ইসলামী আইন অনুসারে সহিষ্ণুতার বাণী হিসাবে নেওয়া যাবেনা। কারণ, বাতিলের নিয়ম অনুসারে যদি কোরানের দুটি বাক্য পরস্পর বিরোধী হয়, তাহলে পরবর্তীকালে অবতীর্ণ হওয়া বাক্য পূর্ববর্তী বাক্যকে বাতিল করে। উল্লিখিত বাক্যগুলির মধ্যে কিছু মক্কায় অবতীর্ণ, কিছু অবতীর্ণ মদিনায় প্রথম যুগে, যখন মুহাম্মদ তেমন শক্তি সঞ্চয় করেননি। যাই হোক, যদি সেগুলি সহিষ্ণুতার বাক্য হয়ও, পরে সেগুলি বাতিল হয়ে গেছে জেহাদী বাক্যগুলির দ্বারা। যেমন: *অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদের যেখানে পাবে বধ করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে, কিন্তু যদি*

তারা তওবা (অনুতাপ) করে, যথাযথ নামাজ পড়ে ও জাকাত দেয় (দান করে) তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯/৫)।

আমার মনে হয় পরিপ্রেক্ষিতটা আরও বৃহত্তর ভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন--শুধু বাক্য অবতীর্ণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত চিন্তা না করে সাধারণ সমাজ-রাজনৈতিক ও মুহাম্মদের সমকালীন সামরিক পরিপ্রেক্ষিত চিন্তা করার প্রয়োজন। প্রথমতঃ মুহাম্মদ নিজেই আক্রমণকারী--তিনি মক্কার ধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। তিনি নিজেই মক্কাবাসীদের বাণিজ্যবাহী উটের সারি আক্রমণ করেছেন, নির্বাসিত করেছেন ইহুদীদের, এবং তাদের এক গোষ্ঠিকে গণহত্যা করেছেন--কারণ, তারা তাঁকে পয়গম্বর বলে মানতে চায়নি। মুহাম্মদের উত্তরসুরীরা ব্যাপক আগ্রাসনের মাধ্যমেই ইসলামের প্রসারণ ঘটিয়েছেন।

এছাড়া ইসলামী মতে পরিপ্রেক্ষিতের বিচার শুধু অপ্রাসঙ্গিকই নয়, অপবিত্রকর। কারণ, কোরান আল্লাহ্র নিজের কথা। চিরন্তন সত্য। কোরানের কোনও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত নেই। কোনও রকম অস্পষ্টতা ও রহস্য নেই সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র বাণীর মধ্যে। কারণ, কোরানের বাণী শুধু আরবের মুসলমানদের জন্য নয়, সর্ব যুগের সমগ্র মানবজাতির জন্য। সেজন্য কোরান যদি কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে থাকে, তবে সর্বযুগের সমস্ত মুসলমানদের কর্তব্য এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া।

কোরানের পুনর্ব্যাখ্যাও সম্ভব নয়। কারণ, কোরানের বক্তব্য সুনির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে এবং তা সুনির্দিষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাবে মানুষকে বিধান দিচ্ছে। কোরান যেহেতু আল্লাহ্র শেষ বিধান, আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সমন্বিত করে তার পরিবর্তন সম্ভব নয়। আল্লাহ্ যা বলেছেন তার বিপরীত করে কোরানের বাক্যের ব্যাখ্যা করা নিষ্ফল অকাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। নিঃসন্দেহে কিছু মুসলমান আছেন, যাঁরা পরমতসহিষ্ণু। কিন্তু তাঁরা কোরান সম্পর্কে যে পবিত্র মিথ্যার জল্পনা করছেন তা অন্য মুসলমানদের কোরান পড়া ও তার থেকে বিধর্মীদের প্রতি বলপ্রয়োগের নীতি গ্রহণ করায় কোনও বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। পরমতসহিষ্ণু শান্তিপ্রিয় মুসলমানরা যদি তাঁর শিশুদের বলেন কোরান আল্লাহ্র নিজস্ব বক্তব্য তবে তার ফল কী হবে সেটা বিবেচনা করা প্রয়োজন। তাঁরা নিজেরা ব্যাখ্যা করতে পারেন যে ধর্মে কোনও জবরদস্তি নেই এবং কোরানের বল প্রয়োগের বাক্যগুলি অগ্রাহ্য করতে পারেন। কিন্তু তাঁদের সন্তানরা যখন কোরান পড়বে তখন তারা যথার্থ আক্ষরিক অর্থে কোরান পড়ে দেখবে যে তাতে পরমতসহিষ্ণুতা বলতে কিছুই নেই। বহু ইসলামী সন্ত্রাসবাদীদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন পরমতসহিষ্ণু সুফি মরমীয়া।

অন্যদিকে বহু ইসলামপন্থী অমুসলমানদের প্রতারণা করে বলে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ইসলামী মূল্যবোধ। এইভাবে সন্ত্রাসের বাক্যগুলি গোপন করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রতিপন্ন হয় ইসলাম তার যথার্থ মুখ দেখাতে প্রস্তুত নয়। তার একমাত্র প্রচেষ্টা কী করে নিজের ভয়াল রূপ গোপন করে সহিষ্ণুরূপ দেখানো যায়।

ইসলামের সেই মহান সংস্কৃতি!

"কিন্তু আপনি কি ইসলামের মহান সংস্কৃতিকে অস্বীকার করছেন না? হারুন অল রশিদের ইসলামী সাম্রাজ্যে সংস্কৃতির প্রভূত উন্নয়ন ঘটেছিল, যখন সম্রাট শার্লম্যান সবে লিখতে পড়তে শিখছিলেন। ইসলামী দার্শনিক আবিসেন্না ও আভারিওর কাছে ইউরোপ প্রভূতভাবে ঋণী। আর বীজগণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও আরবী সংখ্যা ইসলামী সংস্কৃতির অবদান"

উত্তর: শার্লম্যানের বহু আগেই ইউরোপ লিখতে পড়তে শিখেছিল। শার্লম্যানের এক হাজার বছর আগেই ইউরোপের লোকেরা রুনিক লিপি ব্যবহার করতো। তারও কয়েক শতাব্দী আগেই গ্রীকরা শিক্ষিত ছিল। বস্তুতঃপক্ষে বলক্যান প্রদেশের নব-আবিষ্কৃত এক শিলালিপি থেকে জানা যাচ্ছে তা খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের। অর্থাৎ, তা সুমেরিয় সভ্যতা থেকেও প্রাচীন। ঠিক আছে, আপনি যদি ইউরোপের সবচেয়ে কম উন্নত অংশের সঙ্গে আব্বাসীয় খেলাফতের সবচেয়ে উন্নত অংশের সঙ্গে তুলনা করতে চান, তাহলে বলবো পরেরটি অবশ্যই বেশী সংস্কৃতিবান ছিল।

তবে মধ্যযুগের ইসলামী সাম্রাজ্যের সংস্কৃতির উন্নতির জন্য ইসলামের কোনও অবদান নেই। পশ্চিম এসিয়াকে লিখতে পড়তে ইসলাম কোনও সাহায্য করেনি। ইসলামের অভ্যুদয়ের এক থেকে চার শতাব্দী আগেই মেসোপটেমিয়া, মিশর, গ্রীস, রোমের মানুষরা, এমনকি আরবের পৌত্তলিক—যাদের সংস্কৃতি মুহাম্মদ ধ্বংস করেছিলেন, তারাও শিক্ষিত ছিল। ইসলামী সংস্কৃতি বলে এখন যা প্রচারিত হচ্ছে তা আসলে ভারতীয় ও গ্রীক সংস্কৃতি মিশ্রিত পারসিক সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির মিশ্রণও ইসলামের অবদান নয়। ইসলামের অভ্যুদয়ের বহু আগে থাকতেই ভ্রমণরত বণিক ও ছাত্রদের দ্বারা এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশে বহন পৃথিবী জুড়ে চলেছে। চলেছে সংস্কৃতির সংশ্লেষণও। ইসলামের অভ্যুদয়ের বহু আগেই গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষবিদ্যা ভারতে বাহিত হয়ে এসেছে। চীনে আবিস্কৃত কম্পাস বা ভারতে আবিস্কৃত শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের বদলে বাইজ্যান্টাইনীয় বা সাসানীয় সাম্রাজ্য থাকলেও আরবে চলে যেত।

আরবীয় সংখ্যা বলে এখন যা প্রচারিত তা আসলে ভারতীয়। আরবরা সেগুলিকে বলে হিন্দসা। এটা সত্য যে গ্রীস ও ভারত থেকে গ্রহণ করা গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা কিছু কিছু মুসলমান বিজ্ঞানীর দ্বারা বিকাশলাভ করেছিল। (যেমন অল-খাওয়ারিজমী, যার নামের সঙ্গে অ্যালগারিদম কথাটি যুক্ত)। কিন্তু এইসব বিজ্ঞানীরা ইসলাম দ্বারা অনুপ্রাণিত হননি। আরবী চিকিৎসা বিদ্যা গ্রীক চিকিৎসা বিদ্যারই অনুবর্তন, ইউনানী টিব্ব নাম থেকেই তা স্পষ্ট। ইউনান কথাটির অর্থ গ্রীক। শব্দটি এসেছে আইওনিয়া শব্দ থেকে। এসিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলকে বলা হতো আইওনিয়া। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই অঞ্চল গ্রীক অধ্যুষিত ছিল। ঐ সময়ে জেহাদ করে গ্রীকদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা হয়।

আভ্যারিও বা ইবন রশিদ এবং আভিসেনা বা ইবন সেনার ইউরোপীয় দর্শনে প্রচুর অবদান আছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু এর মধ্যে ইসলামের কোনও অবদান নেই। কারণ তাঁরা

শুধুমাত্র ইসলাম-পূর্ব যুক্তিবাদী এবং পরীক্ষাবাদী গ্রীক দর্শনের রক্ষণ ও বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। এই ধরনের অ-ইসলামী চিন্তার জন্য তাঁরা দুজনেই ত্রাস ও বিতাড়নের সম্মুখীন হয়েছিলেন। দর্শনে তাঁদের অবদানের জন্য ইসলামের কোনও কৃতিত্ব নেই, বরঞ্চ ইসলাম তাঁদের বাধা দিয়েছিল। ইসলামে মুক্ত চিন্তার কোনও স্থান নেই। সংস্কৃতিতে ইসলামী প্রভাবের একমাত্র নজির নানারকম জ্যামিতিযুক্ত শিল্প। কারণ, মুসলমান শিল্পীদের শিল্প-বুভুক্ষা মেটাতে হয়েছিল নানা রকম প্রাণহীন আকার এঁকে বা নির্মাণ করে—ইসলামে কোনও প্রাণীর চিত্র আঁকা বা নির্মাণ করা নিষেধ। মুসলমানরা যে সমস্ত দেশ অধিকার করেছে সেইসব দেশের বৈজ্ঞানিক, প্রায়োগিক ও অর্থনৈতিক জীবনে তাদের অবদান সামান্যই। কিন্তু তারা যা ধ্বংস করেছে তা অমূল্য। মহান পারসিক সংস্কৃতি থেকে শুধুমাত্র বস্তুগত সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। ধ্বংস করেছে সমস্ত অ-ইসলামী শিল্পদ্রব্য ও রচনাবলী। ইসলামপূর্ব ইতিহাস হয় নষ্ট করা হয়েছে, না হয় বিকৃত করা হয়েছে এবং রচনা করা হয়েছে মিথ্যা বংশতালিকা। আজও বহু দেশে ইতিহাস আরম্ভ হয় মুহাম্মদ থেকে-ইসলামপূর্ব সভ্যতাকে বর্ণনা করা হয় 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' বলে।

ভারতের ক্ষেত্রে ইসলামের সাংস্কৃতিক অবদান বলতে যা বলা হয় তা মিথ্যা। বিখ্যাত মুঘল চিত্রকলার জন্য ভারত অন্ততঃ ইসলামের কাছে ঋণী নয়। মনুষ্য বা জীবজন্তুর চিত্র আঁকা ইসলামে নিষিদ্ধ। এই বিখ্যাত চিত্রধারার জনক সম্রাট আকবর। তাঁকে সাধারণভাবে ধর্মদ্রোহী বলেই বর্ণনা করা হয়। এই ধারার চিত্রকররা ছিলেন হিন্দু আর এই ধারার মৃত্যু ঘটেছিল শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের দ্বারা।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছিল আকবরের রাজসভার সঙ্গীতজ্ঞদের দ্বারা, এটাও এক হাস্যকর দাবী। তবে আকবর উন্মাদ মোল্লাদের ভ্রুকুটি অগ্রাহ্য করে সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষণা করেছিলেন, এটা সত্য। হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের বহু গায়কই মুসলমান। তার কারণ, হিন্দু শিল্পীরাই পরবর্তীকালে মুসলমান হয়ে যায়। এই সমস্ত শিল্পীরা পাক্কা মুসলমান নয়। কারণ, হাদিশ অনুযায়ী পয়গম্বর মুহাম্মদ সঙ্গীত পছন্দ করতেন না। সঙ্গীতকে ইসলামে মোটেই ভাল চোখে দেখা হয়না।

ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে এমন কিছুই নেই যা ইসলামের আগমন না হলে সৃষ্টি হতো না। পরন্তু ইসলাম ভারতীয় সংস্কৃতির অনেক কিছুই ধ্বংস করেছে, ইসলাম না এলে তা বেঁচে থাকতো।

অষ্টম পর্ব

গাঁধিজী ও গুজরাট

ভারতের ধর্মেতরবাদীরা গাঁধিজীকে প্রয়োজন মত ব্যবহার করে। *গুজরাট: নরমেধ যজ্ঞ* পুস্তকে গাধিঁজীকে প্রচুর গালিগালাজ করা হয়েছে। লেখা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ সন্দেহ করেছিলেন গাঁধিজীর মনে মুসলমান বিদ্বেষ আছে। কাজী আবদুল ওদুদের লেখনী দিয়ে বলা হয়েছে গাঁধিজী মনে করতেন হিন্দুরা কাপুরুষ আর মুসলমানরা গুন্ডা, এইটাই হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কারণ। আবার গাঁধিজীকে ব্যবহার করা হয়েছে মুসলিমপ্রেমী রূপে হিন্দু সমাজের লগুড় হিসাবে। গাঁধিজী সত্যই কি ছিলেন তা এখন বিচার করার সময় এসেছে।

গাঁধিজীর সম্বন্ধে ধারণা করার জন্য পুরো উদ্ধৃতিটি পড়া দরকার: ''আমার কোনও সন্দেহ নেই যে বেশীভাগ ক্ষেত্রেই হিন্দুরা হেরে যায়। আমার অভিজ্ঞতা এই মত সমর্থন করে মুসলমানরা সাধারণভাবে গুন্ডা আর হিন্দুরা সাধারণভাবে কাপুরুষ। আমি এই ঘটনা দেখেছি ট্রেনের মধ্যে, রাস্তায় এবং যে সমস্ত ঝগড়া আমি নিজে মিটমাট করেছি। নিজেদের কাপুরুষতার জন্য কি হিন্দুরা মুসলমানদের দায়ী করবে? যেখানে কাপুরুষ আছে সেখানে সর্বদা গুন্ডারা থাকবে।

''বলছে সাহারাণপুরে মুসলমানরা লুটপাট করছে, সিন্ধুক ভাঙছে এবং একটি ক্ষেত্রে স্ত্রী লোকের শ্লীলতাহানিও করছে। দোষটা কার? এটা সত্য মুসলমানদের এই ঘৃণ্য কাজ করার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ নেই। কিন্তু মুসলমান গুন্ডাদের উপর ক্রুদ্ধ হওয়ার চেয়ে আমি হিন্দুদের কাপুরুষতার জন্যই বেশী লজ্জিত। বাড়ীর মালিকরা নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য মৃত্যুবরণ করেনি কেন? শ্লীলতাহানির সময় সেই বোনের ভাইরা কোথায় ছিল?

''নিজেদের রক্ষা করার দায়িত্ব কি তাদের নেই? অহিংসার অর্থ নিজেদের পরিজনদের অরক্ষিত অবস্থায় রেখে দেওয়া এবং বিপদ থেকে পালিয়ে যাওয়া নয়। হিংসা ও কাপুরুষচিত পলায়নের মধ্যে আমি হিংসাই পছন্দ করি।''

এতো কিছু বললেও লক্ষ্য করার বিষয় যে গাঁধিজী কিন্তু গাঁধিজীতেই আছেন। লুটেরাদের প্রত্যাঘাত করার কথা তিনি বলেননি। তারা নিজেদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য মরুক। কোন বিচারে অপরাধের বলিকেই শুধু মরতে বলা যায়? মৃত্যুদন্ডই যদি দিতে হয় তার প্রাপক তো অপরাধীই হওয়া উচিত। গাঁধিজীর অহিংসার জটিল অঙ্কে সুবিচার বলে কিছু নেই। কোনও নীতিকে ব্যর্থ প্রমাণ করার লক্ষ্যে নিরপরাধ লোকই মরবে।

গাঁধিজীর মনে মুসলমান বিদ্বেষ ছিল কি ছিলনা, তার বিচার করা ঐ উক্তি দিয়ে সম্ভব নয়। তবে দুটি পুস্তকে প্রকাশিত আলোচ্য রচনাগুলির বেশীভাগেই গাঁধিজীর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির কথা সোচ্চারে উচ্চারিত। তবে রবীন্দ্রনাথের মনটাও এই প্রসঙ্গে দেখা যাক:

"কবি বললেন যে মোপ্লা বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই তিনি মালাবার অঞ্চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখে এসেছেন চল্লিশ লাখ হিন্দু এক লাখ মুসলমানের ভয়ে মারাত্মক রকমে অভিভূত। হিন্দু আজ এতো দুর্বল, এমনি অসহায়ভাবে বেঁচে আছে।

কবি বললেন, আমি বিশ্বাস করতে পারিনা মালাবারে ইংরেজের জবর শাসনের অধীনে থেকে যা সম্ভবপর হয়েছে, ইংরেজ শাসনের অবসান হবার দরুনই তা আর সম্ভবপর হবেনা। হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে আর একটি প্রধান ব্যাপার, তা হচ্ছে এই যে মুসলমানের ভৌগলিক সীমাবদ্ধ দেশাত্মবোধ নেই। মোসলেম জগৎ গঠিত হয়েছিল ধর্মের সৌভ্রাত্র অবলম্বন করে আর এই ধর্মের বন্ধনই দুনিয়ার এক প্রান্তের মুসলমানের সঙ্গে অন্য প্রান্তের মুসলমানের মিলন দৃঢ় করে তুলেছে।

কবি বললেন, আমি অনেক মুসলমানকে স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করেছি যে আফগান বা অপর কোন মুসলমান শক্তি যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে তাহলে হিন্দুদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সে আক্রমণ প্রতিহত করতে তারা প্রস্তুত কিনা। জবাব তারা যে দিয়েছেন তাতে আমি নিশ্চিত হতে পারিনি।"

হিন্দু মুসলমান প্রবন্ধে কবি বললেন, "পৃথিবীতে দুটি ধর্ম সম্প্রদায় আছে অন্য ধর্ম মতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র—সে হচ্ছে খৃস্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজেদের ধর্ম পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত।"

এবার আসা যাক গাঁধিজী প্রসঙ্গে। মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধীর জন্ম ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, গুজরাটের পোরবন্দরের এক বেনিয়া পরিবারে। জাত ব্যবসা মুদির হলেও গাঁধিজীর পিতামহ উত্তমচাঁদ গাঁধী মন্ত্রিত্ব করতেন। পিতা করমচাঁদ গাঁধীও তাই। তিনি রাজকোট ও জুনাগড়ের নবাবের প্রধানমন্ত্রীত্ব করেছিলেন। তখন পোরবন্দর ছিল মুসলিম শাসিত জুনাগড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সেখানে বেশ কিছু আরব ও পাঠান মুসলমানের বাস ছিল। তখনকার দিনে এই ধরনের কাজ করার জন্য কূট বুদ্ধিই যথেষ্ট ছিল, করমচাঁদ বা কাবা গাঁধীর পরিমাপযোগ্য বিদ্যা ছিল পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। উত্তরাধিকার সূত্রে মোহনদাস পেয়েছিলেন অসাধারণ কূট বুদ্ধি। গুজরাটের হিন্দুরা প্রধানতঃ জৈন বা বৈষ্ণব। গাঁধিজীরা ছিলেন বৈষ্ণব। তবে ধর্মচর্চা ছিল মন্দির ও উপবাস-কেন্দ্রিক—কোনও রকম তাত্ত্বিক পড়াশুনার ধার ধারতেন না তাঁরা। গাঁধিজী গীতা পড়েছিলেন বিলাতে পড়াশুনা করতে গিয়ে, তাও এডুইন আর্নল্ডের *সঙ সেলেশ্চিয়াল*।

সমকালীন গুজরাটী সমাজের প্রথামত বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীনই বারো বছর বয়সে সমবয়স্কা কস্তুরীবাঈ এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। আঠারো বছর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করে বিলাতে চলে যান ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য। এই ব্যাপারে গাঁধী পরিবারকে সাহায্য করেন সৌরাষ্ট্রের এক মুসলিম ব্যবসায়ী। এই ব্যবসায়ী বিলাতেও মোহনদাসের তদবীর করতেন। বিলাতে মোহনদাসের কিছু মুসলমান বন্ধু বান্ধব জুটে যায়। তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি *অঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়ার* সদস্য হন। অঞ্জুমানের সভা বসতো বিভিন্ন সদস্যের

ঘরে। সেখানে নানা বিষয়ে বিতর্ক হতো। সেই বিতর্কে হিন্দুরাও যোগ দিতে পারতো। এই অঞ্জুমানের কিছু সদস্য পরবর্তীকালে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হন। এঁদের মধ্যে আছেন আলি ইমাম, হাসান ইমাম, মোজহারুল হক—এঁরা তিনজনেই ছিলেন বিহারের। স্যার আবদুর রহমান ছিলেন বাঙলার আর পাঞ্জাবের ছিলেন মুহাম্মদ সফী। এদের মধ্যে শুধু মজহারুল হক ছিলেন কংগ্রেসী। বিহারের সচ্চিদানন্দ সিংহ প্রমুখ আরও কয়েকজন অঞ্জুমানের সভায় যোগ দিলেও তার হিন্দু সদস্য ছিলেন মাত্র দুজন—মোহনদাস ও পাঞ্জাবের হরকিষেন লাল। হরকিষেন লাল পরবর্তীকালে পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। বিলাতে স্বাভাবিক ভাবেই মিশনারীদের পাল্লায় পড়েন মোহনদাস। তাদের তাগিদে *ওল্ড টেস্টামেন্ট* ও *নিউ টেস্টামেন্ট* পড়ার চেষ্টা করেন। নিউ টেস্টামেন্ট পড়ে ফেললেও ওল্ড টেস্টামেন্ট মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারেননি, কিছু কিছু পড়ে ছিলেন। বিলাত থেকে ব্যারিস্টারী পড়ে এসে ব্যবহারজীবির কাজ করেনপ্রথমে মুম্বাইতে ও পরে রাজকোটে। কিন্তু মুখচোরা প্রকৃতির জন্য তেমন কিছু করে উঠতে পারেননি। প্রথম দিন সাক্ষীকে জেরা করতে উঠে হাত পা কেঁপে একাকার। তিনি কেবল ভাল করে দাখিলা লিখতে পারতেন। রাজকোটে পরিচিত জনের সাহায্যে যখন মাসিক তিন শত টাকার মত উপার্জ্জন করছেন তখন একটি মামলায় সাহায্য করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্বোক্ত সৌরাষ্ট্রীয় মুসলিমের এক ব্যবসায় দাদা আবদুল্লা অ্যান্ড কোম্পানী থেকে ডাক এলো। যাতায়াতের জাহাজ ভাড়া ছাড়াও ভাল অঙ্কের অর্থ। সেই ডাকে সাড়া দিলেন গাঁধিজী।

জুলুদের দেশ দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজরা-ওলন্দাজরা উপনিবেশ স্থাপন করলেও বেশ কিছু ভারতীয়ও সে দেশে ব্যবসা বাণিজ্য করে জুলুদের শোষণ করতো। তারা মূলতঃ পার্সী ও গুজরাটী মুসলমান। এ ছাড়া ছিল ভারতীয় কেরাণী, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক ইত্যাদি। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা বেশী ছিল মাদ্রাজী সম্প্রদায়ের। সাধারণভাবে ভারতীয় মুসলমানরা সে দেশে আরব বলে অভিহিত হলেও অন্য ভারতীয়রা *কুলি* শব্দেই অভিহিত হতো। সুতরাং তাদের অবস্থা উপনিবেশবাদীর চোখে জুলুদের চেয়ে খুব ভালো ছিলনা। কিন্তু ভারতীয়রা জুলুদের নিয়ে মাথা ঘামাত না। তারা মাথা ঘামাত শুধু মাত্র নিজেদের ব্যবসাপত্র নিয়ে।

কিন্তু অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে ভারতীয়দের ব্যবসা বন্ধ করার পরে তারা উপনিবেশবাদী শক্তি সম্বন্ধে কিছুটা সতর্ক হয়। আলোচ্য সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকাতে তাদের ভোটাধিকার বাতিলের প্রস্তাবের প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু ভারতীয়দের কোনও শিক্ষিত নেতা ছিলেন না। খ্রীষ্টান ভারতীয়রা উপনিবেশবাদীদের কথা অনুসারেই চলতেন। গাঁধিজী মূলতঃ মুসলমানদের অবহিত করলেন ব্যাপারটির গুরুত্ব সম্বন্ধে। তাঁর মামলা তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল, দেশে ফিরে যাবেন তিনি। সেদিন সেই উপলক্ষ্যে ডারবানের মুসলমানদের সম্বর্ধনা গ্রহণ করছিলেন তিনি।

সভায় গাঁধিজীর মক্কেল, দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানদের নেতা আবদুল্লা শেঠ বললেন যে ব্যাপারটা তাঁদের কিছু কিছু জানা। কিন্তু তাঁরা লেখাপড়া জানেন না। কাজে কাজেই এই বিষয় নিয়ে বেশী দূর অগ্রসর হওয়ার সাধ্য নেই।

অন্য একজন প্রস্তাব করলেন, গাঁধিভাই বরং তাঁর যাত্রা পিছিয়ে দিয়ে এ ব্যাপারে নিয়ে

আন্দোলনে তাঁদের সাহায্য করুন। গাঁধিজী রাজী হয়ে গেলেন সেই প্রস্তাবে। সমবেত ডারবানবাসী মুসলমানরা ধ্বনি দিয়ে উঠলো, আল্লাহু আকবর!

এইভাবে হলভর্তি মুসলমানদের *আল্লাহু আকবর* ধ্বনির মধ্য দিয়েই অভিষেক হলো ভারতশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতার। প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অধিকার নিয়েই তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করলেন। তবে সে আন্দোলন ছিল নিয়মতান্ত্রিক। তিনি ব্যক্তিগতভাবে উপনিবেশবাদী ব্রিটীশ শক্তির পূজারী ছিলেন; ব্রিটীশ রাজের এক ভক্ত প্রজা বলেই নিজেকে মনে করতেন। ঔপনিবেশিক শক্তি যখন বুয়রদের দেশ ট্রান্সভাল আক্রমণ করলো তখন তিনি যুদ্ধে যোগ দিলেন রাজশক্তির হয়ে, যদিও অ্যাম্বুলেন্স কোরে।

দাদা আবদুল্লা অ্যান্ড কোম্পানীর দাক্ষিণ্যে যে মুখচোরা ব্যারিস্টারের জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ ঘটে, আল্লাহু আকবর ধ্বনির মধ্য দিয়ে যার রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয়, তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনরেখা সহজেই অনুমান করা যায়।

জুডিথ ব্রাউন উল্লেখ করে ফ্রান্সিস রবিনসন লিখেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকাতে তিনি একজন মুসলিম নেতা হিসাবেই পরিচিত ছিলেন এবং মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এমনই এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে সেখানকার হিন্দুরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল তাঁর বিরুদ্ধে।

মুলতঃ মুসলমানদের মধ্যে এবং মুসলমানদের জন্য কাজ করার জন্য তিনি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে রাজনীতি করতে আসেন বলে মত প্রকাশ করেছেন জুডিথ ব্রাউন। সেই সময়েই তিনি মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি ভারতে এসে প্রথমেই সখ্যতা স্থাপন করেন মৌলবাদী মুসলমানদের সঙ্গে। তুরস্ক পন্থী মৌলবাদী মুহাম্মদ আলির সঙ্গে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দেই দুবার দেখা করেন এবং মুহাম্মদ আলি ছিন্দওয়ারায় বন্দী হলে মুহাম্মদ আলির সঙ্গে পত্রালাপ করতে থাকেন দূত মারফৎ এবং মুহাম্মদ আলির মুক্তির জন্যও প্রচেষ্টা চালান।

সন্দেহ প্রকাশ করা হয় যে ব্রিটীশ সরকারের নির্দেশেই গাঁধী ভারতে রাজনীতি করতে আসেন। কারণ, সিপাহী বিদ্রোহের ক্ষয়ক্ষতির পর হিংসাত্মক বিদ্রোহ-ভীত ব্রিটীশরাজ চিরকাল মুসলমানদের ভয় করতো। মাঝে সৈয়দ আহমদ খাঁর নেতৃত্বে কিছু মুসলিম মানসে কিছু পরিবর্তন এলেও ইউরোপের পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও অটোম্যান সাম্রাজ্যের ক্ষয় ভারতের মুসলমান সমাজেও প্রভাব সঞ্চার করেছিল। ভারতীয় মুসলমানদের মতিগতি নিয়ে চিন্তিত ছিল ব্রিটীশরাজ। এমত পরিপ্রেক্ষিতে গাঁধিজীর মত একজন রাজভক্ত কিন্তু মুসলিমদের কাছের লোককে প্রয়োজন ছিল ব্রিটীশের। মুলতঃ এই উদ্দেশ্যেই গাঁধীকে ভারতীয় রাজনীতিতে আহ্বান করেন সি.এফ আন্ড্রুজ ও নরমপন্থী নেতা গোখলে। এই অ্যান্ড্রুজের পরামর্শমতই চৌরিচৌরার হিংসাত্মক ঘটনার পর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন গাঁধী।

আমাদের সন্দেহের অনুকূলে আছে গাঁধিজীরই এক স্বীকারোক্তি:

"মুসলমানদের সঙ্গে আমার আঁতাতের দ্বারা আমি তিনটি লক্ষ্য পূরণ করতে পারবো বলে আশা করছি--সত্যাগ্রহের দ্বারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুবিচার, যার ফলে আমি দেখাতে

পারবো অন্য পদ্ধতির তুলনায় সত্যাগ্রহ ভাল, হিন্দুদের জন্য মুসলমানদের বন্ধুত্ব সংগ্রহ; এবং শেষতঃ কিন্তু সবচেয়ে বড়, ইংরেজের প্রতি ও সংবিধানের প্রতি কু-ইচ্ছাকে প্রেমে পরিণত করা— যে সংবিধান নিখুঁত না হলেও বহু ঝড়ঝাপটা সহ্য করেছে।" (ইয়ং ইন্ডিয়া, ৫.৫. ১৯২০)

আমরা আগেই জেনেছি, গাঁধিজী বাইবেল পড়েছেন। তিনি কোরানও পড়েছিলেন। শেঠ আবদুল্লার কাছ থেকেও ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছিলেন। মুহাম্মদের জীবনী ও পড়েছিলেন—ওয়াশিংটন আর্ভিং এর লেখা। পড়েছিলেন কার্লাইলের লেখা মুহাম্মদের প্রশস্তিসূচক কাব্য—*দি হিরো অ্যাজ প্রফেট*। এতে তাঁর মুহাম্মদের প্রতি ভক্তি জেগে ওঠে! কিন্তু কোরান পড়ার পরেও কি করে তিনি আশা করলেন হিন্দু-মুসলমানের বন্ধুত্ব? কোরানে কি লেখা আছে পৌত্তলিকদের সঙ্গে মুসলমানদের সখ্যতার কথা? কোরানে তো আছে দেখামাত্র হত্যা করার কথা।

অবশ্য তিনি পড়েছিলেন জি সেলের কোরান, যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে, জানিনা সে কোরান কেমনতর অনুবাদ। তবে ঐ সময় প্রচলিত ছিল ই এইচ পামারের কোরান (প্রকাশ কাল ১৮৮০)। ঐ সময় উইলিয়াম মিউরের পয়গম্বর জীবনীও প্রকাশিত হয়েছে (প্রকাশকাল ১৮৫৮)। গাঁধিজী যে ইসলামের কিছুই বুঝতেন না তার প্রমাণ আছে তাঁর বক্তৃতার মধ্যে।

উনিশশো সাত চল্লিশ অব্দের দোশরা নভেম্বর এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, "বহুদিন থেকেই তিনি জানেন হিন্দুরা কোরান অনুযায়ী *কাফের* নয়। তবুও তিনি তাঁর মুসলিম বন্ধুদের এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। তাঁরা নিশ্চিত করেন যে হিন্দুরা কোরান অনুযায়ী কাফের নয়। কারণ, তারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন।"

ঘটনা হচ্ছে, কোরানে আছে, *"এবং কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনও গ্রহণ করা হবেনা এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত।"*

আসলে এক নমক হালাল মানসিকতা তাঁর বোধবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ যতটুকু ইসলাম বুঝতেন, তিনি তার ভগ্নাংশও বুঝতেন না। কিন্তু তিনি সহজেই তাঁর তঞ্চক মুসলমান বন্ধুদের কথা বিশ্বাস করতেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের পটভূমির পার্থক্য সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অচেতন। খেলাফৎ আন্দোলনে তাঁর হিন্দুঘাতী ভূমিকা নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি। এবার আলোচনা করবো আরও কয়েকটি বিষয়ে।

শুদ্ধি আন্দোলন প্রবর্তন করার জন্য গাঁধিজী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও আর্যসমাজের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। শুদ্ধি আন্দোলন প্রাথমিকভাবে প্রবর্তিত হয়েছিল মোপলাদের দ্বারা বলপূর্বক ইসলামায়িত হিন্দুদের শুদ্ধি করে পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য। পরে অবশ্য সেটি অন্যত্র প্রয়োগ করা হয়। আগ্রা অঞ্চলের মালকানা রাজপুতদের ব্যাপকভাবে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নেতৃত্বাধীন আর্যসমাজ। এতে গাঁধিজী প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হন শ্রদ্ধানন্দের প্রতি। তাঁকে 'ধ্বংসাত্মক,' 'বিরক্তিকর', 'উত্যক্তকর' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেন।

মনে রাখতে হবে এই শ্রদ্ধানন্দই প্রথম গাঁধিজীকে 'মহাত্মা' অভিধায় অভিহিত করেন। যদিও গাঁধিজী শুধুমাত্র শ্রদ্ধানন্দেরই সমালোচনা করেননি, তিনি সমালোচনা করেছিলেন দিল্লীর নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগার খাজা হোসেন নিজামীরও। নিজামী বলপূর্বক ইসলামায়নের জন্য হ্যান্ডবিল প্রচার করছিলেন। কিন্তু ফিরিঙ্গি মহলের বিখ্যাত মৌলবাদী আবদুল বারী যখন শুদ্ধি দ্বারা হিন্দুধর্মে ফিরে আসা মুসলমানদের ইসলামী বিধান অনুযায়ী হত্যা করার জন্য মত প্রকাশ করলেন তখন গাঁধিজী প্রতিবাদ তো করলেনই না, উপরন্ত 'ভগবানের সরল ছেলে' 'আমাদের বন্ধু' ইত্যাদি বিশেষণে প্রশংসা করলেন।

এই ঘটনা গাঁধিজীর এক ধরনের মানসিকতা প্রকাশ করে। আবদুল বারীর সঙ্গে শ্রদ্ধানন্দ-নিজামীর পার্থক্যটা কোথায়? বারী সত্যসত্যই হিংসার প্রয়োগের কথা বলেছিলেন। শ্রদ্ধানন্দ-নিজামী সেখানে নিতান্তই বাকযোদ্ধা। বাকযোদ্ধাদের প্রতি গাঁধিজী অত্যন্ত কঠোর, আবার প্রকৃত মস্তানদের সঙ্গে তাঁর আচরণ অত্যন্ত মিষ্ট। আমরা দেখেছি মোপলা, বারী, সুরাবর্দী প্রভৃতির তিনি কোনও দোষ দেখেননি। কারণ, সুরাবর্দী গাঁধিজীকে মোটেই তোয়াক্কা করতেন না। গাঁধিজীকে শুধু ব্যবহার করতেন। গাঁধিজী একদা সুরাবর্দীকে বলছিলেন, "হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি হারানো জীবনের জন্য আপনিই দায়ী।"

সুরাবর্দী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, "না, এর জন্য আপনিই দায়ী। কারণ, আপনি মুসলমানদের প্রতি সুবিচার করেন নি।"

বাবাসাহেব আম্বেদকর গাঁধিজীর সম্বন্ধে লিখেছেন, "হিন্দুদের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ করলেও তিনি কখনও মুসলমানদের কাছে কৈফিয়ৎ চাননি।" তিনি মুহাম্মদ ও ইসলামকে সমালোচনা করার জন্য কতকগুলি হিন্দু হত্যার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ,আর্য সমাজী লালা নানকচাঁদ, *রঙ্গিলা রসুলের* রচয়িতা রাজপাল (রাজপাল *রঙ্গিলা রসুল* লিখেছিলেন সীতা সম্বন্ধে একই ধরনের অপবাদমূলক পুস্তকের প্রতিবাদে)। তিনি লিখেছেন এই তালিকা ছোট কিন্তু এটাকে অনায়াসে দীর্ঘ করা যায়। বাবাসাহেব লিখেছেন, অহিংসার পুজারী হলেও, অন্য যে কোনও হিংসার প্রতিবাদ করলেও গাঁধিজী কখনও এইসব হিংসার নিন্দা করেননি, মূক থেকেছেন।

এর ব্যাখ্যা একটাই হতে পারে--তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে এতই মূল্য দিতেন যে তার জন্য কিছু হিন্দুর প্রাণ গেলেও তিনি বিচলিত হতেন না। কিন্তু এটা যে সঠিক ব্যাখ্যা নয়, একটা নমকহালালী চেতনা গাঁধীর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তীকালের বিভিন্ন কথায় ও বক্তৃতায়:

"হিন্দুরা মুসলমানদের উপর কখন ও ক্রুদ্ধ হবেনা এমনকি তারা যদি হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করে দিতেও চায়। তারা যদি আমাদের হত্যা করতে চায় তাহলেও আমরা বীরের মত মৃত্যু বরণ করবো।" (৬.৪.১৯৪৭)

" রাওয়ালপিন্ডি থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তাঁরা শুধালেন, এখনও যারা পাকিস্তানে রয়ে গেছেন তাদের কি হবে? আমি তাদের শুধালাম

রাওয়ালপিন্ডি ছেড়ে তারা কেন এখানে চলে এসেছেন? তারা সেখানেই মরলেন না কেন ? প্রত্যেকের নিজের জায়গা আঁকড়ে থাকা উচিত। এমনকি নিষ্ঠুর অত্যাচার ও জীবনের বিনিময়েও। লোকে যদি আমাদের খুনও করে, তাহলে ভগবানের নাম মুখে নিয়ে সাহসের সঙ্গে আমাদের খুন হওয়া উচিত। আমাদের পরিজনদের খুন করলেও খুনির উপর আমার ক্রুদ্ধ হবনা। আমাদের উপলব্ধি করা উচিত মৃত্যু হলেও তারা সদগতি প্রাপ্ত হয়েছে।" (২৩.১১.১৯৪৭)

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের সম্পর্কে তিনি একই ধরনের কথা বলেছিলেন। সাহসী নারী পুরুষদের বাড়ীঘর ছেড়ে চলে আসা উচিত নয়। তাদের উচিত সেখানে থেকে বীরের মত মৃত্যু বরণ করা।

ল্যারী কলিন্স ও ডোমিনিক ল্যাপিয়ের লিখেছেন, পশ্চিম পাঞ্জাবের কয়েকজন উদ্বাস্তু এলে গাঁধিজী তাদের নিজেদের দেশে ফিরে যেতে বললেন, তাতে তাদের নিশ্চিত মৃত্যু ঘটলেও। তিনি বললেন, "সমস্ত পাঞ্জাবীরা যদি হত্যাকারীদের হত্যা না করে মৃত্যুবরণ করে তাহলে পাঞ্জাব অমর হয়ে থাকবে। নিজেদের অহিংসক, ইচ্ছুক বলি হিসাবে দান করো।"

নোয়াখালিতে লুই ফিশারের কাছে ইসলামী মৌলবাদী কর্তৃক হিন্দু নারী ধর্ষণ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য: ধর্ষিতা নারীদের আত্মহত্যা করা উচিত। ধনঞ্জয় খীর লিখেছেন, এর অনেক আগে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাইয়ের নবজীবন পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন যে ভগিনীর ধর্ষকের পা তিনি চাটবেন।

কাশ্মীরে প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, যাঁরা কাশ্মীরে প্রতিরক্ষা করছেন তাঁরা যদি শত্রুদের প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ পোষণ না করে একটা ঘুঁসিও না মেরে যদি মৃত্যু বরণ করেন তবে তাঁরা বীরত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে ইতিহাসে একটা নতুন উদাহরণ সৃষ্টি করবেন। (৫.১১.১৯৪৭)

নাৎসীদের ইহুদী-নিধন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য: তারা নাৎসীদের বিরুদ্ধে গণ সত্যাগ্রহ করুক। ১৯৩৬ অব্দের ৯ই নভেম্বরের ক্রিস্টালন্যাখট গণহত্যা র পরে নাৎসী বীভৎসতার সবকিছু জানার পরেও তিনি *হরিজন* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় লিখেছিলেন এই কথা। পরে ১৯৪৬ অব্দেও তিনি নিজের বক্তব্যে অটল ছিলেন। বলেছিলেন ইহুদীদের কসাইএর ছুরিতে আত্মসমর্পণ করা উচিত ছিল। এই গাঁধীই আবার মুসলিম সমর্থক হিসাবে পালেস্টাইনে ইহুদীদের পুনর্বাসনের বিরোধী ছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চার্চিলের আমলে তিনি লর্ড লিনলিথগোকে বলেছিলেন জার্মানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করতে। শুনে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন বড়লাট। বস্তুতঃ অপরের মৃত্যুকে খুব সহজভাবেই নিতেন তিনি। যে কোনও অলীক আদর্শের জন্য একজন মৃত্যুবরণ করবে। সেই একজন কিন্তু কদাচ মুসলমান নয়। আর তিনি নিজে? তার নিজের জীবনকে সুস্থ রাখার জন্য কত প্রচেষ্টা! নির্মল কুমার বসু একদা তাঁর সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন গাঁধিজীর বহুঘন্টাব্যাপী স্নানাহারের

চিত্র।

আজকে মুষ্টিমেয় গাঁধিবাদী ছাড়া যে কোনও সুস্থমতির মানুষ বলবেন এসব কথা যে উচ্চারণ করতে পারে সে একটি বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া কিছুই নয়। বস্তুতঃপক্ষে দীনশা ওয়াচা তাঁকে পাগল ও উদ্ধত বলেছিলেন। ঐতিহাসিক পল জনসন লিখেছেন, ''রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর আধাধার্মিক দৃষ্টিভঙ্গী লেনিনের মত, যদিও বাতিকের ব্যাপারে তিনি হিটলারের অনেক নিকটবর্তী। তাঁর অন্যতম প্রিয় পুস্তক হচ্ছে *কোষ্ঠকাঠিন্য ও আমাদের সভ্যতা।* ধর্মপাগল মানুষদের শ্রদ্ধা করে এমন এক জাতির কাছে তাঁর পাগলামি মূল্য পেয়েছে। কিন্তু ভারতের সমস্যার সমাধানে তাঁর শিক্ষার কোনও দাম নেই।'' ফরাসী ভারতত্ত্ববিদ অ্যালান ডানিলাউ গাঁধিজী সম্বন্ধে লিখেছেন, '' এক দুর্বোধ্য চরিত্রের গুরু, ধূর্ত ও সাধু, উচ্চাকাঙ্খী ও নিবেদিতপ্রাণ , যিনি জনতার উপর এমন এক চৌম্বকীয় প্রভাব বিস্তার করতে পারেন যা তাদের সর্বনাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।''

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যখন সীমান্তের এপারে ওপারে চলছে দাঙ্গা ও সংখ্যালঘু বিতাড়ন, তখন প্রায়ই প্রার্থনা সভায় গাঁধিজী বলতেন, পাকিস্তানের মুসলমানরা যদি অমুসলমানদের তাড়িয়ে দেয়, বা ভারত থেকে হিন্দু ও শিখরা যদি মুসলমানদের তাড়িয়ে দেয়, তবে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মৃত্যু ঘটবে।

আজ পাকিস্তান প্রায় অ-মুসলমান শূন্য, শুধু মলমূত্র পরিষ্কার করার জন্য কিছু হিন্দু মেথরদের জোর করে ধরে রেখে দেওয়া হয়েছে সে দেশে। বাংলাদেশেও হিন্দুদের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে। কিন্তু ইসলাম দুই পাকিস্তানেই আজ প্রবলভাবে জীবিত। আর ইসলামী সন্ত্রাসবাদীদের ভয়ে ভারতের প্রতিটি নামী মন্দিরে আজ বন্দুকধারীর পাহারা।

আর আজকের গুজরাটের দাঙ্গা প্রসঙ্গে যারা গাঁধিজীর শরণ নিচ্ছে তারা গোটা হিন্দু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করতে চায়।

গুজরাট

গুজরাট শুধু গাঁধিজীর জন্মস্থান নয়, তা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও জিন্নারও জন্মস্থান। স্বামী দয়ানন্দ ইসলামের কঠোর সমালোচক। জিন্না পাকিস্তানের স্রষ্টা। আগেই বলেছি, ভারতের প্রথম হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাটি ঘটে গুজরাটেই। এই গুজরাটেই অবস্থিত সোমনাথের বিখ্যাত মন্দির—যা লুন্ঠন করেছিলেন গজনীর মাহমুদ। আহমদাবাদ ভারতের অন্যতম প্রধান দাঙ্গাপ্রবণ শহর। দাঙ্গাপ্রবণ শহর গোধরাও। সুতরাং গুজরাটের দাঙ্গার সঙ্গে গাঁধীর নাম উচ্চারণের তাৎপর্য কী?

তাৎপর্য একটাই হতে পারে, মার্ক্স-ইসলাম অক্ষ গাঁধিজীর মতই বলতে চায়, মুসলমানদের ধর্ম হত্যা করা, হিন্দুর ধর্ম নিহত হওয়া। সুতরাং বাছাধন এই তত্ত্ব মেনে নাও।

নবম পর্ব

স্বভূমে উদ্বাস্তু

গুজরাটের উদ্বাস্তু শিবিরগুলি দেখার জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে হুদো হুদো সমাজকর্মী গেছেন। প্রচুর টাকাও রপ্তানী হয়েছে সেখানে। তবে টাকা রপ্তানী করার সময় লক্ষ্য রাখা হয়েছে তা যেন কোনওক্রমেও সঙ্ঘ পরিবারের অনুমোদিত কোনও সেবা প্রতিষ্ঠান যেমন, বাস্তুহারা সেবা সমিতির হাতে না পড়ে। নিত্যপ্রিয় ঘোষ প্রশ্ন রেখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গে তোলা ত্রাণসাহায্য কাদের দেওয়া হবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমেদাবাদে যেতে হয় কেন? সঙ্ঘপরিবারের সদস্যরা যে সব শিবির চালায় তাদের হাতে যেন এই সাহায্য না পড়ে, তার জন্য এই সতর্কতা কেন? সেই শিবিরে আশ্রয়প্রার্থীরা হিন্দু হলেও তারাও কি দাঙ্গা পীড়িত নয়?"

নিত্যপ্রিয় ঘোষের প্রশ্নের একটাই উত্তর—ধর্মেতরবাদীদের নীতি, "বাঁচো এবং হিন্দুদের মরতে দাও।"

ভারতের ধর্মেতরবাদীরা যে হিন্দুদের দুর্দশা-দুরবস্থা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ জম্মুর বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবির, যা বারো বছর ধরে চলছে। ঐসব উদ্বাস্তু শিবিরে কারা থাকেন? কাশ্মিরী পন্ডিতরা।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন দেশ ভাগ হয় তখন ঐ সব কাশ্মিরী পন্ডিতরা থাকতেন কাশ্মীর উপত্যকায়, যদিও তাঁদের সংখ্যা ছিল অল্প, মাত্র ৭ শতাংশ। তাঁরা জাতিতে ব্রাহ্মণ, এবং উপত্যকায় একমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়। অন্য জাতির হিন্দুরা উপত্যকায় বাস করেনা। এঁরা অনেকেই ছিলেন অবস্থাপন্ন, যদিও সবাই নয়। কিন্তু এই স্বল্পসংখ্যক হিন্দুরা মুসলিম মৌলবাদীদের চক্ষুশূল ছিল। গত শতাব্দীর নয়ের দশকে উর্দু পত্রিকা ও মাইক মারফৎ তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়, বুলেট বা দেশত্যাগ, এই দুই এর যে কোনও একটিকে তাদের বেছে নিতে হবে। যদিও কাশ্মীর উপত্যকায় পন্ডিতদের উৎপীড়ন শুরু হয়েছিল ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে হজরত বাল হারিয়ে যাওয়ার পর থেকেই। অভিযোগ উঠেছিন হিন্দুদের উপর—যদিও হিন্দুরা কোনও কালে মসজিদে ঢোকেনা এবং হজরতবাল ফেরত পাওয়া গিয়েছিল মসজিদেরই অন্য ঘরে। মুখে হুমকী দিয়েই বিরত থাকলো না মুসলিম মৌলবাদীরা, তারা নারীদের উপর অত্যাচারও শুরু করলো, ধ্বংস করতে লাগলো মন্দির। ফলে দলে দলে কাশ্মিরী পন্ডিতরা উপত্যকা ছে নেমে আসতে লাগলো জম্মুতে, দিল্লীতে, হরিয়ানায়। এর পরেও যারা ভিটে আঁকড়ে পড়ে ছিল তাদের দেশত্যাগ করতে হলো বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর।

স্টেটসম্যান পত্রিকায় কবিতা সুরী এক নিবন্ধ লিখেছেন (২৮.৭.২০০২)। সেই নিবন্ধে পন্ডিত নিপীড়নের খতিয়ান দেওয়া হয়েছে নিম্নলিখিতভাবে:

* ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে সাড়ে তিন লাখেরও বেশী কাশ্মিরী পন্ডিতকে উপত্যকা ছাড়তে বাধ্য করা হয়।
* কয়েকজন শিখ সমেত ১২০০ কাশ্মিরী পন্ডিতকে অমানুষিক অত্যাচার করে হত্যা করে ইসলামী মৌলবাদীরা।
* উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলিতে সর্দিগর্মি হয়ে ও সাপের কামড় খেয়ে মৃত্যু হয় ৮০০ জন পন্ডিতের।
* দেশত্যাগী ৮০০০ পন্ডিতের মৃত্যু হয় অস্বাস্থ্যকর ও অমানুষিক পরিবেশে থাকার দরুন।

* কাশ্মিরী মুসলমানদের জন্য এক লক্ষ কুড়ি হাজার চাকরীর সৃষ্টি করলেও পন্ডিতদের জন্য কোনও কিছুই করা হয়নি।
* পন্ডিতদের ২৭০০০ হাজার বাড়ী, ব্যবসাস্থল, ক্ষুদ্রশিল্পকেন্দ্র এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
* শুধু শ্রীনগরেই পন্ডিতদের ১৪৩ টি দোকানের মধ্যে ১১০ টি দোকান অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে।
* উমা নগরী মন্দির, কঠেলেশ্বর মন্দির, রঘুনাথ মন্দির ইত্যাদি বিখ্যাত মন্দির সমেত মোট একশো পঁয়তাল্লিশটি মন্দির ইসলামী মৌলবাদীরা ধ্বংস করে দিয়েছে।

কবিতা সুরী নাগ্রোতা, মিশ্রিওয়ালা ও পুরখু উদ্বাস্তু শিবির দেখে এসে সেগুলির করুণ বর্ণনা রেখেছেন স্টেটসম্যানের পাতায়। অত্যন্ত সরু ঘিঞ্জি রাস্তার উপর তৈরী করা ছোট ছোট ঘরে বাস করে এইসব লাঞ্ছিত পরিবারগুলি। ঘরগুলির কোনও জানলাও নেই। জলের ব্যবস্থাও অপর্যাপ্ত—২৫০ জন পিছু একটা টিউবওয়েল। মিশ্রিওয়ালা শিবিরে ৫০০ শিশু বাস করে। কিন্তু তাদের খেলাধূলা করার জন্য কোনও মাঠ নেই। এইসব শিবিরে থেকে লেখাপড়া শেখার পর চাকরী জোটেনা—কারণ চাকরীপ্রার্থীদের ভাল পরিচয়পত্র দেওয়ার মত কেউ নেই। পাহাড়ঘেরা প্রকৃতির অধিবাসী একদা সমৃদ্ধিশালী এই পন্ডিতরা দুরবস্থার মধ্যে থেকে থেকে নানারকম মানসিক রোগের শিকার হচ্ছে। তাদের উর্বরা শক্তিও কমে যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে কাশ্মিরী পন্ডিতরা শুধুমাত্র নৃবিজ্ঞানের পুস্তকের পাতাতেই বেঁচে থাকবে।

পন্ডিতদের নিজস্ব বাসভূমির বাইরে রেখেই কাশ্মীরে নির্বাচন হচ্ছে। যারা দিল্লী, হরিয়ানা ইত্যাদি স্থানে থাকেন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার কোনও সুযোগ নেই। নির্বাচন কমিশন এতে কোনও অন্যায়ও দেখছেনা।

কাশ্মীরের পন্ডিতদের ব্যাপারে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। কেউ তাদের ঘরে ফেরার মত উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলেনা। কেন্দ্রে বিজে পি সরকারও এ ব্যাপারে নীরব। কারণ, ভোটের খাতায় কাশ্মিরী পন্ডিতদের মূল্য নিতান্তই কম। স্বল্পসংখ্যক মানুষদের এই পুঞ্জকে ভুলে গেলেও কিছু যায়-আসেনা। রাজনীতির হাটে নৈতিকতা বলে কোনও পণ্য নেই।

কিন্তু যাঁরা নিজেদের সমাজসেবী বলে জাহির করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে? যেমন মহাশ্বেতা দেবী? তাঁরা কি কোনও রকম যাহায্যের থলি নিয়ে কখনও পন্ডিত শরণার্থীদের শিবিরে গিয়েছিলেন?

ছিঃ হিন্দু ব্রাহ্মণদের নিয়ে কেউ আবার মাথা ঘামায় নাকি! ওসব শিবিরে ধর্মেতরবাদীরা যাবে কোন দুঃখে!

দশম পর্ব

আজকের বাঙলাদেশের কথা

ইসলাম বিশ্বাসীরা কোনওদিন কাফেরদের সঙ্গে বাস করতে চায়না। কারণ, কোরানে স্পষ্টাক্ষরে বলা আছে, "তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে যদি না তোমরা এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন করো।"

মুসলিম-প্রধান বাঙলাদেশের গণমানচিত্রের পরিবর্তনের দিকে একটু নজর দিলেই হৃদয়াঙ্গম হবে এই সত্য বাঙলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত।

অব্দ	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রীষ্টান	অন্যান্য
১৯৪১	৭০.৩	২৮.৩	-	০.১	১.৬
১৯৫১	৭৬.৯	২২.০০	০.৭	০.৩	০.১
১৯৬১	৮০.৪	১৮.৫	০.৭	০.৩	০.১
১৯৭৪	৮৫.৪	১৩.৫	০.৬	০.৩	০.২
১৯৮১	৮৬.৭	১২.১	০.৬	০.৩	০.৩
১৯৯১	৮৮.৩	১০.৫	০.৬	০.৩	০.৩
২০০১		৯.০০			

এই হারে যদি হিন্দুদের সংখ্যা কমে তবে ২০৩১ থেকে ২০৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাঙলাদেশ কার্যতঃ হিন্দুশূন্য হয়ে যাবে। পরিশিষ্ট-২ তে এ সংক্রান্ত কম্পিউটার রেখাচিত্র দেখানো হয়েছে। সংখ্যালঘুদের সংখ্যা কমে যাওয়ার মূল কারণ অবশ্যই দেশত্যাগ। এই দেশত্যাগের কারণ সম্বন্ধে অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, "ধীরে ধীরে কিন্তু নিয়মিতভাবে গোটা জাতিকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে একঘরে করে, নিয়মিতকাল অন্তর পোগ্রম করে।" উল্লেখযোগ্য যে অধ্যাপক চক্রবর্তী সঙ্ঘপরিবারের কেউ নন। তিনি একজন মার্ক্সবাদী।

পোগ্রম শুরু হয়েছিল ১৯৪৬ এ নোয়াখালি থেকে। সেই দাঙ্গায় যত না নিহত হয়েছিল তার থেকে বেশী হয়েছিল ধর্মান্তরকরণ। তারও থেকে ব্যাপক ছিল নারী ধর্ষণ। গোটা জেলায় এবং পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা জেলার কিছু অংশের খুব কম নারীরই সতীত্ব রক্ষা হয়েছিল। ফলে দেশভাগের পর থেকেই হিন্দুরা জন্মভূমি আর বাসযোগ্য নয় বিবেচনা করে দেশত্যাগ করতে থাকে।

উনিশশো সাতচল্লিশের দেশভাগের পর পূর্বপাকিস্থানের রাজধানী হলো ঢাকা শহর। কিন্তু সেখানে সরকার চালানোর জন্য কোনও রকম বাড়ীঘরের ব্যবস্থা ছিলনা। সরকারী

অফিস করার জন্য বেছে বেছে হিন্দুদের বাড়ীগুলিই হুকুম দখল করা হলো। এটা শুধু ঢাকা শহরেরই হলোনা। গ্রাম বাঙলায়ও একই ঘটনা ঘটতে লাগলো। ফলে ভারত অভিমুখে রওনা দিতে আরম্ভ করলো হিন্দুরা।

ঐ সময় পূর্ব পাকিস্থানে চলছিল এক ধরনের অরাজকতা। যদিও সরকারে ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন, কিন্তু পূর্ববঙ্গে ঐ সময় চলছিল তিনটি সরকার--নাজিমুদ্দিন, ন্যাশন্যাল গার্ড ও গুন্ডা। প্রকৃত পক্ষে শেষের দুটি বে-আইনী সরকারের মত মেনেই চলতো সরকারী অফিসাররা। দুই বে-আইনী সরকার হিন্দুদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাদের বিদায় করতেই উৎসাহী ছিল। স্বাধীনতার কিছু পরেই রাজসাহীর পুলিশ সুপার খুরশিদের নেতৃত্বে আক্রমণ হলো রাজশাহীর নাচোল থানার সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজবংশীদের উপর। বীভৎস অত্যাচার লুণ্ঠন ও ধর্ষণ চালানো হলো তাদের উপর।

এর পরে প্রস্তুতি চললো গোটা পূর্ববাঙলা জুড়ে হত্যা, লুণ্ঠন ও নারীধর্ষণ করে হিন্দু বিতাড়নের এক পরিকল্পনার। কাজ শুরু হলো ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ই ফেব্রয়ারী থেকে। ঠিক ছিল সেদিন জুম্মার নামাজের পর থেকে জেহাদ শুরু হবে। ঢাকা সেক্রেটারিয়েট থেকে দলে দলে লোক ভারত বিরোধী হিন্দু বিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে নেমে আসে রাস্তায় এবং হিন্দু দেখলেই খুন করতে থাকে। পূর্ব-পাকিস্থানের তৎকালীন এম এল এ হারান চন্দ্র চৌধুরী দেখলেন ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে এক কমার্শিয়াল স্কুলের ম্যানেজারকে কাঠ কাটার মত কুড়ুল দিয়ে কেটে ফেলা হলো। ঘটনা শুধু ঢাকাতেই আবদ্ধ রইলো না। তা ছড়িয়ে পড়লো গ্রামে।

তবে ১৯৫০ এর সবচেয়ে ভয়াবহ হত্যাকান্ড ঘটানো হয়েছিল ভৈরব ব্রিজের উপর। ময়মনসিংহে জেলার মেঘনা নদীর উপর এই বিশাল রেলপুলকে সেদিন বধ্যভূমি হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। ঘাতকেরা রাতের অন্ধকারে অস্ত্রহাতে দাঁড়িয়ে ছিল ব্রিজের উপর। সেখানে প্রতিটি ট্রেন থামিয়ে যাত্রীদের তল্লাসী করা হচ্ছিল। হিন্দু হলে মেরে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছিল মেঘনার জলে।

এই ধরনের একের পর এক বীভৎস দাঙ্গার ফলে দলে দলে মানুষ চলে আসতে লাগলো পূর্ববাঙলা থেকে। দুটি বড় দাঙ্গা হয় ১৯৬২ ও ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। এর মধ্যে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের দাঙ্গার উপলক্ষ্য কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ থেকে মুহাম্মদের পবিত্র কেশগুচ্ছ অপসারণ। বলা বাহুল্য অপসারণ করেছিল মসজিদেরই কেউ। পরে সে কেশগুচ্ছ ফেরত পাওয়া যায়। ঐ দাঙ্গার দশ হাজারের মত হিন্দুর প্রাণ যায়। ২৩ শে জানুয়ারীর টাইমস (লন্ডন) পত্রিকা লেখে প্রথম দিনের দাঙ্গাতেই হাজার জনের মৃত্যু ঘটে। ওয়াশিংটন পোষ্ট লেখে বিদেশী এবং মুসলমান যারা হিন্দুদের আশ্রয় দিয়েছিল তাদেরও হত্যা করা হয়। এর পরে একাত্তরের বাঙলাদেশ যুদ্ধ ও পূর্ব পাকিস্তানের অবসান। মুজিবের সরকার ধর্মনিরপেক্ষ হলেও ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মুজিবকে হত্যা করা হয় এবং ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধান সংশোধন করে ইসলামকে আবার রাষ্ট্রধর্ম করা হয় বাঙলাদেশের। ফলে আবার শুরু হয় হিন্দু দলন, হিন্দু হত্যা, হিন্দু নারী ধর্ষণ। ক্রমাগত তা

চলছেই। ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের পোগ্রমের কথা লিখেছেন তসলিমা নাসরিণ তাঁর *লজ্জা*উপন্যাসে। সে জন্য তিনি চক্ষুশূল হয়েছিলেন এদেশের মার্ক্স-ইসলাম অক্ষের।

আমাদের আলোচ্য ২০০১ খ্রীষ্টাব্দের পোগ্রম, যা ঐ বছরের সাধারণ নির্বাচনের পর থেকেই শুরু হয়। পয়লা অক্টোবর বেগম খালিদা জিয়া শাসনভার নেওয়ার পর থেকেই শুরু হয় হিন্দুদের উপর অত্যাচার। এবারের অত্যাচার মূলতঃ নারী ধর্ষণেই কেন্দ্রীভূত। নথীকৃত ধর্ষিতা নারীর সংখ্যাই হাজার ছাড়িয়েছে। বাঙলাদেশের কিছু কিছু বুদ্ধিজীবি এ ব্যাপারে প্রতিবাদে মুখর। এঁদের মধ্যে একজন হলেন সালাম আজাদ। সালাম আজাদ কলকাতায় এসেছিলেন এ বছরের ফেব্রুয়ারীতে। ৯ ই ফেব্রুয়ারী তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন বেগম জিয়ার চার পার্টি জোটের আমলে হিন্দুদের নির্মূল করার কাজ সুনিপুণভাবে চলছে। এখন হিন্দুদের কাছে তিনটি পথ খোলা আছে: দেশত্যাগ করা, ইসলামায়িত হওয়া বা আত্মহত্যা করা।

বাঙলাদেশের হিন্দুদের শোচনীয় অবস্থার এক ছবি সালাম আজাদ এঁকেছেন *এথনিক ক্লিনসিং* পুস্তকে। আমরা সেই পুস্তক থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দেব। তাতেই পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধ হবে। আমাদের কিছু কিছু বন্ধুবান্ধব বলেন, পাকিস্থানে বা বাঙলাদেশে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা আমাদের দেখার প্রয়োজন নেই। আমাদের ধর্মেতরবাদী দেশে মানুষদের ধর্মেতরবাদী হতে হবে। এই সব অমানুষেরা মনে করেন মানুষের মনটা কামরাবদ্ধ। ভারতের মানুষদের মনটা এক কামরায় থাকে, বাঙলাদেশের মানুষদের মনটা অন্য কামরায় থাকে—দুটি মনের সঙ্গে সংযোগ থাকা উচিত নয়। বাঙলাদেশের মানুষদের দুর্দশায় আমাদের মনঃপীড়ার কোনও কারণ নেই। সেখানে যেসব ইসলামী মৌলবাদীরা হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার করেছে এবং করছে তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হওয়াও ঠিক নয়। সব কিছু ভুলে থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। বরঞ্চ ইস্রায়েলে কি হচ্ছে দেখা যাক: সেখানে ফিলিস্তাইনী আত্মঘাতী বাহিনী কি রকম আঘাত হানছে সেই সব নিয়ে মাথা ঘামানো যাক। চিন্তা করা যাক তারা কেন আত্মঘাতী হচ্ছে তা নিয়ে। তাতে মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের বিস্তার ঘটবে।

কিন্তু আজকের দুরসঞ্চারের যুগে গোটা পৃথিবীই এক হয়ে গেছে। কেউ আর পৃথক পৃথক কামরায় বদ্ধ নয়। পাকিস্তানের বা বাঙলাদেশের ঘটনা ভারতীয় মনে প্রতিফলিত হবেই—তারা আমাদেরই আত্মীয়!

দেখা যাক আমাদের সেইসব আত্মীয়দের অবস্থা, সালাম আজাদের কলমে:

"আমরা যে গ্রামটিতে যেতে চাই তার নাম অন্নদাপ্রসাদ। লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নেরই একটি গ্রাম। কেউ কোনও কথা বললো না। গ্রামে ঢুকতে গিয়ে তারা বাধা পায়। পুলিশ তাদের থামায়। পরিচয় জানতে চায়। বারী তার প্রেস কার্ড বের করে দেখালে পুলিশের হাবিলদার খানিকটা কপট বিনয়ের স্বরে বলে মটরসাইকেল তাদের ক্যাম্পে রেখে হেঁটে যেতে। প্রয়োজনে তাদের কেউ সঙ্গে যাবে। এসব নিরাপত্তার দিকে ইঙ্গিত করে বলে। বারী জানিয়ে দেয় মটর সাইকেল থাকতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের কারও যাওয়ার প্রয়োজন

নেই।

"অন্নদাপ্রসাদ গ্রামে প্রায় বারশো হিন্দু বাড়ী। নির্বাচনের পরের দিন এই বাড়ীগুলোতে হামলা করে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা। সারাদিন বিজয় মিছিল, মিষ্টি খাওয়া, রং ছিটানো সেরে রাতে এই বাড়ীগুলোতে হামলা করে তারা। হামলা হতে পারে তা ওদের গতিবিধি দেখে আগেই অনুমান করতে পেরেছিল গ্রামের হিন্দু পরিবারগুলো। বাড়ীর মেয়েদের এই গ্রামে 'ভেন্ডার বাড়ী' বলে পরিচিত সেখানে পাঠিয়ে দেয়। এই বাড়ীটিই তারা সবচেয়ে নিরাপদ মনে করেছে। বাড়ীর মালিক হিন্দু হলেও হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবাই তাঁকে সম্মান করে। হামলাকারীরা গ্রামের চারশো বাড়ী লুট করে হামলা চালায় ভেন্ডার বাড়ীতে। রাতের প্রথম প্রহরে চারটি দলে বিভক্ত হয়ে পুরো গ্রামের চারশো হিন্দু বাড়ী তচনছ করে। লুটের পর কোনও কোনও বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই গ্রামের অধিকাংশ হিন্দু পরিবার আর্থিক দিক দিয়ে সম্পন্ন। লুটের মাল ভাগাভাগি করে নিজের বাড়ীতে রেখে রাত দ্বিপ্রহরে আক্রমণ করে ভেন্ডার বাড়ী। দশটি দল এক সঙ্গে আক্রমণ করে এই বাড়ী। এই বাড়ীতে বিভিন্ন বয়সের পঞ্চাশজন নারী আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের অনেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী ধান ক্ষেতের পানিতে। কিন্তু সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েও সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারেনি তারা। তাদের বাচ্চাদের, শিশুদের পানিতে ছুঁড়ে ফেলার হুমকী দিয়ে পানি থেকে মায়েদের উঠে আসতে বাধ্য করে। এই বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়া কোনও নারীই নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারেনি। রাতভর তাদের উপর চলেছে পাশবিক নির্যাতন। আটবছরের শিশু থেকে পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধা কেউ রক্ষা পায়নি। সম্ভ্রম হারানোর ভয়ে পারুলবালা সাহা জলাময় ধানক্ষেতে ঝাঁপিয়ে পড়লে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আটত্রিশটি জোঁক কামড়ে ধরে। সেই অবস্থাতেও তিনি নাক উঁচু করে বসে ছিলেন। তারপরেও তাঁর সম্ভ্রম রক্ষা হয়নি। যাদেরকে তিনি ছোট ভাইয়ের মত দেখে এসেছেন সেই মিজান ও আর সেলিম পারুলবালাকে পানি থেকে তুলে সম্ভ্রম লুট করে।

"বার বছর আগে পুকুরে পানি আনতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল শেফালী দাস। গ্রামের ডাক্তারের ভুল চিকিৎসার কারণে পায়ে পচন ধরে কিছুদিনের মধ্যেই। দুই সন্তানের জননী শেফালীর বাম পা হাঁটুর ওপর থেকে কেটে ফেলতে হয়েছিল। সেই থেকেই সে পঙ্গু। বার বছর ধরে এক পা নিয়েই চলেছে তার জীবন। সংসার, স্বামী সন্তান। সন্ত্রাসীদের একটি দল যখন নির্বাচনের পরদিন রাতে গ্রাম আক্রমণ করে তখন অনেকের সঙ্গে সে হাঁটুপানি ভেঙ্গে আশ্রয়ের সন্ধানে পালাতে চেয়েছিল। কিন্তু পানিতে নামতে গিয়ে বাম হাতে ধরা ক্রাচটি কাদায় পিছলে গেলে সে পড়ে যায়। ক্রাচটিও তখন হাত থেকে ছুটে পানিতে ভাসতে থাকে। শেফালী অসহায় ভাবে জল কাদার মধ্যে বসে ক্রাচটির দিকে তাকিয়ে থাকে। এই ক্রাচ ছাড়া তার জীবন প্রায় অচল। বার বছর ধরে যে ক্রাচ বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাকে সাহায্য করেছে আজ চরম বিপদের দিনে সেটা হাত থেকে ছুটে গেল। ক্রাচটি ধরতে ব্যর্থ হয়ে সে দুই হাতে এক পায়ের সাহায্যে জলকাদা থেকে উঠে পাশের হলুদ ক্ষেতে লুকিয়ে রাখে নিজেকে। এই হলুদ ক্ষেত থেকেই আধো আলো আধো অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছিল তার কুড়ি বছরের সংসার

লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। ষোল বছর বয়সে সে এই সংসারে আসে। বিয়ের তিন বছরের মাথায় তার শাশুড়ি পরলোকে চলে যান। এরপর থেকে সে সংসারটি গড়ে তুলেছে। কিন্তু ঠাকুর ঘরে ঢুকে সন্ত্রাসীরা যখন প্রতিমা ভাংচুর করছিল। তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। সে চিৎকার করে ওঠে। প্রতিমা ভাঙতে দেখে এই ধর্মভীরু নারী সহ্য করতে পারেনি।

"তার চিৎকারের শব্দে এগিয়ে আসে সন্ত্রাসীরা। শেফালীকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় পাশের গাবগাছের তলায়। সেখানে লুটের মালামাল জমিয়েছিল সন্ত্রাসীরা। এখানেই পর্যায়ক্রমে তারা শেফালীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

(এই ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে বাঙলাদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে এবং আগরতলা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় (১৬.১১.২০০১)। ধর্ষণকারীদের মধ্যে ছিল এক শিক্ষক ও তার দুই পুত্র। শিক্ষক পিতা দুই পুত্র সহযোগে হিন্দু মেয়েদের ধর্ষণ করেছেন)

আর এক গ্রামের ঘটনা শোনা যাক সালাম আজাদের কলমে:

"অক্টোবরের দুই তারিখে নির্বাচনের পরদিন রাতে কি ঘটেছিল সে ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে চরকুমারী গ্রামের মধ্যবয়সী নেপাল রায়। গ্রামের তেলী বাড়ীতে বসে সে ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিল রাহুলদের। ফরিদ খলিফা এই গ্রামে ধার্মিক মানুষ হিসাবে পরিচিত। সে এসে জানায়, বাড়িতে হামলা হতে পারে। হামলাকারীরা বাড়ীর জিনিষপত্র নিয়ে গেলে তা ফের পাবে, নতুন করে কিনতে পারবে। কিন্তু বাড়ীর আওরাতদের ওপর হামলা হলে তা আর ফিরে পাবেনা। নেপাল রায়রা আপদে বিপদে ফরিদ খলিফার কাছে ছুটে গেছে সব সময়। তাকে মুরুব্বি হিসাবে মান্য করে। তিনিই যখন নিজে এসে হামলার কথা বলছেন, তা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই।

নেপাল জিজ্ঞাসা করে, তাহলে আমরা কি করবো?

ফরিদ জবাব দেয়, বাড়ীর আওরতদের দূরে কোনও আত্মীয়র বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

নেপাল, কিন্তু এখন তো সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আপনার দলতো ইলেকশনে জিতেছে আপনি ওদের বলে আমাদের রক্ষা করুন।

ফরিদ কিছুটা রেগে গিয়ে বলে, যারা হামলা করবে তাদের তো আমি চিনি না। শুনেছি হামলা হতে পারে। একটা কাজ করতে পার, আজকের রাতটা বাড়ীর আওরতদের আমার বাংলাঘরে পাঠিয়ে দিতে পার।

"নেপাল সরল বিশ্বাসে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যায়। ফরিদ খলিফা আজকের রাতটা বাড়ীর ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন নারীকে তার বাড়ীতে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে যে উপকারটা করলেন তা সে সারা জীবন মনে রাখবে। রাত পোহালেই দূরের কোনও আত্মীয়ের বাড়ী পাঠিয়ে দেবে স্ত্রী কন্যা ও বিধবা বোনকে। অন্যান্য শরিকরাও তাই স্থির করে। ফরিদ খলিফা বলে গেছে এশার নামাজের পর বাড়ীর আওরাতদের তার বাড়ীর নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে। নেপালও তাই করে। ফরিদ খলিফার বাংলাঘরে ত্রিশ পঁয়ত্রিশজন বিভিন্ন বয়সের নারীর কেউ ঘুমিয়েছে, কেউ অন্ধকারে উপরের দিকে তাকিয়ে বাড়ীর কথা, ঘরের কথা ভাবছে।

এ সময় ফরিদ খলিফা এসে ডাক দেয়। প্রথম ডাকে কেউ জবাব দেয়না। তৃতীয় বার দরজায় ধাক্কা মেরে যখন ডাক দেয় তখন একজন দরজা খুলে দেয়, যে দরজা খুলে দেয় সে নেপালের কন্যা। এবার ক্লাস নাইনে পড়ছে। ফরিদ মেয়েটির মুখে লাইট মারে। তারপর পুরো শরীরে। এরপর পুরো ঘরে। তড়িৎগতিতে টর্চলাইট দরজার বাইরের দিকে ঘুরিয়ে কাদের যেন ভিতরে আহ্বান করে। একদল নরপশু হুড়মুড় করে ঘরে ঢোকে। ফরিদ নেপাল রায়ের মেয়ের হাত ধরে রেখেছে এক হাতে। সবার ভেতরে ঢোকা হয়ে গেলে অপর হাতে দরজা বন্ধ করে দেয়। এরপর একজনকে হারিকেন জ্বালতে বলে। সবার উদ্দেশ্যে একটি চকচকে ধারালো ছুরি দেখিয়ে জানিয়ে দেয় কেউ চিৎকার করলে এই ছুরি গলায় বসে যাবে। তারপর নেপাল রায়ের মেয়েকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ঘরের কোনে অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি জায়গায়। রাত বারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশজন নরপশু এই নারীদের শরীর খুবলে খায়। নেপাল রায়ের মেয়েটি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে তখন ফরিদ ডাকে নেপালের স্ত্রীকে। রক্তাক্ত কন্যাকে দৌড়ে গিয়ে বুকে তুলে নিতে যাচ্ছিল সবিতা। কিন্তু ফরিদ এক ঝটকায় সেখান থেকে সরিয়ে আনে সবিতাকে। বিবস্ত্র করে মেয়ের পাশে ধাক্কা মেরে শুইয়ে দেয় সবিতাকে। আর বলতে পারেনা নেপাল রায়, অজ্ঞান হয়ে যায়।”

এরকম সব সত্য ঘটনায় পরিপূর্ণ সালাম আজাদের *এথনিক ক্লিনসিং*। ভারতের কোটি কোটি হিন্দুর মত বাঙলাদেশের নেপাল রায়দের জানা নেই যে বিধর্মীর স্ত্রী-কন্যা ধার্মিক মুসলমানদের কাছে *গনিমতের মাল*—সৌভাগ্যের সম্পদ। তাদের ভোগ করা ধর্মের বিধান।

ফরিদ খলিফার বিবেক অত্যন্ত পরিষ্কার এ ব্যাপারে। নেপালের স্ত্রী-কন্যাকে ধর্ষণ করে সে কোনও অন্যায় করেনি।

একাদশ পর্ব

উত্তরকথা

গোধরা অগ্নিসংযোগের জন্য প্রাথমিকভাবে কিছু ইসলামী মৌলবাদী দায়ী হলেও এর মূল আসামী ভারতের ধর্মেতরবাদী সম্প্রদায়, যারা সন্দেহাতীতভাবে হিন্দু, পার্সী ও খ্রীষ্টান উৎসজাত। হিন্দু উৎসজাত ধর্মেতরবাদীরা নিজেদের হিন্দু উৎস অস্বীকার করার প্রয়াসেই ইসলামী সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ। আবার যারা মার্ক্সীয় মতবাদে বিশ্বাসী তারা মার্ক্সবাদের প্রসারের জন্য হিন্দুধর্মের বিনাশের পক্ষপাতী। তারা আবার দুরাশা করে যে মুসলমানদের সহজেই সাম্যবাদে দীক্ষিত করা যাবে, কারণ দেশত্যাগী মুসলিমদের নিয়েই মস্কোতে প্রথম ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল। যদিও বাস্তব ঘটনা হচ্ছে ইসলামের সঙ্গে কমিউনিজমের সম্পর্ক আড়াআড়ি। ইসলামী রাষ্ট্রে সবচেয়ে আগে হত্যা করা হয় কমিউনিষ্টদের। পাকিস্তানে বা বাঙলাদেশের রাজনীতিতে কমিউনিষ্টদের কোনও স্থান নেই।

এই ইসলাম-ধর্মেতরবাদী অক্ষের পরোক্ষ প্ররোচনাই ভারতের যাবতীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য দায়ী। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণে রাখতে হবে ১৯৪৬ এর কলকাতার বীভৎস দাঙ্গার সময় কমিউনিস্ট পার্টি মুসলিম লীগের দাবীর সমর্থক ছিল।

বিপরীতে, স্বাধীনতার পূর্ব হতেই যে কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় দায়ীত্বটা কোনও রকম তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের উপর চাপানো হতো। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণের জন্য অমলেশ ত্রিপাঠীর *স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস* পুস্তকটি দেখা যেতে পারে। সেখানে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিত গড় মুক্তেশ্বরের দাঙ্গার দায়টা বিনা প্রমাণেই সঙ্ঘের উপর চাপিয়েছেন দায়িত্বশীল ঐতিহাসিক। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের কাথিয়াবাড়ের দাঙ্গার দায়িত্বটাও অবলীলাক্রমে চাপানো হয়েছিল সঙ্ঘের উপর--সঙ্ঘ অস্বীকার করা সত্ত্বেও। এখনও, আদালতের রায়কে অস্বীকার করে গাঁধী হত্যার দায়টা চট করে চাপানো হয় সঙ্ঘের উপর।

ইসলাম ধর্মেতরবাদী অক্ষ গাঁধিজীর মতই মনে করে মুসলমানদের প্রতিটি জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। তাদের হানি হওয়া একেবারে অনুচিত। সন্দেহ নেই এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটি প্রাণই মূল্যবান। কিন্তু, এই ধর্মেতরবাদীরা গোধরা স্টেশনে করসেবকপূর্ণ ট্রেন কামরা ধ্বংস করা সামান্য আইন-শৃঙ্খলা ঘটিত ব্যাপার বলে দেখতেই ইচ্ছুক। মসজিদ থেকে প্ররোচনা দিয়ে হত্যাকান্ড ঘটানোর ব্যাপারটা তাঁরা উল্লেখই করছেন না। উপরন্তু নানা অপলাপের দ্বারা করসেবকদেরই দায়ী করছেন তাদের হত্যাকান্ডের জন্য।

কিন্তু তাদের চোখে গোধরা হত্যাকান্ড নিছক আইন-শৃঙ্খলা ঘটিত ব্যাপার হলেও পরবর্তী দাঙ্গা পূর্ব-পরিকল্পিত। কারণ হত্যাকারীদের হাতে নাকি মুসলমানদের নাম-ধাম লেখা তালিকা পাওয়া গেছে। কিন্তু এটা যে নতুন কিছু নয়, দাঙ্গাকারীদের কাছে সবসময় লক্ষবস্তু থাকে, দাঙ্গাকারীরা নিজেদের ঘরে আগুন লাগায় না, এটা তাদের কে বোঝাবে। তারা নানা রকম গুজব ছড়িয়েই গেছেন। গুজবের সূত্র, দাঙ্গার সময় যা হয়, চক্রাকারে আবর্তিত হয়েছে। রাম বলছে ঘটনাটা শ্যামের কাছে শুনেছে; শ্যাম বলছে যদুর কাছে শুনেছে; যদু বলছে মধুর কাছে শুনেছে; আবার মধু বলছে রামের কাছে শুনেছে। গুজব প্রচারে সংবাদ মাধ্যম ছাড়াও

ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের বুদ্ধিজীবিরা নানারকম গুজবের ভিত্তিতে প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ লিখেছেন তাদের হিন্দুবিরোধী মানসিকতার দ্বারা চালিত হয়ে।

পাকিস্তানে, বাঙলাদেশে এবং স্বদেশে সাম্প্রদায়িকভাবে হিন্দু নিধন চলবে, আর ভারতীয় সংবিধানে বিশ্বাসী হিন্দুরা সব কিছু আইন আদালত ও পুলিশের উপর ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে এটা শুনতে ভাল লাগলেও অসম্ভব চিন্তা।

গুজব দাঙ্গার অবশ্যম্ভাবী বিকিরণফল। অল্পবয়সে দাঙ্গার খবর জানার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করতাম। তখন গুজব ব্যাপারটা ততো বুঝতাম না। কলকাতা থেকে কেউ এলেই শুধাতাম, কলকাতার অবস্থা কেমন?

পাড়ার এক রসিক দাদা ছিলেন। তিনি তখন বেলগাছিয়ায় পশুচিকিৎসা পড়তেন। একদিন বেহালায় ট্রাম থেকে নামার পরই তাঁকে শুধালাম কলকাতার কথা। তিনি বললেন, ওরে বাবা! মাঝেরহাট ব্রিজের উপর দেখলাম একজনকে ছোরা মেরে পেট চিরে দিলে। তার নাড়ি ভুঁড়ি বেরিয়ে রাস্তায় পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে নাড়িভুড়িগুলি কুড়িয়ে পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে ছুট দিল।

আজকে রসিক দাদার গল্পই সংবাদ হিসাবে পরিবেশিত হচ্ছে সংবাদপত্রে, নিউজ চ্যানেলে। অনেক সময় অভিনেতাদের দিয়ে সুটিং করে। তার ভিত্তিতে হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার করে চলেছেন বুদ্ধিজীবিরা। নরেন্দ্র মোদীর নাম হয়েছে নিউটন মোদী।

তার পরিণাম? অক্ষরধাম মন্দির আক্রমণ। যদিও হিন্দুরা ঘটনাটাকে ইসলামী সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ বলেই ধরে নিয়েছে—যে রকম সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ কাশ্মীরে চলছে অবিরাম। ফলে পাল্টা দাঙ্গা হয়নি এরপর। কিন্তু এর থেকে স্পষ্ট ইসলাম ধর্মেতরবাদী অক্ষ পরোক্ষে সন্ত্রাসবাদীদের নৈতিক সমর্থন জোগাচ্ছে।

মার্ক্স-ইসলাম অক্ষের মুখপত্র *ফ্রন্টলাইনে* ডায়োন বুনশা লিখেছেন, বিজে পির ভূমিকাকে অস্বীকার করার জন্য (ঘটনার পরে) আদবানি সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন (সন্ত্রাসবাদীদের)আক্রমণে প্ররোচিত করার জন্য।"

অর্থাৎ বক্তব্য হচ্ছে গোধরা হত্যাকান্ড করে কেউ হিন্দুদের প্ররোচিত করেনি। কিন্তু হিন্দুরা দাঙ্গা করার জন্য ইসলামী মৌলবাদীরা প্ররোচিত হয়েছে; ফলে অক্ষরধাম হত্যাকান্ড ঘটেছে। সেই রাগী বাবার তত্ত্ব! সুতরাং ইসলামী মৌলবাদীরা হিন্দুদের পুড়িয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিলেও হিন্দুদের রামধুন গাইতে হবে। তাহলে সন্ত্রাসবাদীরা আর কিছু বলবে না।

বুদ্ধিজীবিদের এ হেন উচ্চারণ অবশ্যই পুরস্কৃত হচ্ছে। কোলকাতার *মী-যান* পত্রিকার ২৫ শে আগস্টের সংবাদ, পাকিস্তানের বিগত স্বাধীনতা দিবসে অরুন্ধতী রায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন সম্মানিত অতিথি হিসাবে। সেখানে তিনি বলেছেন, দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরাতে ভারত সরকার কাশ্মীর নিয়ে বাজার গরম করছে।

বিখ্যাত আবৃত্তিকার পার্থ ঘোষ এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "আমার আকাশবাণীর কর্মজীবনে ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মচারীদের বিশ্বকর্মা পূজা করা নিয়ে মামলা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। হাইকোর্টের নির্দেশে বিশ্বকর্মা পূজা বন্ধ করা হয়েছিল। ভারতে মুসলমানেরও

তার ধর্ম পালনের অধিকার আছে। তারা চারটে পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে। এমনও শুনেছি, তিনটের বেশী সন্তান হলে তা পালন করার জন্য আরব দেশ থেকে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ার পেছনে এই আর্থিক অনুদান একটা কারণ। একটা অখন্ড ভারতের পরিকল্পনার কথাও শোনা যাচ্ছে। তবে সেটা হবে ইসলামিক ভারত ।''

অতঃ কিম?

পরিশিষ্ট-১

নিত্যপ্রিয় ঘোষের প্রবন্ধ

সব ঝুট হ্যায়

আহমেদাবাদের এক প্রাসাদের কথা ভেবে লেখা 'ক্ষুদিত পাষাণ'- এর পাগল মেহের আলি দৌড়ে বেড়াত, মুখে তার একটি কথা—তফাত যাও, তফাত যাও, সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হত , ক্যা ঝুট হ্যায় রে ? প্রশ্নের উত্তরে সেই একই চিৎকার, সব ঝুট হ্যায়। ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত গুজরাতে কী ঘটছে, তার এমন সব বিশ্লেষণ পাচ্ছি আমরা, তাতে দিশেহারা হয়ে যেতে হ্যায়। মনে হয়, আমাদের অবস্থাও পাগল মেহের আলির মতো হবে ।

গুজরাতে কী হচ্ছে, তার বেসরকারি ভাষ্যে না গিয়ে আমরা সরকারি ভাষ্যে যাচ্ছি , কেননা সরকারের সত্য কথা বলার দায়িত্ব আছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, যার বর্তমান সভাপতি কংগ্রেসের প্রণব মুখোপাধ্যায়, ১৬ এপ্রিল লোকসভায় দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিষয়ে যে প্রতিবেদন দাখিল হয়েছে, সেই সময় পর্যন্ত গুজরাতে দাঙ্গায় নিহত ৭৬০, গৃহহীন ৯৮,০০০ ।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন, মহিলা কমিশন, নানা জাতের এনজিও, এমনকী বিদেশি দূতাবাসের মিশনগুলি পর্যন্ত এক বাক্যে রায় দিয়েছে , গুজরাতের রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ দাঙ্গা থামাতে। আশ্রয়শিবিরে সাক্ষাৎকারের সময় নিষ্ঠুরতার যে সব বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তার পাশবিকতা অকথ্য, যেমন অকথ্য যে কোনও দাঙ্গার পাশবিকতা, সংখ্যার নিরিখে নগণ্য বা বৃহৎ যা-ই হোক ।

কিন্তু গোয়ায় ভারতীয় জনতা পার্টির সম্মেলনে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রি নরেন্দ্র মোদি পদত্যাগ করতে চাইলেও, দল তাঁকে পদত্যাগ করতে দেয়নি। স্পষ্টতই ভাজপা মনে করে, দাঙ্গার কারণ নরেন্দ্র মোদি নন, দাঙ্গা দমনে অপারগও নন তিনি।

কোনটা সত্য ? এটা কি মিথ্যা, ২৭ ফেব্রুয়ারি গোধরায় ট্রেনে ৫৮ করসেবককে পুড়িয়ে মারার পর, ২৮ ফেব্রুয়ারি গুজরাত বন্ধ ভাজপা সমর্থন করায় দাঙ্গাবাজরা প্রশ্রয় পায়? এটা কি মিথ্যে, পুলিশ কন্ট্রোল রুমে রাজ্যের কোনও কোনও মন্ত্রী পুলিশকে বিচার বিবেচনায় বাধা দিয়েছেন, দাঙ্গার সময় বিধান সভায় কোনও কোনও সদস্যকে দেখা গেছে; যেমন দেখা গেছে ভাজপার সরপঞ্চদের, দাঙ্গাবাজদের উৎসাহ দিতে ? এটা কি সত্য, দাঙ্গা চলাকালীন ৫৩ জন আই এ এস অফিসারের বদলি হয়েছে, দাঙ্গা দমনে দৃঢ় পুলিশ অফিসারদের বদলি করা হয়েছে —এই বদলি কি নিতান্তই রুটিন ট্রান্সফার ? এটা কি সত্য নয়, পরিকল্পনা করে মুসলমানদের দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, হোটেল, সিনেমা হল ধ্বংস করা হয়েছে, মসজিদ দরগা-কবরখানা আক্রমণ তো আছেই? বিক্ষিপ্ত খুনখারাপি বন্ধ করা যায় না, সত্য কিন্তু পরিকল্পনামাফিক হাজার হাজার জনতার আক্রমণ ঠেকানো যাবেনা কেন ? উত্তরে, নরেন্দ্র

মোদি জানিয়েছেন, গোধারায় পাশবিক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া তো হবেই। যে কোনও ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হয়, এটা নিউটনের থার্ড ল নয়, তিনি নিউটন মোদি বলা অব্যাহত এখনও। দাঙ্গা লাগলে মিলিটারি নামানোর জন্য চিল-চিৎকার শুরু হয়েছিল, বলা হচ্ছিল উদ্দেশ্যমূলক ভাবে মিলিটারি ডাকতে গড়িমসি করা হচ্ছে, অথচ দাঙ্গা লাগলে (২৮ ফেব্রুয়ারি) ১৬ ঘন্টার মধ্যে নামানো হয়েছিল মিলিটারি। এত দ্রুত মিলিটারি নামেনি ১৯৮৪ তে দিল্লীতে শিখ নিধনের সময়, ১৯৯৩-এ মুম্বাইতে দাঙ্গার সময়, যদিও ওই দুই দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। তাঁর রাজ্যের পুলিশ যদি নিষ্ক্রিয়ই থাকবে তা হলে পুলিশের গুলিতে ১৬০ দাঙ্গাবাজ মারা যায় কী করে? আশ্রয় শিবিরে ৯৮,০০০ শরণার্থী আছেন সত্য, তবে এক সময়ে ১,৩০,০০০ ছিলেন, ৩২,০০০ ফিরে গেছেন।

এ কথা সত্য, মিলিটারি থাকা সত্ত্বেও দু মাস ধরে গুজরাতে দাঙ্গা অব্যাহত। স্পষ্টতই, মিলিটারি সর্বরোগহর নয়। প্রথম তিনদিন পুলিশ লক্ষণীয়ভাবে সক্রিয় না হলেও, তার পর আর কর্তব্যে গাফিলতি দেখায়নি বলে মনে হয়। প্রথম তিনদিনের দাঙ্গায় পুলিশের কাছে যত এফ আই আর জমা পড়েছে, সে সব গুনলে, শোনা গেল, দাঙ্গাবাজদের সংখ্যা ১২ লক্ষ। যাঁরা এই তথ্য দিচ্ছেন, তাঁদের বক্তব্য পরিষ্কার। গুজরাতের দাঙ্গা মামুলি গুণ্ডাদের দাঙ্গা নয়, এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় মত্ততা। দাঙ্গার কারণ, শুধুই গোধরা নয়, গত পঞ্চাশ বছরে গড়ে ওঠা সাম্প্রদায়িক সন্দেহ ও বিদ্বেষ। এটা পুলিশ বা মিলিটারি দিয়ে উন্মূল করা যাবেনা। যে দাঙ্গায় সচ্ছল মধ্যবিত্তরা লুঠতরাজে অংশ নেয়, সেই দাঙ্গা পেট-ভরে খাইয়ে, মদের বোতল সরবরাহ করে, দৈনিক চারশো টাকা বরাদ্দ করে দলিত বেকারদের দিয়ে করানো দাঙ্গা নয়। যে দাঙ্গাকে উসকে দেয় নানা রকম মুদ্রিত প্যামফ্লেট, সেই সব প্যামফ্লেট ছড়াচ্ছে কে ? আই এস আই, না কংগ্রেস, না স্বয়ং ভাজপা? দাঙ্গা চলাতে কার সুবিধা হচ্ছে ?

এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। তদন্ত কমিশন বসান হয়েছে। কিন্তু সেখানেও সন্দেহ। সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান কোনও বিচারপতিকে দিয়ে নয় কেন? অবসর প্রাপ্ত বিচারপতির সিদ্ধান্ত কি নিঃস্বার্থ হবে? মানবাধিকার কমিশন বা সংখ্যালঘু কমিশনের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের অবশ্য নিঃস্বার্থই ভাবা হয়।

যাঁরা গুজরাতের পুলিশের বা ম্যাজিস্ট্রেটের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন তাঁদের জবাব দিতে হবে, ভারতের কোন রাজ্যই ন্যাশনাল পুলিশ কমিশনের রিপোর্ট কাজে পরিণত করা হয়নি কেন? ইন্দিরা গাঁধীর 'দায়বদ্ধ আমলাতন্ত্র' দর্শনের পর সর্বভারতীয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আর পুলিশের মধ্যে যে রাজনৈতিক প্রভুদের আজ্ঞাবহ হওয়ার পরিণতি হয়েছে; ওই রিপোর্ট কাজে পরিণত করলে পুলিশ আর ম্যাজিস্ট্রেটরা আবার স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। যে কোন রাজ্যে নতুন দল ক্ষমতায় ঢালাও ভাবে আমলাদের চালাচালি করে, আবার বেকায়দায় পড়লে নিষ্ক্রিয় আমলাকে দোহাই পাড়ে।

সাহেবদের ভাষায়, দিব্যি win-win situation, দিশি ভাষায়, গাছেরও খাব তলারও কুড়াব। আমলাতন্ত্রকে নিজের সুবিধায় কাজে লাগাব, কিন্তু আমলাদের অপদার্থতার

দায় নেবনা। পুলিশের বা ম্যাজিস্ট্রেটের অপদার্থতার দায় নরেন্দ্র মোদির ওপর বর্তাত না যদি তিনি দৃশ্যত সেই সব অপদার্থদের শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। তাঁর সব চাইতে বড় শত্রু পাকিস্তান নয়, আই এস আই নয়, বিরোধী দলগুলি নয়, অগুনতি ফ্যাক্টফাইণ্ডিং প্যানেল নয়, সব চেয়ে বড় শত্র তাঁরই দেশের সংবাদপত্রগুলি, টেলিভিশন চ্যানেলগুলি। তাঁর ভাষায় অবশ্য এরা সিউডো-সেকিউলার। হাতে গোনা কয়েকটি সংবাদপত্র আর ম্যাগাজিন ছাড়া তাঁর কথা তুলে ধরার লোক কেউ নেই। অথচ রাষ্ট্রযন্ত্র যাঁর হতে, তাঁর হাতেই থাকার কথা রাষ্ট্রের প্রচার যন্ত্র। রাজ্যে এবং কেন্দ্রে তাঁরই দল ক্ষমতায় আছে। অথচ যদি বা তিনি কড়া হতে দাঙ্গা দমন করেও থাকেন দেশবাসী সেটা টের পাচ্ছে না। তাঁকে ফ্যাসিস্ট, নাৎসি, গণঘাতক, যে যা খুশি বলে যাচ্ছে। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রধান মন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে তাঁকে 'আবর্জনা' আখ্যা দিয়েছেন। অথচ এই তথা কথিত ঘৃণ্য চরিত্রকে ভাজপা মনে করছে ছোটে সর্দার, সর্দার পটেলের মতোই মুসলিম তোষণের বিরোধী। এঁদের ভরসা, হিন্দু ব্যাকল্যাশের পালে হাওয়া লাগিয়ে এঁরা নির্বাচনের বৈতরণী পার হবেন। সকলের মনে সেই ভোটযন্ত্র।

যে দোষে দোষী ভাজপা, সেই একই দোষে দোষী যাবতীয় বিরোধী দল। সকলেই হিসেব করছে দাঙ্গার ফলে কে কতটা ভোট বাগাতে পারে। ভাজপার সরকারের যেসব শরিক, তারাও জেনেশুনেই হিন্দুত্ববাদী দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ক্ষমতার লোভেই, কোনও বৃহৎ আদর্শে নয়। যে নির্বাচন ব্যবস্থায় শতকরা পঁচিশ-তিরিশ ভোট পেলেই নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায়, মূল উদ্দেশ্য সংখ্যাগুরুর ভোট পাওয়া নয়, শতকরা পঁচিশ ভোট পেলেই যদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভোটের বাকি পঁচাত্তর অগ্রাহ্য করা যায়, বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায়। ভাজপার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে হিন্দু ভোট পাওয়া যায়, নিজ নিজ রাজ্যে মুসলমানদের অভিভাবক সেজে মুসলমান ভোট পাওয়া যায়, অতএব ভাজপাকেও সমর্থন করো, সংখ্যালঘুদেরও তোষণ করো, কোনও মতে জোড়াতালি দিয়ে অন্যদের চাইতে, বেশি ভোট পেলেই হল। তেলুগু দেশম, তৃণমূল, সমতা, সকলেরই এক তাল, মুসলমান সমর্থিত কংগ্রেস থেকে যতটা মুসলমান ভোট ছিনিয়ে নেওয়া যায়। গুজরাতের দাঙ্গার পর হিন্দু প্রতিক্রিয়ায় নির্বাচনে জেতা যাবে, এই ঘৃণ্য আশায় নরেন্দ্র মোদি গুজরাতে নির্বাচন চেয়েছিলেন। সাত পাঁচ ভেবে ভাজপার জাতীয় নেতারা তাতে সায় দেননি, তাঁদের শরিকদেরও হাতে রাখতে হবে। নরেন্দ্র মোদিকে অপসরণ না করলে সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করব, এই সৎসাহ কোনও শরিকই দেখায়নি। বিরোধী দলও চায়না, জাতীয় স্তরে এখনই নির্বাচন হোক। হিন্দু ব্যাকল্যাশ যে কী জিনিস তারা তা টের পেয়েছেন গত নির্বাচনে।

সরকারি আর বিরোধী দলের এই ন্যাক্কারজনক দাবাখেলায় দাঙ্গা বিধ্বস্ত পরিবারের কথা কে ভাবে? তাঁরা তো অস্ত্র মাত্র। তাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্য তো অন্য। না হলে পশ্চিম বঙ্গের তোলা ত্রাণসাহায্য কাদের দেওয়া হবে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমেদাবাদে যেতে হয় কেন? সঙ্ঘপরিবারের সদস্যরা যে সব শিবির চালায় তাদের হাতে যেন এই সাহায্য না পড়ে, তার জন্য এত সতর্কতা কেন? সেই শিবিরের আশ্রয়প্রার্থীরা হিন্দু হলেও

তারাও কি দাঙ্গাবিধ্বস্ত নয়? খবরের কাগজে খবর পড়ে সেখানে যে হিন্দুরাও আছে দাঙ্গায় আক্রান্ত হয়ে, সেটা বোঝা দুষ্কর। মুসলমান শিবিরের আশ্রয়প্রার্থীদের অভিযোগ হিন্দুরা পাচ্ছে থেকে পনেরো হাজার টাকা আর মুসলমানরা পাচ্ছে এক থেকে দুই হাজার। এক হাজার বা পনেরো হাজার কোনওটাই যথেষ্ট নয়। তবে এই কথাতেই বোঝা যায়, দাঙ্গাকবলিত হয়েছে দুই সম্প্রদায়ই। যা পার্থক্য,. শুধু সংখ্যায় । কিন্তু যাদের গেছে প্রাণ এবং ধন, তারা যে সম্প্রদায়েরই হোক, তারা তো মানুষ। অথচ, দাঙ্গার সময়, প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, হিন্দু না ওরা মুসলিম। এই বিষাক্ত পরিবেশে খবরের কাগজগুলোও বস্তুনিষ্ঠ হওয়া ছেড়ে দিয়েছে। পোগ্রোম, জেনোসাইড, কার্নেজ, ইত্যাদির যথেচ্ছ ব্যবহার চলেছে, এই শব্দগুলির ভয়াবহ অনুষঙ্গ মনে না রেখেই। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্তারা মনে করিয়ে দিয়েছেন, গুজরাতে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন হলেও নাৎসি, জেনোসাইড, কার্নেজ ইত্যাদি শব্দ তাঁরা ব্যবহার করেননি। খবরের কাগজে গৈরিক বাহিনীর অশিক্ষিত, অমার্জিত অসাংস্কৃতিক তাণ্ডবের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, বরোদায় ফৈয়াজ খাঁর সমাধির ধ্বংসের কথা, তুলনা করা হয়েছে বামিয়ান বুদ্ধমূর্তির ধ্বংসের সঙ্গে। শিল্পসংস্কৃতির বিশিষ্টজনেরা এই নরপিশাচদের ধিক্কার জানিয়েছেন। হীরেন মুখোপাধ্যায়ও তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে ঘটনারটির উল্লেখ করেছেন—বরদায় যখন কার্ফু ঘোষিত ছিল তখনই কবরখানায় আক্রমণ চলে, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় অনুমোদনে ধ্বংস সংঘটিত হয়। সমাধিটি কী অবস্থায় ছিল? ১৯৫৮-এ মৃত ওস্তাদ, তাঁর কবর দেখতে গিয়েছিলেন কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুর চোদ্দো-পনেরো বছর পরে। বরোদায় গিয়ে তিনি দেখলেন, ওস্তাদের মজ্‌হার কোথায়, সেটা জানা দূরের কথা, ওস্তাদ কে তাই কেউ জানে না। খুঁজতে খুঁজতে তিনি শহরের অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে, একটি ছোট মোটর গ্যারাজের পিছনের দরজা দিয়ে, একটা কাঠা দশেক খোলা জায়গা, একাধিক নাম-না-জানা কবরের মধ্যে দেখতে পান, কোনে ছতরীওয়ালা কবর ওস্তাদের। প্রশ্ন জাগে, এমন একটি চূড়ান্ত অবহেলায় পড়ে থাকা কবরের উপর আক্রোশ হবে কার ? যেখানে ওস্তাদকেই লোকে ভুলে গেছে। মহাশ্বেতা দেবী যখন কবর ধ্বংসের খবর পেয়ে ধিক্কার জানান, তখন নিশ্চয়ই কবর ধ্বংস হয়েছে । কিন্তু সেটা কি ওস্তাদকেই অসম্মান করার জন্য? যাঁর গানে রাধাকৃষ্ণের ছড়াছড়ি, যিনি সঙ্গীত শুনে 'রাধো রাধে' বলে তারিফ জানাতেন, যিনি ধ্রুপদ গাইতেন 'ওম অনন্ত নারায়ণ হরি' দিয়ে, যাঁর 'বন্দে নন্দকুমারম্' ঠুংরি বিখ্যাত, তাঁর উপরে গৈরিকবাহিনীর আক্রোশ কেন? কবরখানায় আক্রমণ বিশেষ করে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁকেই অসম্মান, না অন্ধভাবে কবর ধ্বংস, না জমির ধান্দায় এই আক্রমণ? অর্থনীতিকেরা দাঙ্গার পিছনে জমিজমার লোভের কথা বলেন, গুজরাতের দাঙ্গাতেও শিল্পপতিদের জমির লোভের কথা বলা হচ্ছে। ফৈয়াজ খাঁকেই অপমান করা হয়েছে, এমন নিশ্চিত প্রমাণ কি পাওয়া গেছে ? এই ধ্বংসের সর্বভারতীয় প্রতিক্রিয়া হয়নি, যা ধিক্কার শোনা গেল শুধু কলকাতায়।

২৩ এপ্রিল লোকসভায় তুমুল আলোড়ন, গুজরাত শিক্ষা ব্যবস্থার গৈরিকীকরণ। উপলক্ষ গুজরাত রাজ্য বোর্ডের পরীক্ষায় ইংরেজি প্রশ্নপত্রে কয়েকটি বাক্য, যার উদ্দেশ্য

নাৎসিদের জয়গান করা, নাৎসি আদর্শ প্রচার করা। পরের দিন যথারীতি সম্পাদকীয় লেখা হয় বড় বড় সংবাদপত্রে গৈরিক শিক্ষার বিরুদ্ধে। অথচ লোকসভাতেই জানানো হয়েছিল, বাক্যগুলো নেওয়া হয়েছে অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক থেকেই, বাক্যগুলোর রচয়িতা ই এম ফর্স্টার , যাঁর উদ্দেশ্য ছিল নাৎসিদের ব্যঙ্গ করা। যাঁরা irony বুঝতে পারেন না, তাঁদের আলোকিত করা কোন ব্যবস্থায় সম্ভব। সাংসদরা হয়তো না জেনেই সন্দেহ করেছিলেন, কিন্তু জানার পরেও সম্পাদকীয় লেখার কারণ? রোজ তিনটে করে সম্পাদকীয় লিখতে হবে, সম্পাদকীয়ের বিষয় আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আর গৈরিক বাহিনীকে কারণে-অকারণে আক্রমণ করাটা politically correct ? আরও পরিহাসের বিষয়, প্রশ্নটা যিনি করেছিলেন, তিনি করেছিলেন, গুজরাতের দাঙ্গার বছর খানেক আগে এবং তিনি একজন মুসলমান শিক্ষয়িত্রী। গুজরাতের মাধ্যমিক আর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে যে প্রহসন হয়ে গেল, সেটাও কোনও নিরীহ প্রহসন নয়। দাঙ্গার ফলে কোনও কোনও শিক্ষাকেন্দ্রে যথাসময়ে পরীক্ষা নেওয়া যায়নি, যেমন আহমেদাবাদ আর বরোদা শহরে। এই সব কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়ার কথা ১৮ এপ্রিল। সবমিলিয়ে ১.৬ লক্ষ পরীক্ষার্থী। মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা থেকে কয়েকটি কেন্দ্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় আইনশৃঙ্খলার কথা ভেবে।

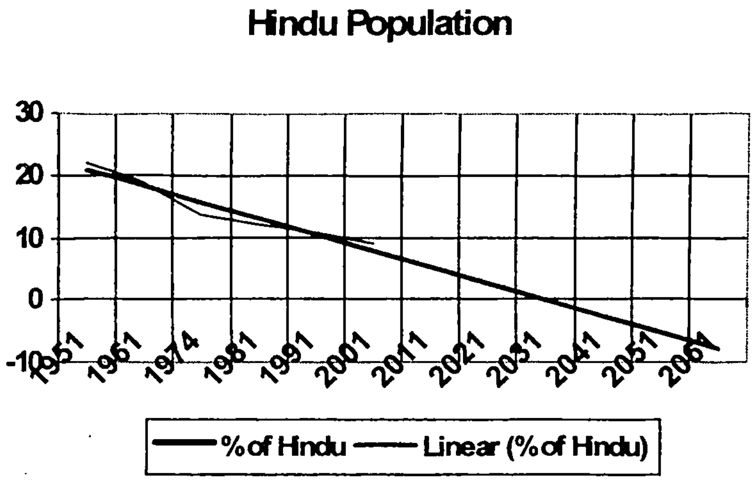
পরীক্ষাকেন্দ্রের স্থানান্তরের বিরুদ্ধে সভা করে অ্যাফেক্টেড সিটিজেন্স অফ আহমেদাবাদের নেতারা পরীক্ষা বয়কটের ডাক দিলেন। বোর্ড জানাল পুলিশ সুরক্ষার আশ্বাস দিয়েছে, চিন্তার কোনও কারণ নেই, ছাত্রছাত্রীদের জন্য যানবাহন ও পুলিশের সুব্যবস্থা থাকবে। পরের দিন বোর্ড জানাল প্রথম দিন ৯২.৯৫ শতাংশ পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু বহু কাগজে লেখা হল ৯০ শতাংশ মুসলমান ছাত্ররা পরীক্ষা বয়কট করেছে। ছবি ছাপা হল আহমেদাবাদে এক সম্পূর্ণ ফাঁকা হলে বিষন্ন শিক্ষয়িত্রী বসে আছেন, পরীক্ষার্থীরা আসেনি। আর একটি ছবিতে দেখা গেল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে তিনটি ছাত্র বসে আছে পরীক্ষার ঘরে। ওই ১৯ তারিখেই বিভিন্ন এজেন্সি মারফৎ পাওয়া খবর জড়ো করে ওই খবরের কাগজগুলোই ভিন্ন খবর দিচ্ছে। ছবিগুলিও এজেন্সি মারফত পাওয়া, ছবির ক্যাপশন এজেন্সি দিয়েছে না খবরের কাগজগুলো বানিয়েছে বোঝার উপায় নেই। হিন্দু আর মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের কি অ্যাপার্টহাইড প্রথায় আলাদা আলাদা ঘরে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে? স্কুল অনুযায়ী কেন্দ্র পড়ে একই স্কুলের হিন্দুরা এক জায়গায় বসবে, মুসলমানরা অন্য জায়গায়, এটা সম্ভব? অথবা একটা স্কুলে সবাই মুসলমান, এটাও কি সম্ভব? তাহলে ঐ ফাঁকা পরীক্ষা কেন্দ্রের তাৎপর্য কী? খবরেও লেখা হয়েছে ঐ অ্যাফেক্টেড সিটিজেন্স অফ আহমেদাবাদের মুখপাত্র বলেছেন, আহমেদাবাদের আট হাজার মুসলমান ছাত্রছাত্রীর ৩,৬০০ অনুপাস্থিত। অর্থাৎ অনুপস্থিতের সংখ্যা ৪৫ শতাংশ । কিন্তু সংবাদটির শিরোনাম ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা বয়কট। ঐ খবরে আরও লেখা হল, বরোদায় বয়কটের তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি। কোনও কোনও এজেন্সির খবর, দুই-তৃতীয়াংশ মুসলমান বয়কট করেছে পরীক্ষা। যথারীতি পরের দিন সম্পাদকীয় লেখা হল পরীক্ষা বয়কট নিয়ে। পরে অবশ্য এই সব খবর বেমালুম চেপে বলা হচ্ছে, পরীক্ষায় কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। তথ্য

নিয়ে খেলা অবশ্য সংবাদপত্রের একচেটিয়া নয়। আহমেদাবাদের শরণার্থী শিবিরে শিশুদের মধ্যে হাম হচ্ছে অসুখের ঔষধও অপর্যাপ্ত। এই অভিযোগ পেয়ে সরকার জানাল মিথ্যে কথা, হাম হলে দুয়েকটি আর ঔষধও প্রর্যাপ্ত। পরেরদিন সরকারই আবার জানাল, হাম সত্যিই হচ্ছে, আশঙ্কাজনকভাবেই, তবে চিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে। অনর্থক সত্য কথা চেপে সরকারই নিজেকে হেয় করল ।

সরকারি-বেসরকারি সব খবরই যখন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে বিকৃত হয় তখন দেশের লোক কী বুঝবে। আশার কথা, আতঙ্ক গুজরাতের পাঁচ কোটি লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ, ভারতের একশো দুই কোটির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েনি। গুজরাতেও আশার কথা, পঁচিশটি জেলার মধ্যে ছয়টি দাঙ্গার কবলে। গোধারায় ঘটনা না হলে গুজরাতে দাঙ্গা হতনা, প্রধানমন্ত্রীর এই অমানবিক মনোভাব তাঁকে শ্রদ্ধেয় করছে না। গোধরার অপরাধীদের দায় গুজরাতের নিরপরাধদের বহন করতে হবে কেন? সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার দায়িত্ব না নিতে পারলে কোন মুখে তিনি কাশ্মীরের ভারতভুক্তির ঐতিহাসিকতা নিয়ে বড়াই করেন। পুনশ্চ, ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত সরকারি হিসেব। গুজরাতের দাঙ্গায় মৃত ৬৫৫, পুলিশের গুলিতে মৃত্যু ১৬৯, আহত ২৩৮৫, বাড়ি নষ্ট১০২৮০, দোকান নষ্ট ১২০০০, গাড়ি নষ্ট ৩০০২।

পরিশিষ্ট-২

বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ক্ষয়, হিন্দু জনসংখার শতাংশ বনাম গণনা বৎসর। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রেখা চিত্রে দেখা যাচ্ছে ২০৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশের হিন্দুরা লোপ পাচ্ছে



কতকগুলি পড়ার মত বই

আনোয়ার শেখ

Islam-The Arab Nationalism, Rs. 50/-

The Tale of Two Gujarati Saints,Rs. 100/-

Islam and Human Rights and other Essays, Rs. 70/-

Islam--The Arab Imperialism, Rs. 70/-

This is Jehad! Rs.50/-

Islam Sex and Violence, Rs. 100/-

ইসলাম-- আরবদের জাতীয় আন্দোলন, ২০৲

প্রিয়রঞ্জন কুন্ডু

হিন্দুর শত্রু হিন্দু, ৬০৲

ইসলামের মর্মবাণী- জিহাদ ও জান্নাত, ৩৫৲

Imperialist Character of Islam, Rs. 20/-

Netaji Vs Gandhiji, Rs. 60/-

রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

পুরুষার্থ প্রসঙ্গঃ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় ভাবধারা, ৩০৲

ইসলামী ধর্মতত্ত্বঃ এবার ঘরে ফেরার পালা, ১০০৲

ভারতীয় ঐতিহ্য ও গান্ধিবাদী অহিংসা, ৫৲

কল্যব্দঃ সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক কাল গণনা, ৫৲

মার্কস ও মার্কসবাদীদের কথা, ১২৲

দেবজ্যোতি রায়

কেন উদ্বাস্তু হতে হল, ৪০৲

প্রাপ্তিস্থান

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা--৭০০০৭৩

ডঃ রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৪২)
পেশাগত ভাবে রসায়নবিদ, দেশবিদেশের রাসায়নিক জর্নালে তাঁর
গবেষনা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর লেখালিখির পরিধি রসায়নের
সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত। কিশোরপাঠ্য গল্প থেকে আরম্ভ করে গল্পবিজ্ঞান, জনপ্রিয়
বিজ্ঞান, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। বিগত দশ বছর
ধরে নিষ্ঠভাবে ইতিহাস ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব চর্চা করছেন তিনি,
যার ফসল নবরূপে ডিরোজিও, নবরূপে তিতুমীর,
কাশ্মীর মঞ্চে শ্যামাপ্রসাদ, স্যার সৈয়দ
আহমদ খাঁ, প্রাচ্যের কবি
ইকবাল

ও

Insurgency of
Titu Meer